আরতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৪৯
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

প্রথম বর্ষ।

১৩০৭ আষাঢ় হইতে ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ।

PRINTED BY N. K. MAZUMDAR.
MAZUMDAR PRESS,
20, Cornwallis Street.
CALCUTTA.

ময়মনসিংহ,
আরতি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য দেড় টাকা।

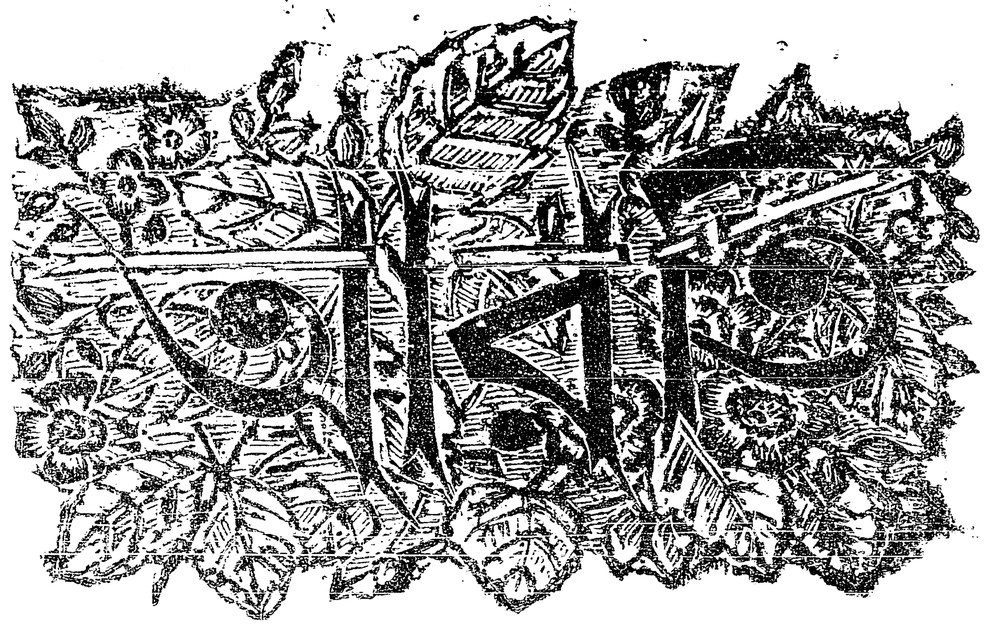

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বেলা ২

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত।

আষাঢ়—১৩০৭

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী ও সম্পাদক প্রভৃতি।

—০—

সূচী পত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	অবতরণিকা	১
২।	বেদ অপৌরুষেয় নহে	৩
৩।	শিশুর স্তন্য পান (কবিতা)	১৪
৪।	মহারাজ অশোক ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি	১৬
৫।	ভুলি নাই (কবিতা)	২৭
৬।	সম্প্রদান (গল্প)	২৭

—:০:—

আরতির নিয়মাবলী।

১। আরতির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে, মফস্বলে সর্ব্বত্র দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। আরতি প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

৩। আরতির বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি লাইন ৵০ দুইআনা, প্রতি পৃষ্ঠা তিন টাকা, অধিক কালের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

৪। কেহ আট জন গ্রাহকের অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে তাঁহাকে বিনামূল্যে এক বৎসর আরতি দেওয়া যাইবে।

৫। প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিলে রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ৵০ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে।

৬। আরতি সংক্রান্ত সমুদয় চিঠি, পত্র, প্রবন্ধ, পুস্তক, বিনিময়ের কাগজ ও টাকা পয়সা "আরতি সম্পাদক ময়মনসিংহ" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়া হইবে না।

আরতি কার্য্যালয়,
ময়মনসিংহ। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩০৭। { ১ম সংখ্যা।

অবতরণিকা।

—০:০—

মাতৃপূজায় "আরতির" শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনিত হইতে চলিল। অর্চ্চনোপযোগী উপচার-সংগ্রহে "আরতি" কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, এবং যে ক্ষেত্রে ভারতী, নব্যভারত, সাহিত্য প্রভৃতি মাতৃসেবায় দেহ-মন উৎসর্গ করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে "আরতির" ক্ষুদ্র শক্তি সংযোগের কিছুমাত্র আবশ্যকতা আছে কি না, ইত্যাদি বিষয় ভাবিবার অবসর হয় নাই। আত্মবলের গুরুত্ব ও তাহার কার্য্যকারিতাশক্তি পরিমাপ না করিয়া এ দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন কি? এ প্রাংশু লভ্য ফলে বামন কেন উদ্বাহু হইতেছে? এ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, তাহার উত্তর এই—কর্ত্তব্যজ্ঞানের উন্মাদিনী শক্তি অতীব বিস্ময়কর। সে শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইলে উদ্দেশ্য পথে প্রধাবিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আপনার শক্তি কতটুকু এবং তাহা কার্য্যসিদ্ধির অনুকূলতা সম্পাদনে কতদূর কৃতকার্য্য হইবে, ভাবিবার অবসর থাকেনা। সেইজন্যই রাঘবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সাগরবন্ধনব্যাপারে ক্ষুদ্রদেহ "কাষ্ঠমার্জ্জার" আপনার ক্ষুদ্রশক্তি টুকু সংযোগ করিতে ব্যাকুল হৃদয়ে অগ্রসর হইয়াছিল।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে স্থানে "বঙ্গদর্শন" "বান্ধব" "আর্য্যদর্শন" প্রভৃতি বীরপুঙ্গবগণ, প্রতিকূলতার প্রচণ্ড আঘাতে ধরাশায়ী হইলেন, সে স্থানে ক্ষুদ্রাবয়বা ক্ষুদ্রশক্তি "আরতির" অধিষ্ঠান কতক্ষণ সম্ভবে? এ কথার উত্তরে বলিব—মানবদেহ, কর্ম্মদেহ এবং এ সংসার তার কর্ম্মক্ষেত্র। এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া যে ব্যক্তি, স্বীয় শক্তি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে না পারিল তাহার জীবন পশু জীবনের সহিতও তুলনীয় নহে। কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সাধ্যায়ত্ত না হউক, তাহাতে লজ্জা অথবা পরিতাপের বিষয় কিছুই নাই। যাহার যে বিষয়িণী শক্তি যত টুকুই থাকুক না কেন, জগতের হিতকল্পে তাহা নিয়োজিত করিতে পারিলেই তাহার কর্ত্তব্য ও সার্থকতা সম্পাদিত হইল। তবে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?"।

এ সংসারটা ভোগ করার জন্য কেহই মৌরশীপাট্টা লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় নাই। জাতবস্তু মাত্রেরই অস্তিত্ব লোপ পাইবে। জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটিবে, প্রকৃতির এ ধর্ম্ম সর্ব্বথাই অবশ্যম্ভাবী। বাত্যার তাড়নায় জলে বুদ্বুদ উঠে আবার জলেই লয় পায়। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের তাড়নায় সময়ের স্রোতোজলে "আরতি" বুদ্বুদ ফুটিয়াছে, বাঙ্গালার জল বায়ু যতদিন স্বাস্থ্যের অনুকূল থাকিবে ততদিন "আরতি" সাধ্যানুসারে জাতীয় সাহিত্যের সেবা করিতে ত্রুটি করিবে না। স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে, আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিলে, "আরতি" নীরবে আবার সময়ের কোলে মিশিয়া যাইবে; ইহাতে লজ্জা অথবা পরিতাপের বিষয় কি? "আরতির" জীবনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি ভাবিয়া আমরাও আশ্বস্ত হৃদয়ে অবসর গ্রহণ করিব।

ভগবন্নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আজ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। সফলতার গিরিদুর্গে জয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইব কিনা জানি না, জানিতে বাসনাও নাই। কর্ত্তব্যজ্ঞানে খাটিতে আসিয়াছি, খাটিয়া যাইব। **ফলপ্রদাতা স্বয়ং ভগবান।**

বেদ অপৌরুষেয় নহে।

—০—

প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই দৃঢ়তর বিশ্বাস ও ধারণা যে তাঁহাদিগের স্বস্ব ধর্ম্মগ্রন্থ পূর্ণ অভ্রান্ত ও ঈশ্বরবাণী। ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, মানুষ মাত্রও সমান ও তুল্য-ধর্ম্মা। মহান্ ঈশ্বর কাহাকেও ছোট বড় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, কাহার জন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও দেন নাই। তিনি মানুষকে স্বাধীন ও বিবেক শক্তি সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্রমোন্নতিশীল মানুষ আপনার বুদ্ধিবলে আপনার পথ আপনি প্রশস্ত করিয়া লইতেছে—শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে এবং যে যেরূপ কর্ম্ম করিতেছে সে তদনুরূপ ফলভাগী হইতেছে। ঈশ্বর কোন গ্রন্থের প্রণেতা নহেন, উপদেষ্টাও নহেন। প্রত্যেক দেশের জ্ঞানী লোকেরা স্বস্ব বিবেক ও বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া স্বাধীনভাবে যাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, ঐসকল গ্রন্থই আজি ধর্ম্মশাস্ত্র নামে পরিচিত। খৃষ্টানেরা বলিয়া থাকেন এবং বিশ্বাসও করেন যে "Bible is the word of God". মুসলমানেরাও মনে করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের কালামাল্লা বা কোরাণ গ্রন্থ "খোদার কলম" বা ঈশ্বরের বাক্য। ঐরূপ ভারতীয় আর্য্য বা হিন্দুগণও অম্লান হৃদয়ে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন যে তাঁহাদিগের বেদ সকল অপৌরুষেয় ও প্রমাদ-পরিশূন্য ঈশ্বরবাণী। কিন্তু কোন গ্রন্থই ঈশ্বর প্রণীত, ঈশ্বরোপদিষ্ট অথবা ঈশ্বরের উক্তি পূর্ণ অপৌরুষেয় বস্তু নহে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্বাধীন মনে মানুষের ভ্রান্ত হৃদয় লইয়া যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সম্বদ্ধ হইয়া বাইবেল ও বেদাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যাঁহারা বেদ, কোরাণ ও বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচনা সমূহের সমবায় সমুথ নামই বেদ, কোরাণ, বাইবেল। সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত ও অসীম বিশ্বের নিয়ন্তা এক

ভিন্ন দুই নন্, তুল্য ধর্ম্মা এক পিতার সন্তান আমূল মানবজাতির ধর্ম্মও এক ভিন্ন দুই নয়, সেই সার্ব্বভৌম মহান্ ঈশ্বর স্বয়ং অথবা তাঁহারদ্বারা অনুপ্রাণিত কিংবা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কেহ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে উহা জগতের আমূল নর-নারীর সাধারণ ধর্ম্মগ্রন্থ হইত এবং বেদ, কোরাণ, বাইবেল ও ভিন্ন ভিন্ন বেদ সমূহে আমরা এত মতদ্বৈধ ও মহান্ অনৈক্যও দেখিতে পাইতাম না ১। এত মতভেদ অনৈক্য এবং বহুল ভ্রান্তি বিদ্যমান আছে বলিয়াই আমরা বেদাদি গ্রন্থকে অপৌরুষেয় বলিতে প্রস্তুত নহি। সেই ভূমা পরমেশ্বরের এক সূর্য্য, এক চন্দ্র, সাধারণ জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি, জগতের সমগ্র নরনারীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইল, ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্রসূর্য্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জলবায়ু সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরকে হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির জীবনরক্ষা করিতে হইল না, আর সেই একই ঈশ্বরকে তাঁহার একই সন্তান সন্ততি হিন্দু ও খৃষ্টান প্রভৃতির নিমিত্ত ভ্রম প্রমাদের একমাত্র আধার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে হইবে অথবা তাদৃশ গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিতে কেহ প্রত্যাদিষ্ট হইবেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা !!!

পৌরাণিকেরা কখন বলিয়াছেন ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় হইতে বেদ চতুষ্টয়ের সমুদ্ভব হইয়াছে,২ কখন বলিয়াছেন—দেবদেব মহাদেব হইতে

১। বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নং। মহাভারত।

২। তস্মাৎ অণ্ডাৎ বিভিন্নাৎ তু ব্রহ্মণোঽব্যক্ত জন্মনঃ।
ঋচো বভূবুঃ প্রথমং প্রথমাৎ বদনাৎ মুনে॥
যজূংষি দক্ষিণাৎ বক্ত্রাৎ অনিবদ্ধানি কানিচিৎ।
পশ্চিমং বদ্ বিভোর্বক্ত্রং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥
আবির্ভূতানি সামানি তত শ্ছন্দাংসি ভান্যথ।
আথর্ব্বণ মথেষঞ্চ অভিচারিক শান্তিকং।
উত্তরাৎ প্রকটীভূতং বদনাৎ তস্য বেধসঃ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

+ প্রজাপতিঃ সোমং রাজান মসৃজত। তদহু ত্রয়োবেদা অসৃজ্যন্ত॥
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—২।৩।১০।১॥

বেদ সকল সমুদ্ভূত ১, কখনও বলিয়াছেন ব্রহ্মাদি কেহই বেদ প্রণেতা নহেন, তাঁহারা বেদের স্মর্ত্তা মাত্র ২, ফলতঃ নানা বৈষম্যপূর্ণ এই সকল পৌরাণিক উক্তি পরম্পরা নিতান্তই ভিত্তিহীন ও অননুকরণীয়। ঈশ্বর ব্রহ্মা বেদাদি কোন গ্রন্থের স্রষ্টা হইতে পারেন না। সৃষ্ট মনুষ্য দেবতা ব্রহ্মাও কোন বেদের রচয়িতা ছিলেন না ৩। তিনি বৈদিক বহু ঋষির অবরজ ছিলেন, বেদের একটী ঋক্‌ও তাঁহার প্রণীত বলিয়া পরিচিত নহে, তবে তিনি আপন পুত্রকে বেদাধ্যাপন করিয়াছিলেন ইহাই মাত্র বিশ্বাস করা যাইতে পারে ৪। স্রষ্টা কল্পিত ব্রহ্মা কোন মূর্ত্ত পদার্থ ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইতে বেদ বিনিঃসৃত হইয়াছিল, একথাও প্রজ্ঞা গৃহীত ও যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না? ফলতঃ কেবল বেদ কেন? নিরপরাধ ব্রহ্মার মুখনাসিকাদি হইতে নিরঙ্কুশ পৌরাণিক কবিগণ ভেল্কী বাজীর মতন না জন্মাইয়া লইয়াছেন এমন পদার্থই নাই ৫। কিন্তু এই সকল পৌরাণিক উক্তির অলঙ্কার ভাগ

১। ঋচো যজূংষি সামানি বায়ুরগ্নিস্তথা জলং। ২
অক্ষরান্ নিঃসৃতাঃ সর্ব্বে দেব-দেবাৎ মহেশ্বরাৎ॥ ৫—৩২অ—বায়ু।

২। ন কেচিৎ বেদকর্ত্তারো বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।

৩। ঋগ্বেদং প্রথমং তস্য অগ্নিমীলে পুরোহিতং।
এতাং দৃষ্ট্বা ঋচং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ পুনঃ॥
তদক্ষরং মহাতেজাঃ কিমেতদিতি লোক-কৃৎ॥ ১৭—২৬অ—বায়ু।

৪। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব। বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ। ১। মুণ্ডকোপনিষৎ-প্রারম্ভঃ।

৫। বিদ্যুতোঽশনি মেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্র ধনূংষি চ।
বয়াংসি চ সসর্জাদৌ পর্জন্যং চ সসর্জ হ॥ ৩৮
ঋচো যজূংষি সামানি নির্ম্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে।
মুখাৎ দেবানজয়ৎ পিতৃংশ্চোরোঽপি বক্ষসঃ॥ ৩৯
প্রজনাৎ চ মনুষ্যান্ বৈ জঘনাৎ নির্ম্মমেঽসুরান্।
সাধ্যানজনয়ৎ দেবান্ ইত্যেব মনু শুশ্রুমঃ॥ ৪০
উচ্চা বচানি ভূতানি গাত্রেভ্য স্তস্য জজ্ঞিরে।
আবপন্ত (বশিষ্ঠাপন্ন নাম:) প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ॥ ৪১—১৩অ হরিবংশ।

পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মর্ম্মানুসরণ করিলে ইহাই প্রতিভাত হইবে যে কল্পিত আত্মভূ ব্রহ্মা অর্থাৎ স্বয়ং পরমেশ্বরই চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা। ভক্তান্ধ ভারতীয় আর্য্যগণ কেবল বেদের গৌরব ও মহিমা প্রকটন নিমিত্তই বেদকে অপৌরুষেয় ও ব্রহ্ম বা ব্রহ্মার মুখবিনিঃসৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং বেদানভিজ্ঞ জনসাধারণ উহাই নিরলঙ্কার নৈসর্গিক উক্তি মনে করিয়া আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ বেদ যেমন অপৌরুষেয় নয়, পরন্তু বহু পৌরুষেয়, স্ত্রৈণেয়ও বটে, তেমনই উহা এক সময়ে এক লেখনী বা এক রসনা হইতেও বিনিঃসৃত হইয়াছিল না। সত্য বটে কুসংস্কারান্ধ শাস্ত্রকারগণ, স্ত্রী, শূদ্র এবং নিরক্ষর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদিগকে বেদ শ্রুতিগোচর করিতেও অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ১। কিন্তু এমন একদিন গিয়াছে, যখন শূদ্র ও কুলনারীগণ ঋক্ রচনা করিয়া বেদের দৈহিক স্থূলতার সংবর্দ্ধন করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন।

ইহা একটী সর্ব্বজন বিদিত স্বীকৃত সত্য যে ভারত শিরোভূষা মহামতি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ চতুষ্টয়ের সংগ্রহ করিয়া বেদব্যাস নামে সমাখ্যাত হয়েন। সেই মান্ধাতারও পিতামহের আমলে আর্য্যনাম ও চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রচলিত হইবার বহুপূর্ব্বে২ জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষ অনুপবীতী নিরক্ষর জন সাধারণ প্রকৃতি সুলভ কবিত্ব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মুখে মুখে গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বৈরাজ ভবনের পবিত্র সমতল ক্ষেত্র, পবিত্র স্বর্গের পবিত্র ইন্দ্রালয় ভূমি মুখ্য স্বর্গ সুমেরুর নিস্তব্ধদরী গেহ সেই সরল প্রাণ ঋষিগণের সুধা নিষ্যন্দিনী পবিত্র শ্রোত

বক্ত্রাদ্ যস্য ব্রাহ্মণাঃ সং প্রসূতাঃ তদ্বক্ষস্তঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যা শ্চোর্ব্বোর্যস্য পদ্ভ্যাং চ শূদ্রাঃ সর্বে বর্ণা গাত্রতঃ সং প্রসূতাঃ ॥ ৭১—৬অ—বায়ু।

১। স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভাগবত—২৫—৪অ-১স্ক

২। নির্বিশেষাঃ কৃতে সর্ব্বা রূপায়ুঃ শীলচেষ্টিতৈঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং বৃত্তং প্রজানাং জায়তে স্বয়ং ॥ ৫৯

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অটম্যান সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ...	শ্রীরাম প্রাণগুপ্ত	২০৯
অবতরণিকা	....	১
অষ্টমূর্ত্তি	শ্রীদুর্গাদাস রায়	১২১
আগ্রায়	শ্রীকেদারনাথ মজ মদার	২৪৯—৩২৮
আমি	শ্রীদুর্গাদাস রায়	৩৩
আলোকের দেশ (কবিতা)	শ্রীশ্রীনাথ চন্দ	৯৫
আলোচনা	শ্রীনীলাম্বর গুপ্ত বি, এ	১২৮
আবাহন (কবিতা) ...	শ্রীমনোমোহন সেন	১৩৩
একখানি ঐতিহাসিক চিত্র ...	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	৭২
একটী প্রাচীন কবিতা ...	শ্রীদুর্গাদাস রায়	১৬৩
কদম্ব (কবিতা) ...	শ্রীহরি প্রসন্ন দাস গুপ্ত	৬৪
কুলীনের মান	...	২২১
গুজরাটের পুরাতত্ত্ব... ...	৺ ত্রৈলক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল,	১৪৭
গোবিন্দ দাস	শ্রীরসিকচন্দ্র বসু	১৭১
চিন্তা প্রক্রিয়া	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	২১৪
জাতীয় জীবন	শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র রায়	৬৫
জ্যোতিষ ও কাল বিধান ...	শ্রীচ——বি, এ,	১৬০, ১৯৮
জ্যোতিষ—ক্রমবিকাশ ...	ঐ	২৭১
তুমি যদি (কবিতা) ...	শ্রীমতী কনকাঞ্জলি রচয়িত্রী	৬৩
তৃষিত (কবিতা) ...	শ্রীমনোমোহন সেন	৬৩
দেবী ও দানবী (গল্প) ...	শ্রীকেদার নাথ মজুমদার	৭৯
নরজীবন ভিক্ষা (কবিতা) ...	শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৭৬
বর্ষ শেষ ও নব বর্ষে (গ্রাম্য চিত্র)	শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল	২৭১
নিরাশা (কবিতা) ...	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এল	২০৪
পরিণয় উপহার (যুগল কবিতা)	শ্রীমনোমোহন সেন	৩৩৫
পাপ স্বপ্রকাশ (কবিতা) ...	শ্রীমহীন্দ্র মোহন চন্দ	৬৩
পূর্ব্বজন্ম বাদ (কবিতা) ...	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	১৭৫
প্রতিক্ষায় (কবিতা) ...	শ্রীমনোমোহন সেন	১৭৬
প্রত্যাখ্যান (কবিতা) ..	শ্রীদীনেশ চন্দ্র চৌধুরী	২০৮
প্রভাত মঙ্গল (কবিতা) ...	শ্রীহরি প্রসন্ন দাস গুপ্ত	৯৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বর্ণ সঙ্কর ...	শ্রীউমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন	১১৭
বসন্তে (কবিতা) ...	শ্রীমনোমোহন সেন	২৭০
বাঙ্গালার কার্পাস শিল্প ...	শ্রীকেদার নাথ মজুমদায়	১৩৭, ১৭৭
বেদ	শ্রীদুর্গাদাস রায় ৫২, ৯০, ২০৫,	৩০৪
বারমাস্যা	শ্রীরসিক চন্দ্র বসু	১০৫
বেদ অপৌরুষের নহে ...	শ্রীউমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন	৩
ভারতেশ্বরীর ভারত রাজ্য ...	শ্রীদুর্গাদাস রায়	২৬২
ভুলি নাই (কবিতা) ...	শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস	২৭
মহরম	শ্রীশশধর সেন বি,এ	৩১১
মহারাজ অশোক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতি	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	১৬
মাসিক সাহিত্য	...	৬২
যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল ...	শ্রীকেদার নাথ মজুমদার	১০৮
যৌতুক (কবিতা) ...	শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস	১১৭
রমণী (কবিতা) ...	শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস	৩৯
রাজমালা ও ত্রিপুর রাজ বংশ	শ্রীউমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন	৪১
রায় অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর	৺ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল	৯৭
শিশুর স্তন্য পান (কবিতা) ...	শ্রীমনোমোহন সেন	১৪
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ...	শ্রীম——কথিত	২৩৮—২৭৭
সম্প্রদান (গল্প) ...	শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী	২৭, ৪৮
সার্থকতা (কবিতা) ...	শ্রীমতী কাব্য কুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী	১৭৬
সীমান্ত (গল্প)	... ...	৩৩৬
স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস গুপ্ত	১৮৮
স্বপ্ন (কবিতা) ...	শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস	৯৫
মানব শব্দের বুৎপত্তি কি ? ...		৩১৯

(লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক নাম)

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র রায় !
„ উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন।
„ কেদারনাথ মজুমদার।
“ গোবিন্দ চন্দ্র দাস।
„ চন্দ্রশেখর কর বি, এ !
„ ——বি, এ।
„ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
৺ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল।
শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র চৌধুরী।
„ দুর্গাদাস রায়।
„ নীলাম্বর গুপ্ত বি, এ।
„ বিশ্বেশ্বর দাস গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন।
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ.
„ মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
„ মহীন্দ্র মোহন চন্দ।
শ্রীমতী মানকুমারী বসু।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী।
„ রমণীমোহন ঘোষ, বি, এল !
„ রসিক চন্দ্র বসু !
„ রাম প্রাণ গুপ্ত।
„ শশধর সেন, বি, এ
„ শ্রীনাথ চন্দ
„ শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ
„ হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

প্রভৃতি

গীতিদ্বারা প্রথম মুখরিত হইয়াছিল। ১ ক্রমে ভুবর্লোক (আফগানিস্থান বাহ্লীক ওস্বাধীন তাতারাদি স্থান)ও ভূলোক বা ভারতাগত দেবতারাও স্বাধীনভাবে সরল হৃদয়ে আপনাদিগের সুখ দুঃখের কথা লইয়া ঋক্ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে জাতি বা বর্ণগত কোন পার্থক্য আসিয়া মানুষকে অনৌদার্য্য ও সংকীর্ণতার নরকে নিক্ষিপ্ত করিতে ছিল না। যিনি গৃহনির্ম্মাতা তিনিই হোতা, যিনি হলবাহী, তিনিই আবার যোদ্ধৃবেশে রণভূমে বিদ্যমান থাকিতেন। যিনি যখনই যে অবস্থায় পড়িতেন, তখনই তিনি সেই অবস্থার কথা ঋকে সংবদ্ধ করিয়া, বেদ সকলের জনন ক্রিয়ার সহায়তা করিতেন। যে সময়ে ঈশ্বর বলিয়া কোন আরাধ্য দেবতার কথা কেহ জানিতেন না, যখন স্বর্গ ও নরকের সুখ সৌভাগ্য ও বিভীষিকা আসিয়া মানব হৃদয়কে উন্নমিত অবনমিত ও বিলোড়িত করিতনা, যখন অগ্নি জল ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি জড়পদার্থ সকল উপকার বা অপকার করিয়া মানুষের হৃদয়কে আবর্জ্জিত করিত, মানুষের নিকট সপর্যিত হইত, তখন হইতে ঋষিগণ, ঋষিতনয় দেবগণ ঋক্ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন অথর্ব্বা ঋষি অরণী সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হিমানী নিপীড়িত দেবগণকে শীত হইতে রক্ষা করিলেন ২ তখন উপকৃত ঋষিগণ "অগ্নির্বৈ দেবতা" ৩ বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়া

অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ ন সঙ্করঃ ॥ ৬০
অনিচ্ছা দ্বেষযুক্তা স্তে বর্ত্তয়ন্তি পরস্পরং।
তুল্য রূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধর্ম্মোত্তম বর্জিতাঃ ॥ ৬১—৮অ—বায়ু
বর্ণানাং সং বিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সং প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬০—৫৭অ—বায়ু

১। সূক্ত বাকং প্রথম মাদিৎ, অগ্নিমাদিৎ হবি রজনয়ন্ত দেবাঃ। ৮—৮৮সূ—১০ম।
২। অগির্জাতো অথর্ব্বণা বিদৎ বিশ্বানি কাব্যা। ৫—২১—১০ম
৩। তৈত্তিরীয় সংহিতা।

ছিলেন, যখন মহর্ষি মধুচ্ছন্দা অগ্নিমীলে ১ বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র শীতাপহারী জগল্লোচন সূর্য্যদেবের অপার মহিমা স্মরণ করিয়া তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ২ বলিয়া গান করিয়া উঠিলেন, যখন কে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিল ৩ কিরূপে কি দিয়া সৃষ্টি করিল? তিনি কে? এ চন্দ্র আমাদের ঈশ্বর নয়, এ সূর্য্য আমাদের স্রষ্টা নয়, এ সৃষ্ট অগ্নি আমাদের আরাধ্য বস্তু নয়, আরও যেন কেহ আরাধ্য দেবতা কোথাও আছেন. এই মহান্ বিতর্ক আসিয়া মানব হৃদয়কে সন্দেহ দোলায় দোলাইতে ছিল, ৪ তখনও ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ভিন্ন ভিন্ন রাজ কন্যা দ্বারা ঋক্ সকল বিরচিত হইয়া বেদ চতুষ্টয়ের দেহ রচনার সাহায্য করিতে ছিল। যখন ভারতাগত দেবতারা আর্য্যনামে বিভূষিত হয়েন. যখন ভারতাগত অনুপবীতী ঋষিতনয়গণ চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রচা দ্বারা জগতে অসাম্যের তূর্য্য নিনাদিত ও ভারতের সুখ সৌভাগ্য মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত ছিলেন. যখন পুরুষরূপী পরব্রহ্ম সহস্রশীর্ষা বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতি নিবহ তাঁহার মুখ, বাহু প্রভৃতি বলিয়া উপমিত হইতে ছিলেন, তখনও বৈদিক ঋক্ সকল পৌরা-

১। ঋগ্বেদ প্রারম্ভ:। ২। ঋগ্বেদ ১০ঋ—৬২সূ—৩ম।

৩। কিং স্বিৎ বনং ক উ স বৃক্ষ আস,
যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষু:। ৭—৩১সূ—১০ম
নৈতা বদে না পরো অন্য দস্ত্যক্ষা
স দ্যাবা পৃথিবী বিভর্ত্তি। ৮—৩১—১০ম

এই দ্যুলোক ও ভূলোকই শেষ নহে, ইহার পরও অন্য একজন আছেন। তিনিই প্রজাগণের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা। সূর্য্যের সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি আপনা হইতে আপনি বিদ্যমান ছিলেন।

৪। প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্য মস্তি। নেন্দ্রো অস্তীত নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম॥ ৩—১০০ সূ—৮ ম

নেম ঋষি বলিতেছে—হে যোদ্ধৃগণ! "ইন্দ্র আছেন" যদি ইহা সত্য হয়, তবে তাঁহার জন্য স্তোত্র রচনা কর। কিন্তু ইন্দ্রনামে কেহই নাই, কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? আমরা হায়! উদ্দেশে কাহার স্তুতি করিব?

দ্বারা প্রস্তুত শস্য) দিয়া ভাল ভাল পুলী পিঠা প্রস্তুত করিয়া পরে ছেঁই ফুরাইয়া গেলে অবশিষ্ট খালি পিঠালীদ্বারা মুঠিয়া পিঠা প্রস্তুত করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্যাস দেবও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঋক্ সমূহদ্বারা ত্রয়ীর দেহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অবশিষ্ট অকর্ম্মণ্য মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণাদি বিষয়ক ঋক্গুলি একত্র সংবদ্ধ করিয়া অথর্ব্ব বেদের বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন!

যিনি অভিনিবেশ সহকারে বেদের সূক্ত সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই বলিবেন বৈদিক ঋক্ সকল এক সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা বিরচিত হয় নাই। বেদের ভাষা, রচনা ও বিষয় সকল. এ বিষয়ের জ্বলন্ত প্রমাণ। বেদে এরূপ কতকগুলি দুর্বোধ্য ভাষার প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা আদিম কালীন অনার্য্য ভাষার সংমিশ্র (Mixture) ভিন্ন আর কিছুই নহে (১)। আবার সেই বেদে এরূপ আধুনিক সরল সংস্কৃতেরও প্রয়োগ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা সুকুমারমতি বালকগণও শ্রবণমাত্র বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকে (২)। বৈদিক ভাষার এই দুরূহত্ব ও প্রাঞ্জ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে বৈদিক ঋক্ সকল বহুকাল ধরিয়া প্রণীত হইতে ছিল। পরন্তু জড়োপাসনা, ব্রহ্ম বিষয়ক বিতর্ক ও একমাত্র পর ব্রহ্মের অনুভ অস্তিত্বাববোধের কথা বিদ্যুত থাকাতেও অনুমিত হইয়া থাকে, ঋ দিগের এই সকল মত পরিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি একদিনে সম্পন্ন ছিল না। একদল নিষ্কপবীত বর্ণজাতি নির্ব্বিশেষ নিরক্ষর কবি, প্রাথমিক রচনা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন, এবং সং চাতুর্বর্ণ্য বন্ধনাধীন একদল পরিমিত উপবীতী ব্যক্তির হস্তে বেদ পরিসমাপ্তি ঘটিয়া ছিল। সুতরাং বেদ যে বহুকাল ধরিয়া হইতেছিল তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অবস্থা দৃষ্টে অনুমা

(১) তাঙ্কানানেমতিথীবান:। তাবন্তো রাত্তিষাচ:। তাবতী গর্গা:। মা বো দ
শাসা মা পরিশাসা বুক্ষি। বিশ্বদেব নিবিৎ। ঋগ্বেদ।
(২) সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্ব মকল্পয়ৎ। ৩—১৯০সূ—১০ম

ণিক সরল সংস্কৃতে প্রণীত হইয়া বেদ চতুষ্টয়ের পুষ্টি সংসাধিত হইতেছিল, সত্যের অবসান সময়ে বেদ রচনার আরম্ভ হইয়া দ্বাপরের যৌবনকাল পর্য্যন্ত ঋক্ সকল প্রণীত হইয়া আসিতেছিল (১)। যে ঋষি যে কারণে যে ঋক্ রচনা করিতেছিলেন, তৎতৎ ঋকে তাহা অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তখন লিখন প্রণালীর অনুদ্ভাবন জন্য বেদ সকল মুখে মুখে গীত ও শ্রুত হইয়া অভ্যস্থ হইতেছিল। তজ্জন্যই বেদ শ্রুতি নামে সমাখ্যাত।

অনন্তর স্বর্গে দেবনাগরাক্ষর উদ্ভাবিত ও লিখন প্রণালী প্রচলিত হইবার বহুকাল পরে জ্ঞান মহার্ণব কৈলাসনাথ মহেশ, মাহেশনামে এক খানী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলে মহামতি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বহুজন বিরচিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোক রসনা বিলসিত ঋক্ সকল সংগৃহীত করিয়া ঋক্, যজুঃ ও সামনামে তিনখানী বেদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন (২)। এই বেদ ত্রিতয় লিখিত ও গ্রন্থবদ্ধ হইয়া ত্রয়ী নামে বিশেষিত হইতে লাগিল (৩)। এবং এই ত্রয়ীর বিভাগ সম্পাদিত হইবার বহুকাল পরে তিনি চতুর্থ অথর্ব্ব বেদের সংগ্রহ প্রভৃতি করিয়াছিলেন। যেরূপ স্ত্রীলোকেরা ছেঁই (চিনি বা গুড় ও নারিকেল

(১) বেদ শাস্ত্র প্রণয়নং ধর্ম্মাণাং সঙ্কর স্তথা ॥ ২৬
দ্বাপরেষু প্রবর্ত্তন্তে রোগো লোভো বধ স্তথা ॥ ২৬—৫৮অ—বায়ু

(২) এব মুক্ত স্তথেত্যুক্ত্বা মনু র্লোক হিতে রতঃ।
বেদ মেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥ ৮
অস্মিন্ যুগে কৃতো ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ পরন্তপ।
দ্বৈপায়ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ১১
ব্রহ্মণা চোদিতঃ সোস্মিন্ বেদং ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদ কারণাৎ ॥ ১২
ততঃ স ঋচ মুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং সমকল্পয়ৎ ॥ ১৯
সামভিঃ সামবেদঞ্চ তেনোদ্গাত্র মরোচয়ৎ।
রাজস্তথর্ব্ববেদেন সর্ব্ব কর্ম্মাণ্য কারয়ৎ ॥ ২০—৬০অ—বায়ু

(৩) ঋগ্ যজুঃ সাম ভাগেন সাঙ্গবেদ গতা পি যা।
ত্রয়ীতি পঠ্যতে লোকে দৃষ্টাদৃষ্টার্থ সাধিনী ॥ ৪৫অ—দেবী পুরাণ

সত্যের সায়ংকালে বেদ রচনার আরম্ভ হইয়া দ্বাপরের যৌবন সময়ে উহার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।

বেদ অপৌরুষেয় বা কোন এক ব্যক্তির বিরচিত হইলে নিশ্চয়ই উহা এক সময়ে অথবা অল্প সময়ের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইত। বেদ রচনা সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হইয়াছিল বলিয়াও আমরা বেদকে অপৌরুষেয় বলিতে অনভিলাষী। এবং বেদ যে অপৌরুষেয় নয় পরন্তু বহু পৌরুষেয়, যিনি বেদ পাঠ করিয়ছেন, তিনিই তাহা অম্লান হৃদয়ে স্বীকার করিবেন। যে ঋষি, যে ছন্দে যে দেবতার স্তুতি গান করিয়াছেন তৎ তৎ ঋক্ ও সূক্ত সকলের শীর্ষদেশে তাহা বিন্যস্ত রহিয়াছে(১)। সুতরাং কোন চেতস্বান্ ব্যক্তিই মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা লইয়া বেদকে ঈশ্বরের বাণী বা কোন এক ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। হে অগ্নি! আমরা ঋভুগণ তোমার স্তুতির জন্য এই নূতন স্তোত্র রচনা করিলাম(২), হে অগ্নি! গায়ত্রী ছন্দে নূতন রচিত এই স্তুতিদ্বারা তুমি স্তুত হইয়া আমাদিগকে ধনাদি দান কর(৩)। হে ইন্দ্র! মনুবিমদবংশীয় আমরা তোমার জন্য এই অপূর্ব্ব স্তোত্র রচনা করিয়াছি(৪)। আমরা কুশিক গোত্র সমুদ্ভূত (৫)। হে বজ্রধারিন্! দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর(৬), আমাকে ধন দেও (৭), রাক্ষসদিগকে বধ কর (৮) এই সকল উক্তি পরম্পরা কি ঈশ্বর মুখ বিনিঃসৃত? বিবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা পূর্ণ এই বৈদিক সূক্ত সকল কি মনুষ্য ভিন্ন পরব্রহ্ম বিরচিত হইতে পারে?

(১) মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—গায়ত্রী ছন্দঃ। ১—১—১ম।
কাক্ষীবতী ঘোষা (রাজ কন্যা) ঋষিঃ—অশ্বিনৌ দেবতে—জগতী ছন্দঃ ৩০ | ৪০সূ | ১০ম
(২) অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋভব স্তত্ক্ষুঃ। ৭—৮০—১০ম।
(৩) স্তবান আভর গায়ত্রেণ নবীয়সা রয়িং বীর বতী মিষং। ১১—১২—১ম।
[৪] স্তোমং ত ইন্দ্র বিমদা অজীজনন্। অপূর্ব্যং পুরুতমং সুদানবে। ৬—২৩—১০ম।
[৫] কুশিকাশ্চো হবা মহে। ১—২৬—৩ম
[৬] বজ্রিন্ দস্যবে হেতি মস্য। ৩০—১০৩—১ম
(৭) দ্যং দেহি সহস্রিণং রয়িং ৬—১৪সূ—৩ম
(৮) জহি রক্ষাং সি সুক্রতো। ২৯—১০সূ—৬ম

অসুরসেবী ভ্রাতৃগণের সংঘর্ষ ইত্যাদি বহু বিষয়ও উহাতে বিবৃত আছে। তবে এহেন সাধারণের সম্পত্তি, কেন জন সাধারণের অনধিগম্য হইল ? মূল বেদ নানা ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ, উহাতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা কেবল স্পৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র, জনসাধারণ এতৎ পাঠে বেদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে, এবং নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ উপনিষদাদি দুর্বোধ গ্রন্থ সকল তদানীন্তন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শূদ্রাদির বোধ সুগম হইবে না বলিয়াই ঋষিরা শূদ্রাদিকে বেদাদি পাঠে অনধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এমন কি "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ।" এ কথা বলিতেও শাস্ত্রকারেরা ইতস্ততঃ করেন নাই। তবে একালের শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি দর্শনে বোধ হয় শাস্ত্র প্রণেতারা শূদ্রাদির প্রতি কাঠিন্য প্রয়োগ করিয়া ভাল করিয়াছিলেন না। তাঁহাদিগে এই অনৌদার্য্য ও সংকীর্ণতা বশতই ভারতের একটী উচ্চ জাতি পর্য্যন্ত সাধারণ সংস্কৃত পঠেও অনধিকারী হয়েন।(১) উদারমনাঃ বিদ্যাসাগর হাশয়ের হস্তে সংস্কৃত কলেজের প্রাধান্য অর্পিত না হইলে এখনও কায়স্থগণ সংস্কৃতের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতেন।

শিশুর স্তন্যপান।

—o—

এধারে জাহ্নবী বহে, ওধারে যমুনা,
মধ্যে শ্যাম সমতল ক্রীড়ার সে বক্ষঃস্থল
জাগেন জননীরূপে কল্যাণ-কামনা।

(১) তৎকালে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত। ব্রাহ্মণের সন্তানেরা সকল শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। বৈদ্য জাতীয় বালকেরা দর্শন শাস্ত্র পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পাইত, বেদান্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাইত না। শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর চরিত ৯০ পৃষ্ঠা [শম্ভু কৃত]।

দূর দেব-দেশ হ'তে চড়িয়া কুসুম রথে
তৃষিত এসেছো অই পান্থ একজনা।
এধারে জাহ্নবী বহে ওধারে যমুনা।
নয়ন স্বপন ভরা পদনা পরশে ধরা,
অধর ধরিয়ে আছে অমিয় ঝরণা।
সে চাহেনা কিছু আর এ বিশাল বসুধার,
সে শুধু জুড়াতে চায় তৃষিত রসনা
এধারে জাহ্নবী বহে ওধারে যমুনা।

এধারে যমুনা বহে ওধারে জাহ্নবী।
অন্তরেতে পূতনীরা বহিছে স্নেহের ধারা
আনন্দে ত্রিধারা পান করে দেব কবি।
উলঙ্গ উন্মুক্ত প্রাণ, নাহি হিংসা অভিমান,
তার আগমনে ধন্য হয়েছে পৃথিবী।
সে জানেনা লাজ লজ্জা, তোমাদের সাজ সজ্জা,
জগতের সবে তার বান্ধব বান্ধবী।
তোরা কি দেখিস নগ্ন ? সে যে যোগী ধ্যান মগ্ন !
নগ্ন তার পবিত্রতা তোরা কি বুঝিবি ?
এধারে যমুনা বহে ওধারে জাহ্নবী।

এধারে যমুনা বহে, জাহ্নবী ওধার।
সে বোঝেনা অন্য তত্ত্ব, সুরশিশু সুরামত্ত,
আহা কি প্রসন্ন চিত্ত পিয়ে অনিবার !
চুক্ চুক্ চুক্ চুক্, কচি ঠোঁট টুক্ টুক্,
চুষিছে সে এক বুক সুধা পাথারার।
অন্যটি অঙ্গুলি দিয়া রাখিয়াছে আগুলিয়া,
মাতাল পেয়েছে স্বাদ সঞ্জীব সুরার !

ঢোকে ঢোকে টানে টানে চাহিছে মায়ের পানে,
আনন্দে নয়ন কোণে অশ্রু অাছে তাঁর !
কভুবা বিভোর ঘুমে, মাতৃবুক চুমে চুমে,
জাগিয়া শিয়রে দেখে মূর্ত্তি মমতার !
আবার নয়ন বুজি হাসে কাঁদে কারে খুজি ?
লেগেছে তুমুল যুদ্ধ আশা নিরাশার।
সে শিখেছে দুটি ভাষা এক "কান্না" আর "হাসা"
শিখে নাই বাচালতা তোমার আমার।
ওঙাতে সে কহে ওম্ নিনাদে চমকে ব্যোম্
দেবের সঙ্কেত বাণী স্তন্য পিপাসার।
হাসিতে বুঝায় মায় প্রাণ আর নাহি চায়,
যা দিয়াছ মিটিয়াছে আকাঙ্ক্ষা আমার।
এধারে জাহ্নবী বহে যমুনা ওধার।

শ্রীমনোমোহন সেন।

—০—

মহারাজা অশোক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতি

মেসিডনাধিপতি ভুবন বিজয়ী মহাবল আলেকজাণ্ডার পর তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সে ধর্ম্মজ্ঞান পদদলিত করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির পথে হইলেন—জিত রাজ্য সমূহ আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করি কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। বিভাগ অনুসারে সেলুকস নিকটর সিরিয়া, পারস্য ও আরব দেশের অধিপতি বেবিলনিতে তাঁহার নব রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। মৌ চন্দ্রগুপ্ত অবকাশ বুঝিয়া পঞ্জাব অধিকার করিয়া সিন্ধুনদ করিলেন।

রত। ব্রাহ্মণের
ধ্যয়ন করিতে
াজে অধ্যয়ন

সেলুকস রত্ন-প্রসূ ভারতের বিপুল বিভব ভুলিয়া যাইতে পারেন । তিনি ঐশ্বর্য্যলোভে ভারতাভিমুখে অভিযান করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের শক্তি বাধা প্রদানে নিয়োজিত হইল। হিন্দু গ্রীকের মহাসংঘর্ষে ক সেনাপতি বিধ্বস্ত হইয়া পরাজয় স্বীকারে সন্ধি প্রার্থী হইলেন। ন্ধুনদ সীমা নির্দ্ধারিত হইয়া সন্ধি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। ুকস রাজ্যরক্ষা ও সন্ধিবন্ধন সুদৃঢ় রাখিবার মানসে স্বীয় কন্যারত্ন গুপ্তের করে অর্পণ করিলেন। চন্দ্রগুপ্তও যথাযোগ্য প্রতিদান দান করিয়া আত্ম-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন *।

এই সময়ে (৩০২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে) সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক গেস্থানিস সেলুকস কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী টলীপুত্র (গ্রীক-পালিবোথ্রা) নগরে গমন করেন। মেগেস্থানিস্ রাজধানীতে উপনীত হইলে অতিশয় সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া ছিলেন। তিনি বহুদিন ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ভারতবাসীদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা, বাণিজ্য, বিভব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক্রমে অবগত হইয়া যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমানকালে ভারতের প্রাচীন ও প্রামাণ্য ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মেগেস্থানিসের পর ইজিপ্ট-রাজ টলেমি ফিলাডেলফিয়াস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দাওনিসিয়াস (Dionysius) ও সিরিয়া রাজ প্রেরিত এণ্টিওকস (Antiochus), চন্দ্রগুপ্ত-পুত্র বিন্দুসারের (গ্রীক-লিট্চিদ) সভায় রাজদূতরূপে গৃহীত হন।

বিন্দুসারের পর তৎপুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ রেন। অশোকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে কোন বৈদেশিক ঐতি-সিকের আবির্ভাব অবগত হওয়া যায় না, বোধ হয় কেবল এই রণেই তৎপূর্ব্ব অন্যান্য নৃপতিগণের অপেক্ষা, অশোকের বিবরণ

* কথিত আছে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে প্রতিদানে ৫০০ হস্তী ও বহুমূল্য মণিরত্নাদি যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

অধিকতর কুহেলিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে খোদিত গিরিলিপি, গুহালিপি স্তম্ভলিপি হইতে এবং পালিভাষায় লিখিত দ্বীপবংশ, মহাবংশ প্র কতিপয় সিংহলী ইতিহাস এবং বায়ু পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগ পুরাণ প্রভৃতি হইতে অশোকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হওয়া যা এতৎ ব্যতীত তাঁহার বিস্তৃত জীবনী অবগত হইবার অন্য কোন বি সুবিধা আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই।

উক্ত পুরাণাদি ও লিপিমালা আলোচনা করিলে খ্রীঃ পূঃ চ শতাব্দীর প্রারম্ভে অশোকের আবির্ভাব এবং তাঁহার ত্রিংশৎ বৎস রাজ্যপ্রাপ্তি অনুমান করা যায়। টার্নার সাহেব ২৪৭ খ্রীঃ পূঃ অশে কের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার বুলারের মত ইহা হইতে অভিন্ন মনে হয় না। তাঁহার ইপিগ্রাফিকা ইণ্ডি (Ipigraphica Indica) বর্ত্তমানে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া মনে করা যাইতে পারিলেও অশোকের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে সে গ্রন্থের উক্ত মত সম্পূর্ণ সমীচীন বোধ হয় না †।

কোন কোন গ্রন্থে ২৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে রাজ্য প্রাপ্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ২৬০ খ্রীঃ পূঃ অশোকের রাজ্য গ্রহণ অনুমান করেন। "কলিকাতা রিভিউ" (১৮৬৯। ৯৪সংখ্যা) অশোকের রাজত্বারম্ভ কাল ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পালি ভাষায় লিখিত সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস অনুসারে অশোক ২৭৫ খ্রী পূঃ অব্দে সিংহাসন অধিরোহণ করেন।

সে যাহা হউক অশোক যে এই সময়ে, ২৪৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দের আর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ২৭৫ খ্রীঃ পূঃ মধ্যে, কোন এক সময়ে সিংহা

† রাজত্বের ষড়্‌বিংশতি বর্ষে খোদিত একটী গিরি লিপিতে "২৫৬" সংখ্যক একটী প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। ডাক্তার বুলার ঐ অঙ্ককে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকালের পর ২৫৬ বৎসর অনু করিয়াছেন। বুদ্ধদেব ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। নির্ব্বাণের পর অশোকের রাজত্বের বিংশতি বর্ষে ২৫০ বৎসর হইলে ২৪৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি অনুমান করা যায়।

১১ খণ্ড, ভাদ্র, ১৩০৭ ৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নাথচন্দ্র, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

সূচী পত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা		বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	জাতীয় জীবন	৬৫	৫।	মালঞ্চ—	
২।	একখানি ঐতিহাসিক চিত্র	৭২		স্বপ্ন	৯৫
৩।	দেবী ও দানবী (গল্প)	৭৯		আলোকের দেশ	৭৯
৪।	বেদ	৯০		প্রভাত মঙ্গল	৯৬

ময়মনসিংহ বাসন্তী যন্ত্রে রামচন্দ্র অনন্তদ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০ প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

অধিকতর কুহেলিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে খোদিত গিরিলিপি, গুহালিপি স্তম্ভলিপি হইতে এবং পালিভাষায় লিখিত দ্বীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি কতিপয় সিংহলী ইতিহাস এবং বায়ু পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি হইতে অশোকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হওয়া যায় এতৎ ব্যতীত তাঁহার বিস্তৃত জীবনী অবগত হইবার অন্য কোন বিশেষ সুবিধা আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই।

উক্ত পুরাণাদি ও লিপিমালা আলোচনা করিলে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে অশোকের আবির্ভাব এবং তাঁহার ত্রিংশৎ বৎসর রাজ্যপ্রাপ্তি অনুমান করা যায়। টার্ণার সাহেব ২৪৭ খ্রীঃ পূঃ অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার বুলারের মত ইহা হইতে অভিন্ন মনে হয় না। তাঁহার ইপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা (Ipigraphica Indica) বর্ত্তমানে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া মনে করা যাইতে পারিলেও অশোকের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে সে গ্রন্থের উক্ত মত সম্পূর্ণ সমীচীন বোধ হয় না †।

কোন কোন গ্রন্থে ২৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে রাজ্য প্রাপ্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ২৬০ খ্রীঃ পূঃ অশোকের রাজ্য গ্রহণ অনুমান করেন। "কলিকাতা রিভিউ" (১৮৬৯। ৯৪সংখ্যা) অশোকের রাজত্বারম্ভ কাল ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পালি ভাষায় লিখিত সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস অনুসারে অশোক ২৭৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে সিংহাসন অধিরোহণ করেন।

সে যাহা হউক অশোক যে এই সময়ে,২৪৭খ্রীঃ পূঃ অব্দের আর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ২৭৫ খ্রীঃ পূঃ মধ্যে, কোন এক সময়ে সিংহাস

† রাজত্বের ষড়্‌বিংশতি বর্ষে খোদিত একটী গিরি লিপিতে "২৫৬" সংখ্যক একটী প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। ডাক্তার বুলার ঐ অঙ্ককে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকালের পর ২৫৬ বৎসর অনু কারিয়াছেন। বুদ্ধদেব ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। নির্ব্বাণের পর অশোকের রাজত্বের বিংশতি বর্ষে ২৫৬ বৎসর হইলে ২৪৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি অনুমান করা যায়।

১ম খণ্ড, ভাদ্র, ১৩০৭ ৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ চন্দ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

সূচী পত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা		বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	জাতীয় জীবন	৬৫	৫।	মালঞ্চ—	
২।	একখানি ঐতিহাসিক চিত্র	৭২		স্বপ্ন	৯৫
৩।	দেবী ও দানবী (গল্প)	৭৯		আলোকের দেশ	৭৯
৪।	বেদ	৯০		প্রভাত মঙ্গল	৯৬

ময়মনসিংহ বাসন্তী যন্ত্রে [illegible]মচন্দ্র অনন্তদ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা একত্রে কার্ত্তিকের শেষ বাহির হইবে।

ঐসংখ্যায় নিম্নলিখিত লেখকগণের প্রবন্ধ থাকিবে

কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের সনেট "যৌতুক"।

সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি, এ, মহাশয়ের গল্প।

সুবিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের "রায় অভয়চরণ দাস বাহাদুর।"

ভূতপূর্ব্ব "বাঙ্গালী" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের "সতীস্পর্শ।" (আখ্যায়িকা)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরমণ গোস্বামী মহাশয়ের "ময়মনসিংহের বৈষ্ণব কবি মাধবাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।"

"রেয়াজউস্ সেলাতিনের" অনুবাদক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের "ঐতিহাসিক চিত্র।"

সাহিত্য পারিষদের বিশিষ্ট লেখক শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের দেশীয় প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—"বারমাস্যা।"

শ্রীযুক্ত নীলাম্বর গুপ্ত বি, এ, মহাশয়ের "আলোচনা।"

এতদ্ব্যতীত "ময়মনসিংহের ইতিহাস", বেদ ও অন্যান্য প্রবন্ধ থাকিবে

নিবেদন—অনেক গ্রাহক অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূজার পূর্ব্বে ভিঃ পিঃ না পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনুরোধ ক্রমে এবং সময়ের সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত এবার কাহারও নিকট ভিঃ পিতে আরতি প্রেরিত হইল না; আশা করি যাঁহারা এপর্য্যন্ত মূল্য প্রদান করেন নাই, ভাদ্র সংখ্যা পাইয়াই তাঁহারা আরতির মূল্য প্রেরণ করিয়া অনুগৃহিত করিবেন। আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা বাহির হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা মূল্য প্রেরণ না করিবেন তাঁহাদিগের নিকট উক্ত সংখ্যা ভিঃ পিতে প্রেরিত হইবে। কেহ তাহা ফেরত দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না করেন ইহাই প্রার্থনা।

ময়মনসিংহ,
আরতি কার্য্যালয়।

সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৩/৫
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৩৬

লাভ করিয়া ছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত ‡।

অশোকের রাজ্যাভিষেক রাজগৃহে সুসম্পন্ন হয়। অভিষেকের তিন বৎসর পর অশোক স্বীয় রাজধানী রাজগৃহ হইতে পালিব্রোথার (পাটলীপুত্রে) স্থানান্তরিত করেন।

অশোকের মাতার নাম সুভদ্রাঙ্গী। অশোকের জন্ম পরিগ্রহণে মাতার শোক দূরীভূত হইয়াছিল, সেই হেতু সন্তান অশোক নামে অভিহিত হয়।

অশোক প্রথম অবস্থায় হিন্দু ছিলেন। ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিলনা। তাঁহার চরিত্র উশৃঙ্খল এবং প্রকৃতি কঠোর ছিল। কথিত আছে তিনি তাঁহার দুষ্ট বুদ্ধি মন্ত্রী রাধা গুপ্তের সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীমকে রাজ্যচ্যুত এবং অবশেষে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়া পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। অশোক এইরূপ কতকগুলি অন্যায় এবং বিগর্হিত কার্য্য করিয়া সেই সময়ে "চণ্ড" নামে অভিহিত হয়েন। চণ্ডগিরি নামে একটী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির অনুচরও তাঁহার ছিল, তাহাদ্বারা তিনি নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যাদি করাইতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না।

---

‡ অশোকের সময় নির্দ্ধারণ সাপক্ষে সমসাময়িক গ্রীকরাজগণের উল্লেখ অসঙ্গত নহে। অশোক প্রচারিত ত্রয়োদশ শৈল অনুশাসনে প্রকাশ, প্রিয়দর্শী (অশোক) বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার ও বিদেশিক রাজগণের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন জন্য নিম্নলিখিত গ্রীক রাজগণের নিকট প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এণ্টিয়োকায়না (সিরিয়ারাজ এণ্টিয়োকাস্)	রাজত্বকাল	২৬১—২৪৭	খ্রীঃ পূঃ
তুরাময় (ইজিপ্টরাজ টলেমি)	,,	২৮৫—২৪৬	,,
গঙ্গাকেনা (মেসিডনরাজ এণ্টিগনাস গনেটস্)	,,	২৭৬—২৪৩	,,
অলিকসুনারি (ইপিরাসরাজ ২য় আলেকজণ্ডার)	,,	২৭২—২৫৪	,,
মকা (কিরিনের রাজা মগাস্)	,,	৩০৮—২৫৮	,,

অশোক রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে এই সকল স্থানে প্রচারক প্রেরণ করেন। উল্লিখিত পঞ্চ গ্রীক রাজ মধ্যে মগাস সর্ব্বাগ্রে প্রাণত্যাগ করেন। মগাসের সহিত অশোক-দূতের সাক্ষাৎ স্বীকার করিতে হইলে অশোকের রাজ্যারম্ভকাল মগাসের মৃত্যু হইতে অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৭৫ খ্রীঃ পূঃ সিংহল ইতিহাস উল্লিখিত সময়) অঙ্ক স্বীকারই সমীচীন।

অশোকের প্রথম জীবনের সহিত বিজড়িত এই সকল উদ্ভট গল্পাবলী সমর্থনের ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব। তাই আপাততঃ তাঁহার জীবনের কিংবদন্তি মূলক এইরূপ অন্যান্য অপ্রামাণ্য অংশের আলোচনায় বিরত হইতে বাধ্য হইলাম।

অশোক, রাজত্বের অষ্টম বৎসরে কলিঙ্গ বিজয় করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের শৌর্য্যবীর্য্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ঐ যুদ্ধে প্রভূত লোকক্ষয় হয়। রুধির স্রোতে কলিঙ্গ প্লাবিত হইয়া যায়। সেই রুধির প্রবাহ সন্দর্শন করিয়া অশোকের কঠিন হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি অচিরাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। অশোকের ধর্ম্ম গুরুর নাম উপগুপ্ত।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বুদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। গিরিলিপি, গুহালিপি এবং স্তম্ভলিপি গুলিও এই সময় হইতে খোদিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত পনরটী গিরিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল গিরিগাত্র তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ হইতে ষড়্‌বিংশতি বর্ষ মধ্যে খোদিত হইয়াছিল। গিরিলিপি গুলি নিম্নলিখিত স্থানে প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে।

১। কপুর্দ্দ গিরি—পেশোবারের নিকট।
২। খলসি—হিমালয়ের অভ্যন্তরে গঙ্গোত্রীর নিকট।
৩। গিরনার (জীর্ণ নগর)—গুজরাটে।
৪। ধউলী (ধবল গিরি)—উড়িষ্যায়।
৫। জৌগরা— ঐ
৬। সাহাবাজ গিরি—কাশ্মীরের পশ্চিম।
৭। সুপারা—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত টানা জিলায়।
৮। মানসেরা
৯। সাসেরাম—সাহাবাদ জেলায়।
১০। রূপনাথ—মধ্য প্রদেশে।
১১। বিরাট—রাজপুতনায়।
১২। বাব্রে— ঐ
১৩। সিদ্ধপুর—মহীশূর
১৪। ঐ— ঐ
১৫। ঐ— ঐ

উপর্য্যুক্ত পঞ্চদশ সংখ্যক গিরিগাত্র হইতে অনেকগুলি অনুশাসন সংগ্রহ করা হইয়াছে। ঐ সকল অনুশাসনে অশোক তাঁহার রাজত্বে প্রবর্ত্তিত নিয়মাদি ও নিজ জীবনের অনেক তত্ত্ব প্রকটিত করিয়া

গিয়াছেন। নিম্নে তাহার কয়েকটী অনুশাসনের সারাংশ উদ্ধৃত হইল।

১ম অনুশাসনে—জীব হত্যা নিবারণ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে.
২য় ,, মনুষ্য এবং ইতর প্রাণীর প্রতি সমভাবে চিকিৎসা ও লালন পালনের ব্যবস্থা,
৩য় ,, পঞ্চসনা ধর্ম্মোৎসবের প্রচলন,
৪র্থ ,, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ব সাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার আজ্ঞা,
৫ম ,, ধর্ম্মোপদেষ্টা ও প্রচারক নিযুক্তির বিবরণ,
৬ষ্ঠ ,, নৈতিক শিক্ষাগুরু নিযুক্তির বিবরণ,
৭ম ,, অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিষেধ আজ্ঞা,
৮ম ,, সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রসঙ্গালোচনার ব্যবস্থা,
৯ম ,, ধর্ম্মোপদেশের উপকারিতা জ্ঞাপন,
১০ম ,, ধার্ম্মিকের যশ ও প্রশংসা বাদ,
১১শ ,, ধর্ম্মোপদেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন,
১২শ ,, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে সম্মান ও ধর্ম্মবিষয়ক সম্মিলনের উপদেশ
১৩শ ,, রাজ্যের পরিমাণ, কলিঙ্গবিজয়, এবং ৫জন গ্রীক রাজের নাম ও তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণের বিবরণ ইত্যাদি আলোচিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

খলতি, নিগাই ও বিশঝোপে তিনটী গুহা লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুহা লিপিগুলি হইতে অশোকের দানশীলতার ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের পরিচয় ব্যতীত অন্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা কিছু অবগত হওয়া যায় না।

এপর্য্যন্ত দশটী স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐদশটী স্তম্ভে চতুর্ব্বিংশতি অনুশাসন খোদিত ছিল। স্তম্ভ দশটী নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত।

দিল্লীতে দুইটী, প্রয়াগে দুইটী, ত্রিহুতে দুইটী, সাঞ্চিতে একটী, চাম্পারণে তিনটী, মোট ১০টী।

স্তম্ভলিপি গুলি গিরিগাত্র খোদিত অনুশাসন গুলির প্রতিধ্বনি এবং সমর্থক, তাই কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

১ম অনুশাসনে—প্রিয়দর্শী ধর্ম্মগুরুদিগকে উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন।
২য় ,, প্রচারিত ধর্ম্ম, দয়া, দানশীলতা, সত্য এবং পবিত্রতা ময় হউক ইচ্ছা করিয়াছেন।
৩য় ,, পাপকার্য্য পরিত্যাগ এবং আত্মজিজ্ঞাসু হইবার উপদেশ দান করিয়াছেন।
৪র্থ ,, রাজুক বা ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের ক্ষমতাবৃদ্ধি করিয়াছেন।
৫ম ,, জীবহত্যা নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।
৬ষ্ঠ ,, সাধারণের প্রতি তাঁহার সাধু ইচ্ছা ঘোষণা করিয়াছেন।
৭ম ,, তাঁহার প্রবর্ত্তিত অনুশাসন মানবমণ্ডলীকে সৎপথে পরিচালিত করিবে আশা করিয়াছেন।

৮ম অনুশাসনে—প্রিয়দর্শী আশা করিতেছেন তাঁহার কার্য্যসকল সাধারণের পক্ষে উপকারী হইয়া তাহাদিগকে নীতিপথে পরিচালিত করিবে।

দেখা যাইতেছে উপর্য্যুক্ত যাবতীয় লিপিমালায় তাহা প্রিয়দর্শী নামক জনৈক ভারতীয় নৃপতির সম্পাদিত অনুশাসন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। তবে আমরা ইঁহাকে অশোক বলিয়া কি প্রকারে অনুমান করিতে পারি এবং তৎসম্পাদিত লিপিমালাই বা কি প্রকারে অশোকের সম্পাদিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ?

অশোক "কাকবর্ণ" এবং "চণ্ড" নামেও পরিচিত ছিলেন কিন্তু তৎকালে তিনি প্রিয়দর্শী নামে পরিচিত ছিলেন এইরূপ উল্লেখ কোন গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়না। প্রিয়দর্শী নামে কোন প্রতাপান্বিত নরপতিও তৎ-কালে বা কোন কালে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক বিপুল গৌরবে সুমেরু হইতে সিংহল এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত আপন প্রভুত্ব ও সম্মান বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন এরূপও প্রকাশ পায়না।

প্রিয়দর্শীর খোদিত অনুশাসন গুলির সহিত অশোকের সম-সাময়িক কীর্ত্তি কলাপের আলোচনা করিলে অশোককেই প্রিয়দর্শী বলিয়া মনে করিবার অনুমাত্রও কারণাভাব দৃষ্ট হইবে না। বুদ্ধ গ্রন্থ রস বাহিনী এবং দ্বীপবংশের আলোচনায় টার্নার সাহেবও এসিয়াটীক সোসাইটীর জার্ণেলে প্রিয়দর্শীকে অশোক বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। অতএব এতৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

উপর্য্যুক্ত কিংবদন্তি ও ঐতিহাসিক মূল গ্রহণ করিলে অশোকের জীবন দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম ভাগ—কলিঙ্গবিজয় পর্য্যন্ত বৈষয়িক জীবন। ২য় ভাগ—দীক্ষার পর হইতে ধর্ম্ম জীবন।

সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সম্মান লাভ করিবার পক্ষেও তাঁহার দুইটী উপাদান বর্ত্তমান ছিল। ১ম—অসি। ২য়—ধর্ম্মপ্রাণতা।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার জীবনের এক মহা পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়াছিলেন। ভোগ লিপ্সার পরিবর্ত্তে এক মহিমাময় নবজীবন আসিয়া তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হইল। তিনি

অসি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মই তাঁহাকে রাজ-চক্রবর্ত্তীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। অসির সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের সাহায্যে তিনি ভারতে বিপুল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিলেন। হিমগিরির পাদদেশ হইতে গোদাবরী সলিল-সিক্ত দাক্ষিণাত্যের মহারণ্য, সিন্ধুর প্রশস্ত প্রান্তর হইতে ব্রহ্মের বিজন কানন পর্য্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

অশোক সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা ও প্রজার সম্পত্তি শাসন সংরক্ষণ জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য "মহামাত্য" বা প্রধান রাজকর্ম্মচারী, রাজ্যের সীমা রক্ষার জন্য "অন্ত মহামাত্য" বা সীমান্তরক্ষক, ধর্ম্মোপদেশের জন্য "রাজুক", গুপ্ত সংবাদ বহন জন্য প্রাদেশিক বা গুপ্তচর এবং প্রাদেশিক শাসনকার্য্যের জন্য "প্রতিবেদক" (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত ছিল।

সাধারণের উপকারার্থে তিনি রাজবর্ত্মের পার্শ্বে, প্রতি অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে কূপ খনন ও বৃক্ষাদি রোপণ, স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা ও চিকিৎ-সালয় সংস্থাপন, এবং স্থানে২ বহু-সংখ্যক বৌদ্ধ চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন মনুষ্য এবং ইতর প্রাণীর জন্য পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপ অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও সাধারণের সুবিধা বিধান করিয়াঅশোক ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হন। এই সময় (রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে) অশোক ধর্ম্ম প্রচারকল্পে "ধর্ম্মমহামাত্য" পদের সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

অশোক ধর্ম্ম-প্রচারে লিপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসন্ধান বিষয়ক পঞ্চসনা উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কয়েদীদিগকে সংযম এবং সাধনাদ্বারা ধর্ম্মজীবনলাভের উপদেশ প্রদান করিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ এবং বেদের প্রভুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইবার পথে অগ্রসর হইতে থাকিলেও তিনি নিজে বুদ্ধ-সন্ন্যাসী

দিগকে যেরূপ ভক্তি করিতেন ব্রাহ্মণদিগকেও সেইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতিও তিনি সহানুভূতি শূন্য ছিলেন না।

রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার ও বৌদ্ধশাস্ত্রাদির উদ্ধার এবং আলোচনার জন্য রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের ৩য় মহাসমিতির অধিবেশন হয় *। এই অধিবেশনে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল শাস্ত্র ত্রিপিটকের † উদ্ধার ও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের প্রসঙ্গ স্থিরীকৃত হয়। অতঃপর অশোক চারিদিকে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রচারকগণ বুদ্ধ-ভস্ম ও বোধিদ্রুমের শাখা লইয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। নিম্নলিখিত প্রচারকগণ নিম্নলিখিত দেশ সমূহে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

প্রচারক	দেশ
মজ্ঝান্তিক	গান্ধার [কান্দাহার]
মহারক্ষিত	যোন লোক [সিরিয়া, কিরিন ইজিপ্ট ইপিরাস মেসিডন প্রভৃতি গ্রীকরাজ্য]
মজ্ঝম	হিমবন্ত [তিব্বত]
সোনো ও উত্তর	‡ সুবর্ণ ভূমি [মালব]
মহেন্দ্র ও সঙ্গমিত্ত	তম্বপানি বা তপ্রবন [সিংহল]
রক্ষিত	বনবাসি [কানাডা]
মহাদেব	মহীশ [মহীশূর]
ধর্ম্ম রক্ষিত	অপরন্তক [বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর]
মহারক্ষিত	মহারষ্ঠ [মহারাষ্ট্র]

এইরূপে মহারাজা অশোক স্বীয় বাহুবলে ভারতে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব

* ১ম অধিবেশন ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ রাজগিরিতে ও ২য় অধিবেশন ৩৭৭ খ্রীঃ পূঃ বিশালিতে অনুষ্ঠিত হয়।

† বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক তিন অংশে বা পিটকে বিভক্ত, সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম্ম।

[ক] বুদ্ধদেব স্বয়ং যে কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাকে "সূত্র" কহে।

[খ] ধর্ম্মনীতি ও নিয়মাবলীকে "বিনয়" কহে।

[গ] বৌদ্ধ দর্শন ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা সমূহকে "অভিধর্ম্ম" কহে।

‡ সুবর্ণভূমি—মহাবংশের অনুবাদক টার্নারের মতে বর্ম্মা, লেসিনের মতে আরব্য এবং পারস্য উপকূলদ্বয়।

প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্মবলে ইয়ুরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়ায় প্রভুত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। ষড়্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষ রাজত্বের পর তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন।

অশোকের তিরোভাবের পর, অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য, আলেকজাণ্ডারের জিতরাজ্য সমূহের ন্যায়, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অশোক নাই। দ্বিসহস্রাধিক বৎসর হইল তাঁহার রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ আজও জগৎকে অনন্ত শিক্ষা দান করিতেছে।

অতঃপর পুরাণ ও অপরাপর গ্রন্থাদি অবলম্বনে মৌর্য্যবংশের একটী তালিকা প্রদান করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মৌর্য্যবংশের তালিকা সংগ্রহে পুরাণাদির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই; তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রম শূন্য নহে।

পুরাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় Indo Aryan এ চন্দ্রগুপ্তকেই মৌর্য্যবংশের প্রথম এবং শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিতে চান। পালি "মহাবংশে" তিনজন, মৎস্যপুরাণে ৪ জন, বায়ু পুরাণে ৯ জন, শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণু পুরাণে ১০ জন নৃপতির রাজত্ব কাল বর্ণিত হইয়াছে। বায়ু পুরাণের মতে নয় জন এবং ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণ মতে দশ জন নরপতি ১৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। বায়ু পুরাণের শ্লোকমালা হইতে ১২৩ বৎসর মাত্র নয় জন নৃপতির রাজ্যশাসন কাল অবগত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নামাবলীর সহিত ও উপর্য্যুক্ত পুরাণ সমূহের মধ্যে ঐক্য লক্ষিত হয় না। বায়ু পুরাণ মতে নিম্নলিখিত মৌর্য্য নৃপতিগণ মগধে রাজত্ব করিয়াছেন—

(১) চন্দ্রগুপ্ত ২৪, (২) ভদ্রসার ২৫, (৩) অশোক ২৬, (৪) কুণাল ৮, (৫) বন্ধুপালিত ৮, (৬) ইন্দ্রপালিত ১০ (৭) দেব ধর্ম্মা ৭, (৮) শতধর ৮, (৯) বৃহদ্রথ ৭, মোট ১২৩ বৎসর।

উক্ত পুরাণ ১২৩ বৎসরের হিসাব প্রদান করিয়া তৎস্থলে ১৩৭ বৎসর উল্লেখ করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। ইহা হইতেই বায়ু পুরাণকে

সম্পূর্ণরূপে ভ্রম বর্জ্জিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বিষ্ণু পুরাণের মত সমীচীন বোধে তাহা ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে মৌর্য্যবংশের তালিকা প্রদত্ত হইল।

মৌর্য্যবংশের তালিকা।

(১) চন্দ্রগুপ্ত, ৩২০—২৯১ খ্রীঃ পূঃ। *

(২) বিন্দুসার, ২৯১—২৭৫ খ্রীঃ পূঃ। †

সুসিম — নিগ্রোধ

(অশোকের অপর ভ্রাতৃগণ অশোক হস্তে নিহত হন।)

(৩) অশোক, ‡ ২৭৫—২৩৬ খ্রীঃ পূঃ — বীতশোক

(৪) সুযশা (কুণাল বা ধর্ম্মবর্দ্ধন) ২৩৬—২২৮,

জলোক (গান্ধার কাশ্মীর প্রভৃতির শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন।)

মহেন্দ্র — সঙ্ঘমিত্ত (কন্যা) সিংহলে দেহত্যাগ করেন।

(৫) দশরথ § ২২৮—২২০

(৬) সঙ্গত, ২২০—২১৩,

(৭) শালিশোক, ২১৩—২০৭

(৮) সোমাশ্রম, ২০৭—২০৩

(৯) শতধন্বা, ২০৩—১৯৯,

(১০) বৃহদ্রথ, ১৯৯—১৯৩ খ্রীঃ পূঃ,

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

* বিষ্ণুপুরাণ মতে ২৪ বৎসর। † বিষ্ণুপুরাণ মতে ২৮ বৎসর। ‡ বিষ্ণুপুরাণ মতে ৪১ বৎসর।

§ শ্রীমদ্ভাগবতে দশরথকে বৃহদ্রথের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা সঙ্গত নহে।

ভুলি নাই।

১

ভুলি নাই, ভুলি নাই!
আজিও হেরিলে চাঁদ, মনে পড়ে মুখ ছাঁদ।
আকুলি বেকুলি তাই, সে নীল অকুলে চাই!
ভুলি নাই, ভুলি নাই!

২

ভুলি নাই, ভুলি নাই!
যদিও শীতের হাওয়া, বুকে করে আনা যাওয়া,
তবু দূর মলয়ার শুভ সমাচার পাই!
ভুলি নাই, ভুলি নাই!

৩

ভুলি নাই, ভুলি নাই!
সেই বন, সেই কুল, সেই পুণ্য, সে মুকুল,
সেই সান্ত্বনার মুখে ঘুম-ঘোরে চুমো খাই!
ভুলি নাই, ভুলি নাই!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

—০ঃ(*)ঃ০—

সম্প্রদান।

(১)

"আমার বিষয় তবে এই শেষ হলো বুঝি?"

"হুঁ শেষ বই কি—আমি কি জাত খোয়াতে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেম?"

"তবে এখন বিদায় হ'তে পারি?"

" সে আপনার ইচ্ছা।" এই বলিয়া নায়েব হরনাথ রায় পিঙ্গল গোপাচ্ছাদিত বৃদনবিবরে গুড়্গুড়ীর নলটা প্রবেশ করাইয়া সজোরে ধূম্র উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন। ফরাসের উপর ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, আত্মীয় কুটুম্ব; বন্ধু বান্ধব, মোসাহেব, উমেদার ইত্যাদি হরকছম লোক নায়েব মহাশয়কে ঘেরাও করিয়া বসিয়াছিল। কাহারও মুখে কথাটী নাই। সকলেই কর্ত্তার মেজাজের উষ্ণতা অনুভব করিয়া অনেক কষ্টে রসনাটীকে বত্রিশ খুঁটীর ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

প্রথম বক্তা একটু পরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কর্কশ স্বরে বলিলেন " বেহাই মশাই, আপনার মনে যা ছিল তাতো হলো; কিন্তু যদি ধর্ম্ম থাকেন, তবে একদিন এর বিচার হবেই হবে। রামকৃষ্ণ ঘোষের বংশের এপর্য্যন্ত এমন অপমান কেউ কখনও করেনি," এই বলিয়া বক্তা দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

নায়েব মহাশয় মুখের নলটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কি বলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু বক্তা তখন অনেকটা ছাড়াইয়া গিয়াছেন দেখিয়া কেবল মাত্র " দেখা যাবে," বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

(২)

গোবিন্দপুরের বাবুদের বিস্তৃত জমিদারী। হরনাথ রায়, বাবুদের সদর নায়েব। রায় মহাশয়ের নিজ গ্রাম রায়পুরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি জমিদারীর এলাকাভুক্ত থাকায়, নায়েব মহাশয়কে সময় সময় বাড়ীতে বসিয়াই মহালের তদ্বির তদারক করিতে হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার বছর খানিক পূর্ব্বে নায়েব মহাশয়, বিষ্ণুপুরের গোবিন্দ ঘোষের নবম বর্ষীয়া কন্যা কৃষ্ণকামিনীর সহিত, নিজ পুত্র বিনয়ভূষণের বিবাহ দিয়া ছিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই, ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ, সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। বাড়ী আসিয়াই অরবিন্দ, পরদিন গঙ্গাধর ঘোষের বাড়ী যাইয়া কাকী মাকে প্রণাম করিলেন। অবশ্য সেখানে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থাও

হইয়াছিল, তবে সে পৃথক্ ভাবে।

নায়েব মহাশয়ের কুল-পুরোহিত, পঞ্চানন ঠাকুর ঘটনাক্রমে সে দিন বিষ্ণুপুরে উপস্থিত ছিলেন। কথাটা তাঁর কাণে গেল। কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ উপলক্ষে কন্যাকর্ত্তার সহিত বিদায়ের পরিমাণটা লইয়া ঠাকুরের একটু মাঝারি রকমের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, ঠাকুর সে কথাটা আজও ভুলিতে পারেন নাই। পুরাণে শুনিতে পাই ব্রাহ্মণের ক্রোধ দপ্ করিয়া জ্বলিয়াই নিভিয়া যাইত, কিন্তু এখন আর তা হয়না; দিন দিন শিকড় গজাইতে থাকে। পঞ্চানন ঠাকুরের মনোমালিন্যেও শিকড় গজাইয়া ছিল সন্দেহ নাই।

ঠাকুর কথাটা শুনিয়া সেই দিনই তল্পী বাঁধিয়া বাড়ী যাত্রা করিলেন, এবং অবিলম্বে রায়পুর যাইয়া ঘটনার উপর অনেকখানি রং ফলাইয়া তাহা নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন, তিনি বলিলেন তিনি বৌমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; তাঁর সম্মুখেই ম্লেচ্ছটাকে লইয়া সকলে এক সঙ্গে আহারাদি করিল, আর তিনি রাম রাম বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ইত্যাদি। শুনিয়া নায়েব মহাশয়ের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন " ম্লেচ্ছের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আবার আমি ছেলের বিয়ে দিব।" গিন্নী অতি দৃঢ়তার সহিত সংকল্প পরিত্যাগের অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ভালরূপে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিলনা।

আজ গঙ্গাধর ঘোষ কন্যাকে লইয়া নৌকা করিয়া বেহাইর নিকট আসিয়াছিলেন। তারপর যাহা ঘটিয়াছে পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন।

(৩)

ভাদ্র মাস, ছোট নদীটী দুই কূল ছাপাইয়া সবেগে ছুটিয়া চলিতেছে। দুধারের ছোট বড় গাছ পালা গুলির অনেকেই সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নদীবক্ষে আত্ম সমর্পণ করিতেছে।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, একটা ঘাট হইতে একটু দূরে দুইখানা নৌকা বাঁধা ছিল, জল হইতে ডাঙ্গারদিকে একটা পরিষ্কার সমান জায়গার উপর দুইটা কাঁঠাল গাছ, একটা তাল গাছ, একটা কদম গাছ ও একটা আম গাছ পাশা পাশি হইয়া বেশ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেই ছায়াতে পরদা খাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহার ভিতর স্ত্রীলোকেরা রান্না করিতেছিলেন। একটী যুবক কদম গাছটার গোড়ায় হেলান দিয়া বসিয়া একখানা বই পড়িতে ছিলেন। একটা বেওয়ারিশ্ পাড়াবেড়ানু কালমুখো বুভুক্ষু কুকুর পরদার ভিতরের দিকে লেলিহান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, হামাগুড়ি দিয়া লেজটা নাড়িতে নাড়িতে "কুছ্ মিলেগা কি নেই" যেন এম্নি একটা কিছু মনের ভাব প্রকাশ করিতেছিল। মাঝি মাল্লারা জলে নামিয়া স্নান করিতেছিল। এক খানা নৌকার পেছনের দিকে কয়েকটী অজনন্দন কতকগুলি কাঁঠালের পত্রশূন্য ডালের ভিতর হইতে বদনমণ্ডল বহির্গত করিয়া ম্যাঁ ম্যাঁ শব্দে নিজ নিজ ক্ষীণকণ্ঠ বাজাইতেছিল।

এমন সময় নিকটস্থ পাড়ার রামের মা বুড়ী দুটী মেয়েকে সঙ্গে লইয়া একখানা ছেঁড়া গামছা ও একটা ঘটী হাতে ধীরে ধীরে আসিয়া ঘাটের কূলে দাঁড়াইল। বুড়ী ঘাটে আসিয়াই দেখিতে পাইল নদীর ধারে কতকগুলি লোক রান্না করিতেছে। তার বড় সাধ হইল সেখানে যাইয়া একটু আলাপ পরিচয় করিয়া আসে। কাজেই মেয়ে দুটীকে লইয়া গাছতলায় যাইয়া হাজির হইতে তাহার বড় বেশী বিলম্ব হইল না। যেখানে মেয়েরা ছিলেন, বুড়ী সেখানে যাইয়া সটান ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। মেয়ে দুটীও তাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াইল।

গিন্নী তখন পান সাজিতে ছিলেন। রামের মায়েরদিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমাদের বাড়ী কোথায় গা?"

বুড়ী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল "ঐ পাড়ায় আমাদের বাড়ী।"

"তোমরা বুঝি কায়েত?"

"হাঁ মা—এই যে ছোট মেয়েটী দেখ্‌ছো" এই বলিয়া বুড়ী মেয়ে দুটীরদিকে চাহিয়া বলিল—"বোস্‌না খুকী, তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ওঁরাও কায়েত, বড় ঘরের মেয়ে।" গিন্নী দেখিলেন মেয়ে দুটীকে বোস্‌তে না দেওয়া ভাল হয়েনি। তখন একটু ব্যস্ত হ'য়ে একখানা আসন দিয়ে বলিলেন "বোস মা বোস" কি যে মন হয়েছে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ, আমার যেন তা জ্ঞানই নাই।" এই বলিয়া গিন্নী নিজে উঠিয়া হাত ধরিয়া মেয়ে দুটীকে বসাইলেন। মেয়ে দুটীর বয়েস বার কি তেরোর মাঝামাঝি হইবে। উভয়েই প্রায় সমবয়সী তবে দুই চার মাসের ছোট বড় হতে পারে।

বুড়ী আবার বলিতে লাগিল "হাঁ মা এই যে ছোট মেয়েটী দেখ্‌চো ওর বাপের পেরজা আমরা; বাছা রাম আমার এদেরই জমি জিরাত চাষ বাস করে কোনরূপ কায়ক্লেশে এত বড় সংসারের বোঝাটা বহিয়া চলিতেছে।"

"বড় মেয়েটী ওর কে হয়?"

"ওটি খুকীর বড় পিসী কালীগঙ্গার মেয়ে; মেয়েটী বড় ভাল তবে কপাল মন্দ" এই বলিয়া বুড়ী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একবার চক্ষু মুছিল। কিন্তু তখন চক্ষু মুছিবার কোন আবশ্যক ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়না।

যে যুবক গাছ তলায় বসিয়া বই পড়িতেছিলেন, তাঁহার পাঠের ক্রিয়াটা বুঝি তখন রীতিমত হইতেছিল না। যেখানে রান্না বাড়া হইতেছিল, সেখানে আসিবার বুঝি বা একটু বিশেষ আবশ্যকতা পড়িয়া গেল। যুবকদের মাঝে মাঝে এরূপ আবশ্যকতা পড়িয়াই থাকে! তিনি বই খানা হাতে করিয়াই ধীরে ধীরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা রান্না হয়নি?" গিন্নী বলিলেন "না এখনও হয়নি; একটু জল খাবারের খাও" এই বলিয়া যুবকের হাতে কিছু মিঠাই আনিয়া দিলেন। যুবক সেখানে দাঁড়াইয়াই খাইতে লাগিলেন। এবং বুঝিবা তখন তাহার

রসনার ক্রিয়া ছাড়া আরও একটা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সতেজে চলিতেছিল। গিন্নী অনেক অনুরোধ করিয়া মেয়ে দুটীকে কিছু কিছু খাবার দিলেন। নিজে একটা পান মুখে দিয়া বুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁগা মেয়ে দুটীর বিয়ে হয়েছে?" বুড়ী তখন ছোট মেয়েটীকে দেখাইয়া বলিল "খুকীর এখনও বিয়ে হয়নি; পুঁটীর হয়েছে। তবে ওর কপাল মন্দ বলেই যা দুঃখু।"

"কেন গা কি হয়েছে?"

"এই দেখনা মা! পোড়া লোকের মুখে আগুন, যা নয় তাই বলে ওর শ্বশুরের মন ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে,, তাই ওর শ্বশুর আর জিজ্ঞেস করে না। ছেলের নাকি আবার বিয়ে দিবে। এমন কাজও করে!

এই বলিয়া বুড়ী আবার চোক্ মুছিতে লাগিল। মেয়েটী তখন মুখ নীচু করিয়া খুঁটে খুঁটে একটু মিঠাই মুখে দিতেছিল। গিন্নী বার বার তার দিকে তাকাইতেছিলেন। তারপর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "মেয়েটীর বিয়ে হয়েছে কোথায়?"

"ঐ যে কি বলে ছাই মনেও হয় না—ওর শ্বশুর খুব বড় লোক তার শশুরের নামে বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খায়। তার কত ভাত পশু পক্ষীতে খায়, আর এই মেয়েটার তার ঘরে একমুঠা ভাত জুট্‌লো না।" বুড়ী এবার সত্য সত্যই দু ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল

বুড়ী চক্ষু মুছিয়া তাড়াতাড়ী বলিল—"মনে হয়েছে মা, পুঁটীর শ্বশুর খুব বড় লোক, জমিদারের নায়েব। পুঁটীর বাপ গঙ্গাধর ঘোষ মাঝে মাঝে এখানে বেড়াইতে আইসেন, তাঁরই মুখে শুনেছি, রায়পুরের হরনাথ রায়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে"। বুড়ীর কথা শেষ হইতে না হইতে ঝনাৎ করিয়া গিন্নীর হাতের পানের বাটা মাটীতে পড়িয়া গেল; যুবক সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইলেন। যাবার সময় ব্যস্ততা বশতঃ একটা পা, বেচারা কুকুরের ঘাড়ে চাপিয়া পড়িল কুকুরটা খ্যাঁও খ্যাঁও রবে গ্রামের দিকে ছুটিয়া চলিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী।

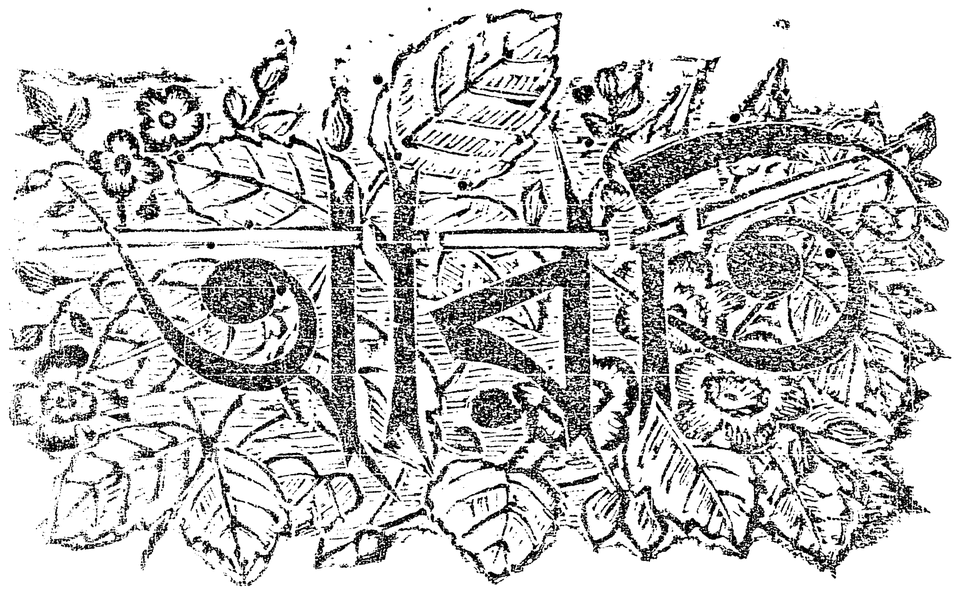

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত।

সাল—১৩০৭

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

শ্রীমতী কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রমোহন চন্দ, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী পত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা		বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	আমি	৩৩	৬।	মাসিক সাহিত্য	৬২
২।	রমণী (কবিতা)	৩৯	৭।	মালঞ্চ—	
৩।	রাজমালা	৪১		তুমি যদি	৬৩
৪।	সম্প্রদান (গল্প)	৪৮		তৃষিত	৬৩
৫।	বেদ	৫২		পাপ স্বপ্রকাশ	৬৩
				কদম্ব	৬৪

নিবেদন—পরিচিত অপরিচিত অনেক গণ্য মান্য বিদ্যোৎসাহী মহোদয় নিকট আরতি প্রেরিত হইয়াছে। কেহ কেহ মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। কেহ বা ২য় সংখ্যা V. P. তে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। যাঁহারা V. P. তে পাঠাইতে লিখিয়াছেন তাঁহাদের পত্রিকা V. P. তে প্রেরিত হইল। যাঁহারা এপর্য্যন্ত মূল্য প্রেরণ করেন নাই আশা করি ২য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আরতির ১ম বর্ষের মূল্য দানে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। আরতি তাঁহাদিগের মাতৃ ভূমির পত্রিকা বলিয়া স্মরণ থাকিলেই আরতির যত্ন ও উদ্যম সফল হইবে মনে করি।

কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে অনেকে ইচ্ছা করিয়াও টাকা পাঠাইতে পারেন না। যাঁহারা ২য় সংখ্যা পাইয়া টাকা না পাঠাইতে পারেন তাঁহাদের নামে ৩য় সংখ্যা V. P. তে প্রেরিত হইবে। কাহারও আপত্তি থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে লিখিবেন; আদেশানুযায়ী কার্য্য করিব।

☞ আরতিতে ময়মনসিংহের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। ২। ১ সংখ্যার ভিতরই কোন২ বিষয় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। এ সদনুষ্ঠানে স্বদেশীয় মহোদয়গণের প্রচুর সহানুভূতি আবশ্যক। কোন স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তি আমাদিগকে কোন তত্ত্ব (প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি, প্রচলিত গাল গল্প, ছড়া, প্রাচীন বংশ তালিকা বা অন্য যে কোন বিষয়) প্রদানদ্বারা সাহায্য করিলে আমরা ধন্যবাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিব ও যথাস্থানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।

সম্পাদক

ময়মনসিংহ বাসন্তী যন্ত্রে—শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত দ্বারা মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আমি।

প্রথম প্রস্তাব।

অশীতিপরবয়স্ক ঠাকুরদাদা মহাশয় বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বসিয়া আছেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ক্রমশঃ শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তিনি এখন চোকে কম দেখেন—কাণে কম শোনেন। একে দর্শনশ্রবণশক্তির প্রাখর্য্য লোপ হইয়া [illegible] তাহাতে আবার বান্ধ্য-তিমিরের গাঢ়তার পদার্থ [illegible] অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর করিয়া ফেলিতেছে। এমন [illegible] ঠাকুরদাদার প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু রামসদয় মিত্র মহাশয় ধীরে ধীরে [illegible] করিয়া যষ্টিশব্দ সহকারে বৈঠকখানার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। [illegible] যষ্টির শব্দ শ্রবণ মাত্র ঠাকুরদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" উত্তর হইল "আমি"। শব্দটী সুস্পষ্টরূপে শ্রুতিগত না হওয়ায় ঠাকুরদাদা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "কে"? পুনর্ব্বার সেই উত্তর—কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হইল "আমি"। এবার ঠাকুরদাদা শব্দ শুনিলেন, কণ্ঠস্বর চিনিলেন এবং ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "আরে রামসদয় ভায়া যে, এস এস—অনেকদিন তোমাকে দেখি নাই কেন?" তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের আলাপ হইল। নানাবিষয়িণী সুখদুঃখপ্রসঙ্গিনী কথাবার্ত্তার পর মিত্রমহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরদাদা মহাশয় পুনরায় একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময়ে [illegible] ছোট ছোট শব্দ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "কে ও"? এবার গম্ভীর স্বরে উত্তর পাইলেন "আমি"। শব্দ শুনিয়া ও স্বর চিনিয়াই ঠাকুরদাদা বলিলেন "নবীন! রামাকে ডেকে দাও ত ভাই, আমার জন্য কটু খাবার জল আনুক।" নবীনচন্দ্র ঠাকুরদাদার জ্যেষ্ঠ পৌত্র এবং রামচন্দ্র বা রামা তাঁহার দাস। নবীন বহির্ব্বাটীর মধ্যে যাইয়া রামাকে না পাইয়া বাটীর দাসী জ্ঞানদার দ্বারা ঠাকুরদাদার জন্য জল পাঠাইয়া

দিল। জ্ঞানদা মৃদুমন্দপদক্ষেপে জলের গ্লাস হস্তে বৈঠকখানার সোপানে আরোহণ করিতেছিল, সোপান আরোহণের শব্দ শুনিবা মাত্র ঠাকুরদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আস্‌ছে?" জ্ঞানদা বলিল "আমি"। ঠাকুরদাদা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "জ্ঞানদা! কি চাস্‌?" জ্ঞানদা বলিল "আপনার জন্য জল এনেছি।" পরে ঠাকুরদাদা জ পান করিলেন, জ্ঞানদা গেলাস লইয়া চলিয়া গেল। ঠাকুরদাদা এবা একান্তমনে বসিয়া আছেন ও অনেক বিষয়িণী ভাবনায় লিপ্ত রহিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল। "আজ সন্ধ্যার প রামসদয় ভায়া, নবীনচন্দ্র ও জ্ঞানদা একে একে আমার নিকট আসিল,—অন্ধকারে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, পদশব্দ মা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'কে?' তিন জনেই একই উত্তর দি "আমি"। কেহই ত আপনার নাম বা পরিচয় বলিল না। আমি তাহাদের কণ্ঠস্বরে তাহাদিগকে চিনিয়া তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকি লাম ও আমার মনোভাব প্রকাশ করিলাম। লোকে নাম বলি পরিচয় না দিয়া কেবল "আমি" শব্দ উচ্চারণ করিয়াই নিজ পরি দিয়া থাকে ও তাহাতেই পরিচয়ের পূর্ণতা সাধিত হইল বলিয়া বিশ্ব করে!!" ঠাকুরদাদা এইরূপ ভাবনায় রত থাকুন। আমরা এ একবার "আমিত্বের" কিঞ্চিৎ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

আমাদের প্রবন্ধের শিরোদেশে আমরা দুইটী অক্ষরে এক 'আমি' শব্দমাত্র লিখিয়াছি। কিন্তু আর বেশী লিখিবার প্রয়োজন নাই ঐ দুইটীই যথেষ্ট। ভাষায় এমন মধুর, এমন ভাবব্যঞ্জক, এমন গৌর বর্দ্ধক এমন আসক্তিসম্পাদক শব্দ আর নাই। 'আমি' শব্দের কে মোহিনী শক্তি, কেমন অদ্ভুত আকর্ষণ? এই শব্দ যাহার সহিত সং লিত হয় তাহাকেই মধুর, তাহাকেই বিমল, তাহাকেই অনুরক্ত করি তুলে। আমার বাড়ী, আমার বাগান, আমার পুত্র, আমার শ আমার সম্পত্তি মনে হইলেই মনে অতুল আনন্দের সঞ্চার হ

তোমার সুধাধবলিত প্রকৃষ্টপ্রকোষ্ঠসজ্জিত নানাশোভায় ভূষিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ আমার নিকটে কিছুই নয়, কেননা ঐটী তোমার। আর এই জীর্ণদশাপ্রাপ্ত, ভগ্ন, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরটী আমার নিকট কতই শান্তিপ্রদ ও সুখারামদায়ক কারণ এইটী আমার। বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী কার্ত্তিকপ্রতিম ঐ বালকটী তোমার সুতরাং ওটী আমার কাছে কিছুই নয়। আবার এই যে নির্ব্বোধ "হাবা বোকা" এবং অতি কদাকার শিশুটী সম্মুখে উপস্থিত। এইটী আমার, অতএব এইটীই আমার প্রাণারাম। এইটী আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। এইরূপ আলোচনা, এইরূপ তুলনা এইরূপ বিচার বিতর্ক করিয়া যত দেখিবে ও ভাবিবে ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, যাহার সহিত 'আমার' শব্দ সংযোজিত করিয়া দিবে, তাহাই আসক্তির প্রভাবে মধুময় ও তৃপ্তিপ্রদ হইয়া উঠিবে। উষার তিরোভাব সময়ে বালারুণের নবীন কিরণরাজী মৃদু উজ্জ্বলভাবে ধীরে ধীরে সমাগত হইয়া, পৃথিবীস্থ অসংখ্য জাতীয় ও অসংখ্য অবস্থাপন্ন পদার্থ শ্রেণীর উপর নিপতিত হইলে, যেমন সকলপ্রকার পদার্থকেই এক অভূতপূর্ব্ব অভিনব প্রভায় পরিশোভিত করিয়া দেয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেই নবকরমালা সংস্পর্শে প্রত্যেক পদার্থই যেমন ক্ষণেকের নিমিত্ত বিমল হাসিতে হাসিয়া উঠে, তেমনই ভাবে যে কোন পদার্থের সহিত 'আমার' শব্দের সংযোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহাই অপূর্ব্বভাবে মনঃপ্রাণবিমুগ্ধকর ও পূর্ণসুধাময় হইয়া থাকে। এই "আমার" "আমার" ভাবের বিকাশ করিবার নিমিত্ত বৈয়াকরণগণ মমত্ব ও মমতা শব্দের ব্যবহার, ব্যবস্থা ও প্রয়োগ প্রথা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 'মমত্ব' বলিলেই অপূর্ব্ব স্নেহমায়া সূচিত হয়। 'আমি' বলিলে আর কোন পরিচয় দিতে হয় না, তাহার সদৃষ্টান্ত আলোচনা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিলাম। কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিলে "আমিই" যথেষ্ট পরিচয় বোধক। 'আমার' সংযুক্ত শব্দ মাত্রই আসক্তিব্যঞ্জক ও মনোহর। কিন্তু 'আমি' বলিলে কি বুঝায় তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

হস্তপদবক্ষমস্তকবিশিষ্ট এই শরীরটাই কি আমি? অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিও চীৎকার করিয়া বলিবে "না—শরীর বা শরীরের অংশসকল অবয়বগুলি কখনই আমি নয়"। কারণ "আমার হস্ত" 'আমার মস্তক' প্রভৃতি কথার ব্যবহার দ্বারাই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'আমার শরীর' যখন বলিয়া থাকি, তখন শরীরের অধিকারী একজন আছে, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। সুতরাং এই [illegible] "আমি"। এই আমি 'অহং' 'আত্মা' প্রভৃতি নানা সংজ্ঞাতে [illegible] এই আমিত্বের বা অহংতত্ত্বের আলোচনায় কবিগণ, [illegible] রহিয়া সাধকভক্তগণ নানাজনে নানাভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ শুনুন—ভক্তিমান্ শক্তিসাধক সংসার-জ্বালায় জ্বালাতন ও শান্তি প্রয়াসী হইয়া মনের আবেগে গাহিয়াছেন ;—

"কবে সমাধি হ'ব শ্যামাচরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে॥"

আবার ঐ শুনুন, অদ্বৈতভাবাপন্ন, বিবেক বৈরাগ্যব্যাকুল, বৈদান্তিকমতাবলম্বী ব্রহ্মবাদী জলদগম্ভীরস্বরে উপেদেশ ছলে গাইতেছেন;—

"অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ-মন জেনেও কি তা জান না?"

অন্য পরে কা কথা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

এই ত ব্যাপার। অহং তত্ত্বের উপর জ্ঞানী সাধক ভক্তগণের তীব্রদৃষ্টি। কিন্তু 'অহং' কি সহজে ত্যাগকরা যায়। যিনি যত উদার বিশাল, বা মহান্ ভাব প্রণোদিত হউন না কেন? 'আমিত্ব' দূর করিবার, অহংভাব হইতে মুক্তি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্ত্ব বোধে 'আমিত্বের' তারতম্য বা ইতরবিশেষ হইতে পারে। দুইটী দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা একথাটী বিশদ করিতেছি। শঙ্করের অবতার পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করের নাম

জগদ্বিখ্যাত। বেদান্ত ও উপনিষদের ভাষ্যকর্ত্তা বলিয়া তিনি যেমন জ্ঞানী মহতের শীর্ষস্থানীয়, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক বলিয়া তিনি তেমনই ধার্ম্মিক ভক্তগণের পূজনীয়। বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী অন্নপূর্ণাদেবীর নিকট তিনি ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া কহিতেছেন—

সন্ধ্যাত্রয়ে সকল ভূসুর সেব্যমানে
স্বাহা স্বধাসি পিতৃদেবগণার্ত্তিহন্ত্রি
জায়াসুতা পরিজনাতিথয়োঽন্নকামাঃ
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥

হে গিরিজে! আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া ভিক্ষা প্রদান কর এই প্রার্থনা; কিন্তু আমাকে দুটী অন্ন দিলে অন্নপূর্ণা নামের সার্থকতা হইবে না, এবং আমিও তাহাতে তৃপ্তি পাইব না, এইটী প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই বলিতেছি 'হে গিরিবালে, প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্ন সময়ে এবং সায়ংকালোপযুক্ত তিন সন্ধ্যায় ভূদেবব্রাহ্মণগণ তোমাকে সেবা করিয়া থাকেন। স্বাহারূপিণী হইয়া তুমি যজ্ঞের আহুতি মন্ত্রদ্বারা দেবগণের আর্ত্তিনাশ এবং স্বধাস্বরূপে তর্পণশ্রাদ্ধকালীন মন্ত্রদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাক। সেই ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধিকা হইয়া তাহাদের সর্ব্ববিধ প্রীতি সম্পাদন কর। তারপর জায়াসুত প্রভৃতি পরিবারবর্গ এবং সমাগত অতিথিগণ অন্নপ্রয়াসী হইয়া বুভুক্ষ অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে খাদ্য দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তিশান্তি বিধানের পর আমাকে অন্নভিক্ষা প্রদান কর।

এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে শঙ্করাচার্য্য ক্ষুদ্র আমির অধীন হইয়া নিজ ভরণপোষণের জন্য আত্মোদর পরিপূরণের নিমিত্ত ভিক্ষাপ্রার্থী হন নাই। তাঁহার উদারহৃদয়ে, বিশ্ব জগতের বিশাল ভাব নিয়ত জাগরূক ছিল বলিয়াই তিনি বিশাল ভাবে আমিত্বের ব্যবহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 'আমি'র জন্য তিনি

অন্নকামনা বা ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। কথিত আছে এক সময়ে তিনি জনৈক শিষ্যকে কোন বিষয়ের কর্ত্তা বলিয়া সন্দেহ করাতে শিষ্য দৃঢ়নির্ব্বন্ধতা সহকারে 'আমি' বলিয়া উঠিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য শি[illegible] চৈতন্যভাব প্রণোদিত করিবার জন্যই বলিয়াছিলেন "আমি কে? যদি পার আমি ত্যাগ কর। আর যদি নিতান্তই আমি ত্যাগ করিতে অসমর্থ হও, তবে ক্ষুদ্র আমিত্বকে বৃহদামিত্বে ডুবাইয়া দাও। আমিত্বের সম্প্রসারণে পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারিবে॥" এখন একজন পূর্ণ ভক্তিমান্ ভক্ত-কুল-চূড়ামণির কথা শুনুন। বানর প্রধান হনূমান্—শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নিয়ত ভক্তিমান্ রামমন্ত্রের সাধক, রামপূজার উপাসক ও রামনাম গায়ক। এমন কি ভক্তের সহিত উপাস্যদেবের নিত্য সম্বন্ধ প্রমাণিত করিবার জন্যই তাঁহার অস্থিতে অস্থিতে রামনাম বিদ্যমান। একদা ভক্তাধীন ভগবান্ রামচন্দ্র প্রাণাধিক ভক্তশ্রেষ্ঠ-হনূমানের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া হনূমান্ বলিলেন;—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

অর্থাৎ ভববন্ধ-মোচনকারিণী-মুক্তি আমি চাই না। যে মুক্তিতে 'আপনি' প্রভু—'আমি' দাস এই নিত্য সম্বন্ধবিলোপ হইয়া যায়॥ এই কারণে আমি মুক্তির প্রয়াসী না হইয়া ভক্তির জন্যই লালায়িত। অতএব তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন নিয়ত অচলা থাকে এই আশীর্ব্বাদ কর॥

জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য বা ভক্ত হনূমান্, যাহার মুখেই শুনিতে চান্, সকলেই "আমিত্ব" বজায় রাখিতে প্রয়াসী।

এখন কথা এই 'আমি' লইয়া কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, 'আমি' হইয়া কিরূপে কার্য্য করা কর্ত্তব্য এবং ক্ষুদ্র আমিত্বের সম্প্র-

সারণে নিয়ত নিরত থাকিয়া কি উপায়ে বৃহদামিত্ব লাভ করিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা বিধান করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

সুচতুর স্থপতিগণ প্রকাণ্ড প্রাসাদের গ্রন্থিসংযোজন 'খিলান' করিবার সময়ে অপূর্ব্ব কৌশল সহকারে কাষ্ঠনির্ম্মিত স্তূপের (ফ্রেম) উপর খিলানের আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার পূর্ণতা সাধনে যত্ন করিয়া থাকে। খিলানটী সুগঠিত সুদৃঢ় এবং পরিশুষ্ক হইলে অর্থাৎ ইট চূণ শুরকি সম্পূর্ণরূপে জমাট বাঁধিলে ধীরে ধীরে কাষ্ঠস্তূপটী স্থানান্তর করিয়া দেয়। আমরাও বলি 'আমিত্ব খিলানের উপরকার নির্ম্মাণ-প্রণালী ও ঊর্দ্ধস্থ শোভাসৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য অথবা তাহাকে উপরে উপরে সাজাইবার জন্য যত্নশ্রম করিবার পূর্ব্বে ক্ষুদ্রভাবে 'আমিত্ব' কাষ্ঠস্তূপের উপর খিলান গাঁথিতে আরম্ভ কর। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সহকারে অধ্যবসায় অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে হইতে উচ্চে উঠিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড সংযুক্ত করিয়া চলিয়া যাও। উপলখণ্ড সকল সুস্থাপিত ও সুসজ্জিত হইলে কালক্রমে সুদৃঢ় হইয়া যাইবে। সর্ব্বগ্রাসিনী কামনা তখন আর হৃদয়ের অশান্তি সম্পাদনে সমর্থ হইবে না। আমি বলিয়া তখন আর অভিমান থাকিবে না।

—০ঃঃ০—

রমণী।

রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তার,
পৃথিবীতে হেন শত্রু কেহ নহে কার!
শশাঙ্কের রাহু শত্রু সেত গিলে, ছাড়ে,
আমি করি চির গ্রাস পাইলে তাহারে!
সে যদি সাগর হয়, পৃথিবী প্লাবিয়া,
আমি সে অগস্ত্য মুনি গিলি তারে গিয়া!

কঠিন পাষাণময় সে হ'লে পাহাড়,
আমি হয়ে মহাবজ্র শিরে পড়ি তার!
সে যদি জলদ হয় স্নিগ্ধ সুশীতল,
আমি হই বুকে তার অশনি অনল!
সে যদি পৃথিবী হয় লোক রক্ষা হেতু,
আমি তার মহারিষ্টি হই ধূমকেতু!

যদি কেহ দিয়ে থাকে চির অশ্রু জল,
সে আমার মহাশত্রু রমণী কেবল!
যদি কেহ দিয়ে থাকে চির হাহাকার,
সে কেবল মহাশত্রু রমণী আমার!
যদি কেহ ক'রে থাকে মম সর্ব্বনাশ,
সে আমার মহাশত্রু রমণী নির্য্যাস!
মুহূর্ত্ত তাহার কথা ভুলিতে না পারি,
সে আমার মহাশত্রু আমি শত্রু তারি!

পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি, তীক্ষ্ণ তরবার,
অমৃত মরণে করে যাতনা উদ্ধার!
নারী করে গুপ্ত হত্যা আঁখির আঘাতে,
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দেয় তাতে!
জীবনের দিন, দণ্ড, পল, অনুপল,
মরণ! মরণ! মম মরণ কেবল!
মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি,
রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তারি!

শ্রীগোরিন্দচন্দ্র দাস।

—:(*):—

রাজমালা ও ত্রিপুররাজবংশ।

—:(*):—

আমরা শাস্ত্রে "পুরাণ" ও "ইতিহাস", ভিন্নার্থবাচী এই দুইটী পৃথক্ পদার্থেরই সমুল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু কার্য্যতঃ পুরাণপ্লাবিত ভারতে একখানিও প্রকৃত ইতিহাস ছিল না আছে, এরূপ প্রতীতি হয় না। সত্য বটে সভ্যতা বিধ্বংসী আততায়ি-গণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও বর্ব্বরতায় অনন্তরত্নপ্রসূ ভারতের বহু অমূল্য গ্রন্থরত্ন ভস্মীভূত ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে. কিন্তু তাহাতে অন্যান্য নানা শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের সমূলে বিধ্বংস না ঘটিয়া একমাত্র ইতিহাসজাতীয় সমুদায় গ্রন্থেরই বিনিপাত সাধন হইল, অতীত বিষয়ের সাক্ষ্যদানার্থ উহার একখানিও রহিল না. ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। ফলতঃ ইতিহাস পদবাচ্য স্বতন্ত্র কোন পদার্থ, ভারতে ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাণ ও ইতিহাস, একটী বিষয় বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণই আমাদিগের দেশে ইতিহাসের অভাব পূরণ করিত, ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে। আমাদিগের অধ্যাত্মতত্ত্ব-পিপাসু ন্যস্তশস্ত্র মহাভাগ পিতৃপুরুষগণ, অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। বহির্জ্জগৎ ও ঐহিকের কথা, পাপকর সমর-প্রসঙ্গ, ও জল-বুদ্বুদ-প্রতিম মানবের জীবনচরিত, তাঁহাদিগের যেন আলোচ্য বিষয়ই ছিল না। তাঁহারা পাশ্চাত্য প্রণালীতে ইতিহাস রচনা করিতেও অভ্যস্ত ছিলেন না। ইতিহাস, ভবিষ্যবংশ্যগণের অশেষ উপকারে আসিতে পারে, একথা তাঁহাদিগের মনেও আসিত না। তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা অন্তর্জ্জগৎ ও ধর্ম্মজগৎ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে গ্রন্থে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ের উপদেশ এবং পূর্ব্ববৃত্ত কথা বিবৃত থাকে, তাহারই নাম ইতিহাস *।

* ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং উপদেশ সমন্বিতং। পূর্ব্ববৃত্ত কথা যুক্ত মিতিহাসং প্রবক্ষতে॥
শ্রীধর ধৃত স্মৃতি বচনং।

কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস এহেন লক্ষণাক্রান্ত নহে। যাহা ইতিহ বা পূর্ব্ববৃত্তের 'আস' অর্থাৎ অধিষ্ঠান ভূমি, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস বটে†। ভারতীয়গণ, এরূপ একখানী ইতিহাসও লিখিয়া যান নাই। রাজ-তরঙ্গিণী একখানী ভারতীয় ইতিহাস বটে, কিন্তু উহা কোন ঋষিপ্রণীত প্রাচীন গ্রন্থ নহে। একালের কহ্লণ পণ্ডিত, বিজাতীয় রীতির অনুসরণ করিয়া উহার প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে নূতন পুরাতন উভয় রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। "ইতিহাস সমুচ্চয়" নামে একখানী প্রাচীন গ্রন্থ আছে, কিন্তু উহাও মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ বিশেষ। আমাদিগের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও রামায়ণ মহাভারত ঐতিহাসিক তত্ত্বগর্ভ হইলেও ইতিহাস পদবাচ্য নহে। শাস্ত্রসমূহে বিমিশ্র স্বর্ণের ন্যায় ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহ ও অতিবাদ ও কল্পনা বিজড়িত হইয়া আছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ঐতিহাসিক জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবার নহে। এবং তাদৃশ ক্ষীণপ্রভ জ্যোতিরিঙ্গণও মনের অন্ধকার ঘুচাইতে পারে না। প্রকৃত ইতিহাস ও জীবনচরিত বিদ্যমান থাকিলে আজি আমরা ভারতের পুরাতত্ত্ব বিষয়ে এতদূর অনভিজ্ঞ ও অন্ধ থাকিতাম না। রাম-রাবণ; কুরু-পাণ্ডব; আকাশকুসুম, এবং একপিতৃক বিশ্বসাধ্যাদি দেবতারা ও আমরা পৃথক্ জীব ও উপাস্য উপাসক ভাবাপন্ন একথা শুনিয়াও মর্ম্মাহত হইতাম না। আমাদিগের ইতিহাস না থাকাতেই আজি আমরা বিদেশীয়দিগের দ্বারা নিগার বলিয়া নিগৃহীত হইতেছি, এবং প্রকৃত জীবনচরিত না থাকাতে বর্ব্বরীয়ান্ কালিদাসাদিকে অপোগণ্ড শিশুতে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছি!!

ইতিহাসের মরুভূমি এহেন ভারতে যদি কোন ভারতসন্তান, প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তবে তিনি সর্ব্বথাই সর্ব্বসাধারণের

† পারম্পর্য্যোপদেশে স্যাৎ ঐতিহ্য মিতিহাব্যয়ঃ। ইত্যমরঃ।
ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তং ইতিচ ঔপরকোলঃ।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, সপর্য্যা ও শুভাশীর্ব্বাদের একমাত্র ভাজন। তাই আমরা প্রত্নতত্ত্ব বিনোদী মাননীয় ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রতি এত অনুরক্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা ৺ রজনী কান্ত গুপ্তের প্রতি এত স্নিগ্ধকটাক্ষবর্ষী। সাহিত্য, গণিত, খগোল, ভূগোল কিছুই ইতিহাসের ন্যায় জ্ঞানপ্রণয়ী নহে। প্রকৃত ইতিহাস; অনন্তর বংশ্যগণের মনে, অতীতের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে অশেষ জ্ঞানের অধিকারী করিয়া তুলে। তাই আমরা শ্রদ্ধেয় বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের "রাজমালা" নামক ত্রিপুরা-পুরাবৃত্ত পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম মুরশিদাবাদ-কাহিনী, নন্দকুমার, সিরাজউদ্দৌলা ও এই রাজমালা প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থসমূহ প্রচারিত হইলে শনৈঃ শনৈঃ আমাদিগের পূর্ব্ব কলঙ্কের অপনয়ন হইবে, পথ প্রশস্ত হইয়া আসিবে। কিন্তু কৈলাসবাবু আমাদিগকে সহজে সে সুখসম্ভোগ করিতে দিলেন না। আমরা এখন হরিষে বিষাদে ম্রিয়মাণ।

কেন? সিংহ মহাশয় তদীয় পূর্ব্ব প্রকাশিত ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ও বর্ত্তমান রাজমালায়, ভারতবিশ্রুত ত্রিপুরেশগণকে যখন যযাতি-তনয় দ্রুহ্যুর অনন্তরবংশ্যবলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন আমরা কি প্রকারে তাঁহার এই অনৃত কাহিনীর সমর্থন করিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারি? সিংহ মহাশয় উক্ত উভয় গ্রন্থেই বিবৃত করিয়াছেন, যে মহারাজ দ্রুহ্যু পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন এবং ত্রিপুরেশগণ, তাঁহারই সন্তানসন্ততি এবং তজ্জন্য তিনি উঁহাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া একটী বংশতালিকাও প্রদান করিয়াছেন*। এবং বৈদিকযুগের প্রাচীনতম দ্রুহ্যু

* চন্দ্র বংশাবতংস মহারাজ যযাতি তদীয় পুত্র যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু এবং অনুকে একে একে বর্জ্জন করিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুকে সাম্রাজ্যাসন প্রদান করেন। মহাবল দ্রুহ্যু পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্বীয় পরিবার এবং অনুচরবর্গের সহিত হস্তিনানগর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করেন। পরিশেষে

কি প্রকারে পূর্ব্ববঙ্গের সুদূর প্রান্তরে আসিয়া সাম্রাজ্য সংস্থাপন ও বংশ বিস্তার করিলেন, তিনি ইহা ভাবিয়াও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ের দৃঢ়তর ধারণা এই যে যযাতির পুত্র বৈদিক দ্রুহ্যু কখনই পূর্ব্ববঙ্গের অপবিত্র ধূলিরাশি পাদসংস্পৃষ্টও করেন নাই, এবং বর্ত্তমান ত্রিপুরেশগণও তাঁহার সহিত কোন প্রকারে কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহেন। মহামান্য ত্রিপুরেশগণ, কিরাতকুল প্রসূত ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় বটেন, এবং কিরাত বংশও ভারতে বহুমান গরীয়ান্ ছিলেন তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উঁহারা যে যযাতিপুত্র দ্রুহ্যুর কোন প্রকারে শোণিতসংস্রবী, ইহা আমরা মনেও স্থান দিতে পারি না। ত্রিপুর রাজগণ যে কিরাতকুলপ্রসূত, তাহা তাঁহাদিগের নামাবলীই সুসূচিত করিয়া থাকে †।

শ্রদ্ধেয় কৈলাসবাবু তদীয় গ্রন্থ প্রণয়নে, ত্রিপুররাজপারিষদ ব্রাহ্মণতনয় স্বর্গত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বরের সংস্কৃত ও প্রাকৃত (বাঙ্গালা) রাজমালার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। ঐ দুই গ্রন্থে—ত্রিপুর-রাজগণ দ্রুহ্যু সন্তান বলিয়া বিশেষিত ‡।

কিন্তু উহা নিতান্তই ভিত্তিহীন ও স্বকপোল পরিকল্পিত অনৃত

বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া কিরাতরাজ্যে উপনীত হইলেন। এবং কতিপয় প্রধান কিরাত ভূপতিকে পরাজয় করিয়া কোপল (ব্রহ্মপুত্র) নদতীরে ত্রিবেগনাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করতঃ তথায় একটী অপূর্ব্ব রাজধানী সংস্থাপন করেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুহ্যু স্বীয় অধিকৃত রাজ্যে দীর্ঘকাল একাধিপত্য বিস্তার করিয়া অবশেষে একমাত্র পুত্র ত্রিপুরকে বর্ত্তমান রাখিয়া আপনি বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করেন। ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ১। ২ পৃষ্ঠা এবং নুতন রাজমালা ২য় ভাগ ২য় অধ্যায়ের ১৪।১৫শ পৃষ্ঠা দেখ।

† নৌয়ুংরায়, তরজুরায়, মুচুংফা, সাইচুংফা, হাতুংফনাই ইত্যাদি রাজমালা ১ম ভাগ—৪অ—৫৭। ৫৮ পৃঃ দেখ।

‡ দ্রুহ্যু রাজসুতোজাত ত্রিপুরাখ্যো মহাবলঃ। সংস্কৃত রাজমালা। রাজমালা ২য় ভাগ ২য় অঃ ১৫পৃষ্ঠা। ১৩২৯ শকাব্দে (১৮০৭ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস "রাজমালা" পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর দ্বারা রচিত হইয়াছিল। সেই রাজমালা অধুনা দুষ্প্রাপ্য। মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসনকালে রাজমালা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইহাই অধুনা প্রাচীন রাজমালা বলিয়া আখ্যাত। এই প্রাচীন রাজমালা হইতে এস্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

বিবৃতি। পরাধীন বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর দেখিলেন—তাঁহাদিগের পিতৃপিতামহগণ যখন উদরান্নের জন্য বিতস্তিপ্রমাণ ভূমিখণ্ড ভোগী সামান্য রাজাকেও সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া সনন্দ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারাই বা কেন তাঁহাদিগের অন্নবস্ত্র-দাতা ত্রিপুররাজবংশের গৌরববর্দ্ধনে পশ্চাৎপদ হইবেন? ত্রিপুরার মতন নিভৃত স্থানে যখন সেই অতি প্রাচীন কালে পুরাণজ্ঞ চক্ষুষ্মান্ লোকদিগের বেশী সমাগম হইত, এরূপ প্রতীতি হয় না। অথবা হয়ত সুচতুর বাণেশ্বর, শুক্রেশ্বর তাঁহাদিগের রাজমালা গ্রন্থ কোন প্রজ্ঞাচক্ষু

শ্রীধর্ম্ম মাণিক্যদেব ত্রৈপুর সন্ততি। রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথী॥
পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব্ব রাজকথা। ততঃপর নৃপচর্য্য না হইছে গাথা॥
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি। পয়ারে লিখায় তুমি রাজমালা পুথী॥
শুনশুন বলি বল চতুর নারায়ণ। রাজবংশের কথা কিছু কহত অখন॥
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান। ভেদ, দণ্ড, সাম, দান নীতিতে প্রধান॥
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণকুমার। বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি। সেই মত দ্বিজগণ হয় মহামানী।
দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চন্তাই প্রধান। পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান॥
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন। নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ॥
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি। বংশকথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ প্রতি॥
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর। চন্তাই সহিত করি দিলেন উত্তর॥
নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিনজন। রাজাতে কহিল তিনে বংশের কথন॥
রাজমালিকা আর যোগিনী মালিকা। বারুণ্যকা নির্ণয় আর লক্ষ্মণ মালিকা॥
হরগৌরী সম্বাদ আছিল ভস্মাচলে। নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতূহলে॥
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয়। রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয়।
শুন শুন মহাশয় হইয়া সাবধান। তোমার বংশের কথা করিছি বাখান॥

ইতি দ্রুহ্যুখণ্ড, প্রথম অধ্যায়—রাজমালা ১ম ভাগ—৪৯—৫৪পৃষ্ঠা॥

চন্দ্রবংশে মহারাজ যযাতি নৃপতি। নিজবাহুবলে শাসে সপ্তদ্বীপ ক্ষিতি॥
তান পঞ্চপুত্র হৈল যেন কল্পতরু। যদু, তুর্ব্বসু আর দ্রুহ্যু, অনু, পুরু॥
শুক্র কন্যা দেবযানীর দুই হইল পুত। রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার হৈল তিন সুত।
বৃষপর্ব্বায় কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাতনয়। দ্রুহ্যু নামে রাজা হৈল ইন্দ্রের আলয়॥

প্রাচীন রাজমালা—২য় অঃ। নূতন রাজমালা—১ম ভাগ ৪অঃ—৩১। ৩২পৃষ্ঠা।

পণ্ডিতের নয়নগোচর করিতেও দেন নাই, কাজেই সরলহৃদয় রাজগণ, উহাই প্রকৃত ভাবিয়া তৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া আসিতেছেন।

কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৈলাসবাবু কি প্রকারে এই অনৃতের ভরা কান্ধে লইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, কি প্রকারেই বা তিনি এই ষোল আনা অনৃতের সমর্থন করিলেন, আমরা ইহাই ভাবিয়া মহা-ব্যাকুল!! অশেষ-শাস্ত্রপারদৃশ্বা পণ্ডিতদিগের কথা ত অতি দূরে, বিদ্যালয়ের সামান্য বালকও আজি যযাতির তত্ত্ব, তুর্ব্বশু ও দ্রুহ্যু প্রভৃতির আমূল বৃত্তান্ত সম্যক্ পরিজ্ঞাত, আর কৈলাসবাবুর মতন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি, যযাতি দ্রুহ্যুর কিছুই অবগত নন্? প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াও তিনি পুরাণতন্ত্রের কোন ধারই ধারেন নাই, স্বদেশদ্রোহী ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্য মহাশয়ের ন্যায় তিনিও সংস্কৃতভাষাকে আবর্জ্জনারাশিপূর্ণ জ্ঞানে দূরে পরিহার করিয়া অস্পৃশ্য পুরাণের একটী পাতাও আজি পর্য্যন্ত উল্টাইয়া দেখেন নাই—ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়!!"

দ্রুহ্যু ও যযাতির কথা বেদে আছে, পুরাণেও আছে? হরি-বংশে আছে, আবার রামায়ণ মহাভারতেও আছে? হিন্দুনামের অভিমানী কোন ব্যক্তি ইহা জানেন না, ইহা আমরা স্বপ্নেও মনে করি না। তবে সেই দিগন্ত বিশ্রুত সর্ব্বজন বিদিত যযাতি দ্রুহ্যুর কথা লিখিতে যাইয়া কেন সিংহ মহাশয় একবার শাস্ত্রের নিকট মস্তক অবনত করিলেন না? যোদ্ধা ঢালতরাল না লইয়া পেলারাম সর্দার সাজে না। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াই রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। কেহই উপাদান ও উপকরণ না লইয়া কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় না, আর বিচক্ষণ সিংহ মহাশয় মালমসলা না লইয়াই ইতিহাস প্রণয়নে প্রয়াসী হইলেন, ইহা অপেক্ষা অদূরদর্শিতা ও অসমীক্ষ্যকারিতা আর কি হইতে পারে? বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বরের ন্যায় তিনিও কি আজি জীবিকার জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে বদ্ধ পরিকর? লোকে কি ইহাই মনে করিতে পারে না যে পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিলে ত্রিপুর রাজগণের

চন্দ্রবংশীভবনের ব্যাঘাত ঘটিবে, এই জন্যই সিংহ মহাশয় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

নিস্তব্ধ সিংহ মহাশয় দ্রুহ্যুর পূর্ব্বদিকে আগমন এরূপভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যে কাহার সাধ্য উহা অনৃত ও সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত বলিয়া ধারণা করে? তিনি যেন কোন মূলের অনুবাদ করিয়া যাইতেছেন, অথবা দৈববলে বলীয়ান্ ও প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই নির্ভয়চিত্তে অকুতোভয়ে কোন সত্যেরই অবতারণা করিতেছেন!!! ধন্য তাঁহার উলঙ্গ সাহস, ধন্য তাঁহার জীবন্ত স্বৈরাচার!! অথবা যিনি আজি পর্য্যন্ত যযাতি দ্রুহ্যুর কাহিনীও অবগত নহেন, শাস্ত্রগ্রন্থগুলি হইতেও সুদূর-সঞ্চারী, তাদৃশ ব্যক্তি কেন এ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিলেন?

যযাতির অন্যতর সন্তান দ্রুহ্যু ও অনু, ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে যাইয়া রাজ্যসংস্থাপন করেন। অনুর সন্তানেরা সমগ্র পঞ্চনদে বিরাজিত ছিলেন। তদীয় সন্তানগণ সম্ভবতঃ সগরনিপীড়নে ম্লেচ্ছ-জাতিতে পরিণত হয়েন। মহারাজ দ্রুহ্যু যে দেশে যাইয়া বসবাস করিয়াছিলেন, উহা এইক্ষণে কান্দাহার নামের বিষয়ীভূত †। এবং মহারাজ দ্রুহ্যুর সন্তানেরা ত্রৈপুর নহেন কিন্তু ভোজবংশ্য বলিয়া বিশ্রুত ‡।

† বাভজৎ পঞ্চধা রাজন্ পুত্রাণাং নাহুষ স্তদা। দিশি দক্ষিণ পূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং স্বতিমান্ নৃপঃ॥ ১৭
প্রতীচ্যা মুত্তর স্যাঞ্চ দ্রুহ্যুং চানুঞ্চ নাহুষঃ। দিশি পূর্ব্বোত্তর স্যাং বৈ যদুং জ্যেষ্ঠং ন্যযোজয়ৎ॥ ১৮
মধ্যে পুরু ঞ্চ রাজানং অভ্যষিঞ্চত নাহুষঃ। তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা॥ ১৯
যথা প্রদেশ মদ্যাপি ধর্ম্মেণ প্রতি পাল্যতে। ২০—৩০অ—হরিবংশ।
দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো রাজন্ বভ্রুঃ সেতুশ্চ পার্থিব। অঙ্গার সেতু স্তৎ পুত্রো মরুতাং পতি রুচ্যতে॥ ১২৪
যৌবনাশ্বেন সমরে কৃচ্ছ্রেন নিহতো বলী। যুদ্ধং সুমহদাসীত্তু ক্ষাসান্ পরি চতুর্দ্দশ॥ ১২৫
অঙ্গারস্য তু দায়াদো গান্ধারো নাম ভারত। খ্যায়তে তস্য নাম্না বৈ গান্ধার বিষয়ো মহান্॥ ১২৬-৩২অ
হরিবংশ।

‡ যদোস্তু যাদবা জাতা স্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ সুতাঃ। দ্রুহ্যোঃ সুতাস্তু বৈ ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ॥ ৩৪
৮৫অ—আদিপর্ব্ব
যদোস্তু যাদবা জাতা স্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ সুতাঃ। দ্রুহ্যস্য তু সুতা ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ॥ ৩০
৩৪অ—মৎস্য।

দ্রুহ্যুর পুত্র সেতু ও বভ্রু। বভ্রুর পুত্র রিপু, রিপু, যৌবনাশ্বের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন। সেতুর পুত্র অরুদ্ধ বা অঙ্গার, অরুদ্ধের পুত্র গন্ধার, তাঁহারই নামানুসারে তদীয় পৈতৃক রাজ্য সুমহান্ গান্ধার রাজ্য বলিয়া সমাখ্যাত। দুর্য্যোধন মাতা মহাদেবী গান্ধারী, গান্ধাররাজ সুবল গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

এখন পাঠক ধীরমনে স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখুন; আমাদিগের সিংহ মহাশয় ত্রিপুর বংশ সঙ্কলন বিষয়ে যে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বরের পদবীর অনুসরণ করিয়াছেন উহা সমীচীন হইয়াছে, না তিনি যে ইতিহাস লিখিতে যাইয়া পুরাণাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ না করিয়াই স্বখাত কল্পনা সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, ইহাই সঙ্গত হইয়াছে?

সম্প্রদান।

—:০:—

৪

নায়েব হরনাথ রায় একাকী বৈঠক খানায় বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, পঞ্চানন ঠাকুর ধীরে ধীরে যাইয়া বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নায়েব মহাশয় পুরোহিত ঠাকুরকে অভিবাদন করিতে করিতে বলিলেন আজ দিন কয়েক হলো ওরা সব কর্ণপুর গিয়েছে। পরশ্ব ফিরিবার কথাছিল কিন্তু আজ এপর্য্যন্তও কোন সংবাদ নেই, কি করব ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছিনা। পঞ্চানন ঠাকুর গম্ভীর ভাবে বলিলেন চিন্তা কর্‌বেন না, ধর্ম্মাশ্রিত রায় বংশের কখনও অকল্যাণ হবেনা, তাঁরা সত্বরেই নির্ব্বিবাদে বাড়ী ফির্‌বেন।

যখন যজমান পুরোহিত এইরূপ বাক্যালাপে নিবিষ্ট ছিলেন তখন রামধন কৈবর্ত্ত মাথা হইতে ধপ্ করিয়া একটা মোট ফেলাইয়া

আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। নায়েব মহাশয় ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে রামধন ওরা সব এসেছে?"

"আজ্ঞে হাঁ সকলি এসেছেন কিন্তু মা ঠাকুরাণী বলে দিয়েছেন আপনি একবার ঘাটে না গেলে তাঁরা উঠ্‌তে পার্‌বেন না"।

"তারা সব ভাল ত।"

"আজ্ঞে, সকলি ভাল।"

"তবে আবার যাবার প্রয়োজন কি?"

"তা ত বল্‌তে পারিনা।"

নায়েব মহাশয় পুরোহিত ঠাকুরকে অগ্রগামী করিয়া তাড়াতাড়ি ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হয়েছে কি"? গিন্নী খানিক নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে"।

"কি সর্ব্বনাশ হলো?"

"আমাদের জাত গিয়েছে।"

নায়েব মহাশয় চক্ষু দুইটা কপালে তুলিয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন "কি করে কি হলো সব খুলে বলে ফেল না।"

"হবে আর কি, আমরা সেদিন নদীর ধারে খাওয়া দাওয়া করছিলেম্ এমন সময় একটী বৃদ্ধার সঙ্গে একটী ফুট ফুটে মেয়ে এসে সেখানে উপস্থিত হলো। আমি দু চার কথায় তাকে কায়েতের মেয়ে ভেবে পরদার ভিতরে ডেকে এনে বস্‌তে দিলেম। তারপর একটী ভদ্রলোক এসে বল্‌লেন, তোমাদের জাত গিয়েছে, এ মেয়েটী আমার, আমি খিষ্টান্। আমি ত শুনেই অবাক্। মাথায় হাতদিয়ে কাঁদ্‌তে লাগলাম, তারপর কথাটা কর্ণান্তর হওয়ার ভয়ে, কোন বিশেষ বাসনা পূরণের ভরসা দিয়ে মেয়েশুদ্ধ ভদ্রলোকটীকে নিয়ে এসেছি।"

"এতে আর ভাবনা কি, কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিলেই হবে এখন। তারা সব কোথায় ?"

গিন্নী অদূরবর্ত্তী একখানা নৌকা দেখাইয়া বলিলেন ওঁরা ঐ নৌকায় আছেন। অনেক বলে দেখেছি ওঁরা কিছু নিতে চান না বরং দিতে এসেছেন, ভদ্রলোকটীর মেয়ে ভিন্ন সংসারে কেউ নেই; অবস্থাও ভাল, বংশও ভাল, তবে এক নীলকুঠীর সাহেবের ফাঁদে পড়ে তাঁকে খিষ্টান হতে হয়েছে. এখন তাঁর ইচ্ছা একটী হিন্দুর ছেলের হাতে মেয়েটীকে সঁপে দিয়ে যা আছে সমস্ত জামাতাকে লেখা পড়া করে দিয়ে নিজে প্রায়শ্চিত্ত করে কাশীবাসী হবেন। বিনয়ের জন্য আমরা মেয়েটীকে গ্রহণ করব এরূপ প্রতিশ্রুত হয়েই তাঁকে নিয়ে এসেছি। এখন যা ভাল বুঝ, কর।

"দুর্গা বল. আমাদ্বারা কখনও তা হবে না। কি বল পঞ্চানন খুড়ো ?" পঞ্চানন ঠাকুর নৌকার বহির্দ্দেশে বসিয়া সমস্তই শুনিতে ছিলেন, নায়েব মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "তাও কি কখন হয় ?" গিন্নী বলিলেন "সব দিক দেখে শুনে যা হয় কর, একঘরে হয়ে থাকতে হবে, লোকে দেখলে টিট্‌কারী দেবে, রায়বংশের উঁচু মাথা নীচু হবে আর আমিও কিন্তু মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তোমাদের অকল্যাণ কর্ত্তে পারব না।"

গিন্নী একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "এমন সুযোগ কে পরিত্যাগ করে? সুন্দরী বৌ ঘরে আস্‌বে, প্রচুরলাভ হবে, গুরু পুরোহিতেরও যে বরাদ্দমত না হবে এমন নয়, সমাজেও অপদস্থ হবার আশঙ্কা থাকবে না ছেলেরও এতে অমত নাই।"

এবার পঞ্চানন ঠাকুরের কর্ত্তব্যের লাগামটা উল্টাদিকে টান পড়িল, একটু অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—"কর্ত্রী ঠাকুরাণী যা বল্লেন তা নিতান্ত মন্দ নয়।"

নায়েব মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে

বলিলেন "ঠাকুর শেষ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে ত ?"

টিকিটা ঘন ঘন মর্দ্দন করিতে করিতে পঞ্চানন ঠাকুর বলিলেন "তা আর পার্‌ব না, তবে আর আমরা ব্রাহ্মণ কেন ?"

রায় মহাশয় গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেনা পাওনাটা পরিষ্কার হবে কখন।"

"কেন সম্প্রদানান্তে, তার জন্য ভাবনা নাই। আর সম্প্রদানইবা কি ? একটা মঙ্গলঘট সম্মুখে রাখিয়া পুরোহিত ঠাকুর দুটা মন্ত্র উচ্চারণ করে দুজনাকে হাতে হাতে বেঙ্কে দিলেই হয়ে যাবে। আমার বিবেচনায় গোল না করে গোধূলি লগ্নে এই নদীতীরে বসিয়াই সম্প্রদানের কার্য্যটা হয়ে যাক্, লোক জানা জানিতে প্রয়োজন নাই। বাড়ী যেয়ে বল্লেই হবে যে বিয়ে হয়ে গেছে, পাড়া প্রতিবেশীকে এক বেলা খাইতে দিলেই আর কোন গোল থাক্‌বে না।"

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর গিন্নীর পরামর্শানুসারেই কার্য্য করা স্থিরীকৃত হইল। তখন প্রতীচ্যাকাশে স্তরে স্তরে সজ্জিত মেঘমালার উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া জলেস্থলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

(৫)

গৃহিণীর উৎসাহ ও উদ্যোগে অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত হইল। রামধন কৈবর্ত্ত একটা গোপনীয় স্থানে গাছের ডাল পালা দিয়া বেশ একটা বিবাহ-মণ্ডপ তৈয়ার করিয়া দিল। কন্যাকর্ত্তা ধীরে ধীরে সে মণ্ডপতলে যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বরও মাতৃদেবীর কি একটা গোপনীয় উপদেশ শিরে বহনপূর্ব্বক বস্ত্রাবৃত মুখে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। ভবিষ্যৎ নিষ্পত্তির চিহ্ন স্বরূপ পাত্রীপক্ষ হইতে একখানা রিকাবীতে কয়েক খান মোহর সাজাইয়া দেওয়া হইল। উপরে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্র এবং নিম্নে একটা মাটীর প্রদীপ বিবাহ সভার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতে লাগিল। দর্শক,—উপরে নক্ষত্রমালা সমন্বিত সুনীল

গগন, স্থলে হরনাথ রায় ও রামধন কৈবর্ত্ত, জলে নায়েব গৃহিণী ও তাঁহার ষোড়শী রসিকা পরিচারিকা যমুনা।

যমুনা, বাদ্যযন্ত্রের অভাব অনুভব করিয়া কলাপাতে একটা ভেঁপু তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিল। পঞ্চানন ঠাকুর বরের হস্তে হস্তকুশ প্রদানের অনুজ্ঞা করিবা মাত্র যমুনার ভেঁপুটা একবার বাজিয়া উঠিল, কিন্তু গৃহিণীর তাড়নায় যমুনার বুকের স্ফূর্ত্তিটুকু বুকেই মিশিয়া গেল।

সম্প্রদান হইতে চলিল। নায়েব মহাশয় স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় ম্রিয়মাণ রহিয়াছেন, এমন সময় নদী-তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া কে একজন নায়েব মহাশয়ের পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বাবা অরবিন্দ, সময় যে উত্তীর্ণ হলো, সম্প্রদানের বিলম্ব কি?" নায়েব মহাশয় চমকিত ভাবে পশ্চাতে ফিড়িয়া দেখিলেন—সেই অপমানিত লাঞ্ছিত বৈরাহিক গঙ্গাধর ঘোষ, অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্র করে বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রু অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, নয়নদ্বয় ভয়ানক জ্বালা বিশিষ্ট, সমগ্র মুখ মণ্ডল প্রতিজ্ঞারক্ষা জনিত কি একটা বিকৃত প্রফুল্লতায় সমুদ্ভাসিত। দেখিতে দেখিতে নায়েব হরনাথ রায় রামধন কৈবর্ত্তের কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী।

—:০:—

বেদ।

—০—

বেদশব্দ মাত্র উচ্চারিত হইলে ভারতবাসী, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নরনারীগণের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবলহরী উত্থিত হইয়া থাকে। অনন্ত জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার, অখিলধর্ম্মের মূলাধার বেদই আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী

ব্যক্তিগণের হৃদয়ের বস্তু ও প্রাণাধিক প্রিয়তম পদার্থ। বেদের মূল তত্ত্ব সকল বিবিধভাবে বিবিধ ছন্দোবন্ধে দেবভাষায় নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই পরমশোভায় বিভূষিত, ফল-পুষ্প-শাখা-পল্লব পরিশোভিত অপরূপ বেদ কল্পপাদপের নিকট যিনি যে উদ্দেশে যে ভাবে গমন করিয়া যে ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তিনি নিজ শক্তি-সাধ্যানুসারে সেইরূপ ফল সঙ্কলন ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বেদ শব্দ রসনায় উচ্চারিত হইলে, অথবা কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, কিম্বা মানসক্ষেত্রে স্মরণপথে আবির্ভূত হইলে কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতি, অচিন্তনীয় শান্তির সহিত অভাবনীয় ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা ভাবুকের লেখনীও বর্ণন করিতে অক্ষম। এই প্রীতি শান্তি ভীতি পরিব্যাপ্ত মহান্ বিশাল জ্ঞান রত্নাকরই বেদপদবাচ্য। এই রত্নাকরে কত জ্ঞানরত্ন কতস্থানে নিবিড় সলিলরাশির মধ্যে কি অবস্থায় নিহিত রহিয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সুনীল গভীর সিন্ধুর সুন্দর শোভা সন্দর্শন করিয়া এবং তাহাতে বহুমূল্য রত্ন সুলভ জানিয়া অনেকে তাহার সমীপে সমাগত হয়েন, কিন্তু হয় ত দুর্ভাগ্যদোষে কেবল জল পান করিয়াই তৃপ্তভাবে বিরত হইতে বাধ্য হয়েন, কারণ এ জল লবণাক্ত নহে, এ অমৃতময়ী ক্ষীরধারা। কেহ কেহ সাহসপূর্ব্বক জলমধ্যেও অবতরণ করেন, কিন্তু ভীষণ জলজন্তুগণের উপদ্রবে ও উৎপাতে তাহারা বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোনরূপে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। কেহ কেহ দূর হইতে অতুল অসীম জলরাশির প্রচণ্ড কোলাহল, ভয়ঙ্কর কল্লোল শব্দ শুনিয়াই নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। রত্নাকরের গভীর গর্ভস্থিত রত্নরাজী লাভ করা বড়ই সৌভাগ্য ও সুকৃতির বিষয়। কিন্তু পুণ্যশীল সাধু-চরিত্র, মহানুভব, শ্রদ্ধালুহৃদয়বান্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে কে সেই অতুল রত্ন লাভের অধিকারী হইবে?

বেদ আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবৃন্দের সর্ব্ববিধ জ্ঞানধর্ম্মের মূলাধার।

ইহা হইতেই ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যধর্ম্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মই উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া স্বীয় স্বীয় শরীরের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। চিন্তাশীল, সহৃদয়, বিচক্ষণ সুদূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই অপক্ষপাতে স্থিরভাবে ধীরচিত্তে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের মতামত সমালোচন করিলে এই তত্ত্ব তাঁহাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে। আমরা বেদকে কল্পবৃক্ষ বলিয়াই নির্দ্দেশ করি, অথবা রত্নাকর নামেই অভিহিত করি, ইহার অন্তঃস্থিত তত্ত্ব সকল অনুভব করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। যেমন প্রণবই সকল শব্দের সমষ্টি ভাব। তেমনই বেদ সকল শাস্ত্রের বীজস্বরূপ। প্রণব হইতে কিরূপে শব্দ সকল বিনিঃসৃত হইয়াছে ও হইতেছে এবং ঐ সকল শব্দ কিরূপে ওঙ্কারে পরিগত ও বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে হইলে শব্দ সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতির তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই এবিষয় অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হইবে। ক্ষুদ্র বটের বীজ হইতে কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা, পত্র পল্লব, ফুল ফল পরিশোভিত বিশাল বটবৃক্ষ সঞ্জাত হইয়া থাকে, একথা সর্ব্বজন বিদিত নিত্য পরিচিত ও নিশ্চিত সত্য। কিন্তু যদি কেহ একটী ক্ষুদ্র বটবীজ নিজ করতলে সংস্থাপন করিয়া সম্মুখস্থিত বৃহৎ বট বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি করে, তবে কি বীজ ও বৃক্ষ দুইটী পদার্থ একই বস্তু বলিয়া সহজে তাহার বোধগম্য ও অনুমিত হইতে পারে? কিন্তু উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণই জানেন কেমন করিয়া জলবায়ু উত্তাপ মৃত্তিকা সাহায্যে ও প্রকৃতির অতুলনীয় আনুকূল্যে ক্ষুদ্রবীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পরিশেষে মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া থাকে। একটী কঠিন শাখা একটী সবুজ পাতা বা একটী লোহিত ফল হাতে করিয়া তাহার সত্ত্বা বীজ মধ্যে দেখিতে হইলে অন্তর্দর্শীর দিব্য দৃষ্টি আবশ্যক। বীজের পরমাণুতে পরমাণুতে যে সকল পদার্থ যে শক্তির সহিত সং-

রক্ষিত হইয়া আছে, বাহ্যদর্শকের ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তৎসমুদয় কখনই প্রত্যক্ষীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল কারণে সুধীর চিন্তাশীল ব্যক্তি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করেন—সমগ্র বেদ কি বস্তু? তাহা হইতে শাস্ত্র সকল কিরূপে সমুপৎন্ন হইল এবং তাহা কে সহজে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে?

মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদবৃক্ষ হইতে আরণ্যক উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি কত শাখা, কত পল্লব, কত কিশলয়, কত কুসুম, কত ফল বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ও ইয়ত্তা নাই। কোন্ ধৈর্য্যশীল, অধ্যবসায়সম্পন্ন অক্ষুণ্ণপরিশ্রমী ব্যক্তি তাহার সমালোচনা করিতে পারেন? তারপর আবার ভ্রমপ্রমাদের আলোচনা ও দোষ গুণের কথা। সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া বহু লোকের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া এবং বহু কারিগরের যত্নশ্রম ও নির্ম্মাণ নৈপুণ্যে যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত হইল, তাহার অংশমাত্র অর্থাৎ একখানি ইষ্টক বা একখানি প্রস্তর দেখিয়া তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম না হইলেও কখনই সুধীর বিচক্ষণ ব্যক্তির কার্য্য বলিয়া পরিগণনীয় নহে। তুমি বলিবে যতটুকু দেখিলাম, যত টুকু জানিতে পারিলাম তাহাই যথেষ্ট। অবশ্য ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষীণশক্তি মানবের পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ প্রকাণ্ড প্রাসাদের সমস্ত তত্ত্ব জানি বলিয়া তাহার দোষ গুণ বলিতে যাওয়া নিজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে যাওয়ার ন্যায় কেবল প্রগল্‌ভতা প্রকাশ মাত্র।

বেদ জ্ঞানধর্ম্মের রত্নাকর হইলেও বেদের আদিম অবস্থা জানিবার বাসনা তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তির মনে উত্থিত হওয়া স্বভাবসঙ্গত। বেদের উৎপত্তি কিরূপে হইল, বেদ কে রচনা করিল, বেদের নির্ম্মাণ কৌশল কাহার হস্তপ্রসূত, বেদের বিচিত্র বচন বিন্যাস কাহার বদন বিনিঃসৃত? ইত্যাকার বিবিধ বিষয়ক প্রশ্ন চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু

ব্যক্তির মনে উদ্ভূত হওয়াই সঙ্গত ও সম্ভব। এবং বলিতে গেলে ইহাতে বিস্মিত হইবারও কোন কারণ নাই। কিন্তু ঐরূপ প্রশ্ন সকলের উত্তর কি উপায়ে কাহার নিকট পাওয়া যাইবে? তাহা না জানিয়া যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করিলে ত চলিবেনা। বুদ্ধিমান্ ভক্তিমান্ পুত্র পরমারাধ্য পিতৃদেবের ও প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপা মাতৃদেবীর বাল্য-জীবন ও শৈশবাবস্থা জানিতে উৎসুক হইলে তাহাকে জনক জননীর জনকজননীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পিতামহ পিতামহী, মাতামহমাতামহী ব্যতীত এ তত্ত্ব তাহাকে কে বুঝাইয়া দিবে? পিতা মাতার বাল্যজীবনসম্বন্ধিনী ঘটনাবলী কে তাহাকে জানাইয়া দিতে সমর্থ হইবে? সংক্ষেপে বলিতে গেলে কে তাহার মনের মত উত্তর দিবে? কে তাহার সংশয় অপনোদনে সক্ষম হইবে? পিতামাতার বাল্যাবস্থা জানিতে হইলে পুত্রের ত এই দশা—এই সঙ্কট উপস্থিত। এখন উপায় কি? এই সমুৎসুক, ও কৌতূহলাক্রান্ত পুত্রের যেরূপ দশা, আজ সুচতুর ভারতবাসী কৌতুক প্রিয় আর্য্য পুত্রদিগেরও সেই দশা। তবে অন্য দেশবাসীর মত তাঁহারা একাবারে উপায়হীন নহেন, কারণ তাঁহাদের পিতামহ আছেন, এই পিতামহের নিকট সমুচিত শ্রদ্ধার সহিত প্রশ্ন করিলে তিনিও উত্তর দানে সমুৎসুক। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা বাপ মা কেই মানে না। ঠাকুরদাদা ত "বুড়াবেটা" নামে পরিচিত। তার কথা যে মনদিয়া শুনিবে বা মানিয়া চলিবে এ আশা এখন আকাশ-কুসুম মাত্র। নতুবা চতুর্ম্মুখ পিতামহের চতুর্ম্মুখ বিনির্গত অমৃত নিঃস্যন্দিনী মধুময়ী বাণী শুনিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে আমাদের স্বদেশবাসী আর্য্য পুত্রদিগের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পরিপূরিত হইত এবং সর্ব্ববিধ অনিষ্টাশঙ্কা অবিশ্বাস ও মর্ম্মব্যথাও বিদূরিত হইত এবং তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-শান্তির পথও পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু ভারতের এ ঘোর দুর্দ্দিনে তেমন শ্রদ্ধাশীল বিশ্বাসী ভক্তিমান্

আর্য্যসন্তান কোথায়? শুষ্ক তর্কের অবতারণা করিয়া নিজের অপক্ক বুদ্ধি বিবেচনার সাহায্যে, ভ্রান্তি প্রমাদ বিজড়িত বিচার শক্তির প্রক্ষীণ প্রভাবে যে অসত্য বা অপ্রকৃত বিষয়কে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি, যে দোষকে গুণ বলিয়া মনে করি, তাহাই লোক সমাজে প্রচারিত করিয়া নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিতে প্রস্তুত ও অগ্রসর হইয়া থাকি।

মূলতত্ত্বের অনুসরণ করা যাউক। বেদ কে রচনা করিল? এই প্রশ্নের দুই দিক্ হইতে বরাবর দুইটী উত্তর আসিয়াছে ও আসিতেছে। একটী উত্তর এই—বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ঈশ্বরাদিষ্ট, তদ্ভাবভাবিত, তচ্ছক্তি অনুপ্রাণিত, তপোনিমগ্ন, যোগনিরত ঋষিমুখোচ্চারিত বিচিত্র বাণী। অপরটীর মতে সুচতুর, বুদ্ধিমান্ লোকহিতৈষী ধর্ম্মপ্রচার-প্রয়াসী পুরুষগণ (কখন কখন স্ত্রীগণও) সময়ে সময়ে অভাব, ইচ্ছা আবশ্যক অনুসারে যে সকল স্তুতি প্রার্থনাদ্বারা অথবা লোক শিক্ষাপ্রদ গল্পাবলীদ্বারা আপন আপন মনোভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই বেদনামবাচ্য। ঐ সকল ব্যক্তিই ঋষি নামে অভিহিত। সুতরাং বেদ পৌরুষেয়, অনিত্য ও ভ্রান্তিসংশয় বিজড়িত মনুষ্যবাক্য মাত্র। দুইটী মত সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, সুতরাং তাহাদের সুচারু সমন্বয় সংসাধন করা সুকঠিন এবং সহজসাধ্য নহে। যেমন সম্ভব এবং সচরাচর যেমন ঘটনীয়, এই দুই মতের অনুকূল প্রতিকূল যুক্তিতর্ক আপত্তিপ্রবাহ আবহমানকাল চলিয়া আসিয়াছে এবং চলিয়া আসিবেক। কেহ কখনই সম্পূর্ণভাবে সন্তোষকর উত্তর প্রদান করিয়া সর্ব্ববাদি সম্মত সুচারু মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন না। দেশকালপাত্র-ভেদে বুদ্ধি বিশ্বাসের বিভিন্নতায় স্বার্থপরার্থের অনুরোধে, যেমন সকল বিষয়ের গুণাগুণের তারতম্য পর্য্যালোচিত, পরিলক্ষিত ও পরিগৃহীত হইয়া থাকে, এই মহত্তত্ত্বের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। কোন সময়েই ইহার ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যদি

তাহা ঘটিত, তবে অনন্ত বৈচিত্র্যশালিনী প্রকৃতির রাজ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইত। বৈদিক মতামত ক্ষণেকের জন্য দূরে রাখিয়া দার্শনিক তত্ত্ব, বৈষয়িকতত্ত্ব বা সাময়িকী ঘটনাবলী একবার আলোচনা করিয়া দেখ দেখি। কখন কি পরিশুদ্ধ ভাবে সর্ব্বজন সম্মত মত পাইযাছ? কখন কি সকলের বিশ্বাস শ্রদ্ধা প্রীতি উৎপাদন করিয়া সর্ব্বোপকারী নিয়ম সঙ্কলন বা ব্যবস্থা প্রণয়নে সক্ষম হইতে পারিয়াছ? যদি সেরূপ মত না পাইয়া থাক; যদি সেরূপ ব্যবস্থা বিধান করিতে না পারিয়া থাক, তবে এ দুর্বিগাহ দুরূহ তত্ত্বের আলোচনায় প্রতিকূল তর্কশক্তির বিচারে মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিবার প্রয়োজন কতদূর উপকারী ও কার্য্যকারক, তাহাও একবার স্থির মনে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

পূর্ব্বে বেদ সম্বন্ধে যে দুইটী মতের উল্লেখ করিলাম। তাহার একটী তত্ত্বদর্শী বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ ধর্ম্মপরায়ণ বেদভক্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণের কথা, মনের ভাবনা ও হৃদয়ের ধারণা। অপরটী তর্কসার, নিজযুক্তি পরায়ণ বেদধর্ম্মাবিশ্বাসী অনুষ্ঠানবিহীন শাস্ত্রভক্তি-শূন্য ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত সংশয়ের অবতারণা। এই দুই মতের পোষকদলের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। নিজ মত সমর্থনে ও পরমত খণ্ডনে আপন আপন অনুমোদিত সংগৃহীত যুক্তিতর্কের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতে কেহই পরাঙ্মুখ ও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষ্যত্ব প্রতিপাদন করিতে যত সংহিতা, যত দর্শন এমন কি যত শাস্ত্র সমুদ্যত ও সমুৎসুক, তাহার সীমা সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদের পৌরুষেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব প্রমাণ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত ও বদ্ধপরিকর তাঁহাদের নাম অতি অল্প, সংখ্যাও মুষ্টিমেয় মাত্র। সাংখ্য, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক প্রভৃতি দার্শনিকগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া যে সকল আপত্তিতর্ক তুলিয়াছেন, তাহাই আধুনিক বেদধর্ম্মে

অবিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গের প্রধান অবলম্বন। অপরপক্ষে সমস্ত সংহিতা, দর্শন, উপনিষৎ ও অপর শাস্ত্রাদি বেদের অপৌরুষ্যতত্ত্ব বিষয়ে বিশ্বাসী ও তৎপ্রতি প্রতিপাদনে যত্নশীল। উভয়পক্ষের যুক্তিতর্কের অবতারণা ও আলোচনা করিতে আমরা অবশ্যই অক্ষম ও অনবসর। যাঁহারা নিতান্ত উৎসুক ও অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা সত্য নির্দ্ধারণ প্রয়াসে না হউক কৌতূহল চরিতার্থ করণাভিলাষে উভয় মতের যুক্তিতর্ক শুনিয়া যাহা উচিত ও সমীচীন বোধ করেন তাহাই অবলম্বন করিবেন। দূরদর্শী তত্ত্বজ্ঞ ভক্তিপ্রবণ পণ্ডিতগণ বলেন—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ।"

অর্থাৎ অচিন্তনীয় ভাবসকলকে তর্কের সহিত সংযুক্ত করা উচিত নয়, যেহেতু তর্কদ্বারা তাহাদের কোন মীমাংসা হয় না।

বেদ সম্বন্ধে যিনি যত আলোচনা করিয়াছেন, সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী অপরিসীম ধীশক্তি সম্পন্ন মহা মহোপাধ্যায় সায়ণাচার্য্যের সহিত তিনি কখনই তুলনীয় নহেন। সায়ণাচার্য্য বেদের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উল্লিখিত প্রশ্ন দ্বয়ের সদুত্তর প্রদানে এমন কি তৎ সংশ্লিষ্ট সংশয় নিরসনে যথোচিত যত্ন করিয়াছেন। তিনি বিরুদ্ধবাদী তর্ককারীদিগের আপত্তি সকল উত্থাপন করিয়া তাহার অপনোদনের চেষ্টারও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার যুক্তির সারমর্ম্ম এই বেদ "স্বপ্রকাশ"। ভূত ভবিষ্যৎ—সূক্ষ্ম স্থূল ব্যবহিত ও দূরস্থ সকল পদার্থই বেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেদই ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য যে মত প্রতিপাদক বেদই সেই মত পোষক। বেদ, তত্ত্ব ও ব্রহ্ম একার্থ বোধক, অভিধান প্রণেতৃগণ পর্য্যন্তও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এজন্য বেদের প্রামাণ্য নিমিত্ত অন্য শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ সমীচীন ও যৌক্তিক নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি পিতামাতার বাল্য জীবন জানিতে হইলে তাঁহাদের পরজন্মা ন্যূনবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কোনই সুফলের প্রত্যাশা নাই। বেদের প্রমাণ বেদই বিবেচনা করা

উচিত। দর্শন, সংহিতা, পুরাণ তন্ত্রাদিদ্বারা তাহার মতামত সমালোচনা করিতে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। পুত্র পিতৃস্কন্ধারোহণ করিয়া বড় হইতে পারে কিন্তু সে বড় হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কারণ স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিলেই তাহার ক্ষুদ্রত্ব জানা যাইবে। তাই বলি বেদ বুঝিতে হইলে বেদের আশ্রয়ই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় ও একমাত্র অবলম্বনীয়। যদি অন্য কাহারও কথা শুনিতে হয়, যাঁহারা তাঁহার সটীক সংবাদ রাখেন তাঁহাদিগের নিকটই যাওয়া উচিত। অতএব বেদের মত আলোচনায় বেদের তত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রের অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য। সময় মত, মনের মত, আবশ্যক মত যাহা পাইলাম, তাই বুঝিলাম, তাই জানিলাম, তাই মানিলাম বলিয়া তৃপ্ত থাকা সুবোধের কর্ম্ম নয়।

যাঁহারা বলেন বেদ অপৌরুষেয় নহে, তাঁহারা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতে চাহেন সমগ্র বেদ একজনের রচিত, এক সময়ে প্রণীত বা এক বিষয়ে নিহিত নহে। বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা পুরুষ কর্ত্তৃক বেদমন্ত্র সকল বিরচিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অতএব বেদ পৌরুষেয়। এই মতের প্রমাণ প্রয়োগ জন্য নবীন প্রবীণ, প্রাচীন অর্ব্বাচীন অনেক ঋষি বা বেদ রচকের নাম তাঁহারা দৃষ্টান্তস্থলে উপস্থাপিত করেন এবং নানাজনে বিবিধ স্তুতি প্রার্থনার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে সকল মন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

বেদমন্ত্র সকল যে এক সময়ে এক বিষয়ে একই ক্ষণে একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়াছে, একথা অন্ধবিশ্বাসী বেদ ভক্তের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায় না। বেদ ঈশ্বর মুখনির্গত অথবা বেদ ব্রহ্মার নিঃশ্বাস স্বরূপ একথা সরল হৃদয় ভক্তিমান্ বেদবিশ্বাসিগণ সময়২ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের রহস্যময় ভাব বিদ্যমান আছে বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বর শরীর ধারণ করিয়া বেদমন্ত্র সকল উচ্চারণ করিয়া থাকিলে এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ হয় বটে, কিন্তু দুই এক খানি আধুনিক পৌরাণিক গ্রন্থে এরূপ উক্তির সমাবেশ থাকিলেও বেদ মধ্যে

এরূপ ভাবের কথা অতি বিরল। বেদ ব্রহ্মার নিঃশ্বাস স্বরূপ এ কথাটী আরও গূঢ়ভাব ব্যঞ্জক; কারণ নিঃশ্বাস কেহ স্বয়ং সৃষ্টি করিতে পারে না যদি নিঃশ্বাসকে প্রাণবল বা জীবনীশক্তিরূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে বেদ ব্রহ্মার জীবন স্বরূপ এক অদ্ভুত পদার্থ হইয়া উঠে। তাঁহার সৃষ্ট বা নির্ম্মিত বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। আবার স্থানান্তরে ব্রহ্মাকে বেদের স্মর্ত্তা বা স্মরণকর্ত্তা মাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু বেদের কর্ত্তা বা রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এই মত বিভেদের উদ্দেশ্য বুঝিতে গেলে এক অনুপম রহস্যময়ী সমস্যা উপস্থিত হইয়া তার্কিক জ্ঞানী বা ভক্ত সাধকের মনেও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। জ্ঞানী বিশ্বাসীর রহস্যময়ী ধারণা এইরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন যাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকেন তাঁহাদের উক্তি কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহাও একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ইঁহারা বেদকে এক সময়ে এক ব্যক্তির রচিত বা গঠিত বলিয়া কখনই বিশ্বাস করেন না, বরং যখন বিভিন্ননামা ঋষির বিভিন্ন সময়োচিত স্তুতি প্রার্থনাকে ঋগাদিবেদ মন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস ও সম্মান করিয়া থাকেন, তখন এক ব্যক্তির রচিত বেদের কথা তাঁহাদিগের নিকট বলিতে যাওয়া বা ঐ অপবাদে তাঁহাদিগকে কলঙ্কিত করা সত্যের অপব্যবহার ও বিড়ম্বনা মাত্র। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন জন্য বেদ বিশ্বাসিগণ নিম্নোক্ত যুক্তি প্রণালী প্রদর্শন জন্য প্রগাঢ় বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বেদের সমস্ত মন্ত্রেই তিনটী বিষয়ের নিত্য প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ছন্দঃ, ঋষি ও দেবতা।

যে ছন্দে বা পরিমিত স্বর ব্যঞ্জনাচ্ছাদনে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহাই ঐ মন্ত্রের ছন্দঃ। যে ঋষিকর্ত্তৃক ঐ মন্ত্র দৃষ্ট বা উচ্চারিত হইয়াছে তিনি ঐ মন্ত্রের ঋষি এবং যে দেবতার উদ্দেশে ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত তিনি ঐ মন্ত্রের দেবতা। এতদ্ব্যতীত প্রয়োগ প্রণালীর প্রয়োজনীয়তাও

অনেক স্থলে পরিব্যক্ত হইয়া আছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় যে মহামন্ত্র গায়ত্রীস্বরূপে জপ করিয়া থাকেন। তাহার ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা সবিতা। ছন্দঃ ও দেবতা লইয়া বিশেষ কোন গোলযোগ নাই কিন্তু যত কিছু গোলযোগ বা বিবাদ বিসংবাদ কেবল ঋষি লইয়া। ঋষিগণ মানুষ পুরুষমাত্র, তাঁহারা বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন, সুতরাং বেদ পৌরুষেয়, এই আপত্তির উত্তরে অপৌরুষেয় বেদবাদিগণ বলেন বেদমন্ত্র সকল ঋষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাঁহারা ঐসকল মন্ত্রের কর্ত্তা নহেন। কারণ দৃশ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ঋষিশব্দের অর্থ দ্রষ্টা বা দর্শক। "ঋষয়োমন্ত্রদ্রষ্টারঃ" এই কথা ইহাঁরা স্বীকার ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই দর্শন ক্রিয়া লইয়াই যত গোলযোগ। (ক্রমশঃ)

—:※:—

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নির্ম্মাল্য—৩য় বর্ষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। নির্ম্মাল্য আমাদিগের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষিত পত্র। বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি মহারাজের অনুরাগ মঙ্গলের বিষয়। "আমার শিকার কাহিনী" বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে নূতন আমদানী। শিকার কাহিনী টা ইংরেজি সাহিত্য ভাণ্ডারের রত্ন বলিয়াই জানিতাম মহারাজের যত্নে তাহা বঙ্গ সাহিত্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সুখী হইলাম। "শিকার কাহিনীর" ভাষা ও বর্ণনা কৌশল চিত্তাকর্ষক হইতেছে। "বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ও চন্দ্রনাথ বাবু" অসম্পূর্ণ সন্দর্ভ. পূর্ব্ব ভাগও আমরা দেখিতে পাই নাই। আলোচিত অংশে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "বাঙ্গালা ভাষার বর্ণবিন্যাস ও তাহার সংস্কার" প্রভৃতির ন্যায় প্রবন্ধ যত লিখিত হয় ততইভাল। জলধর বাবুর গল্প দুইটী পড়িয়া নিরাশ হইতে হইল।

প্রয়াস—২য় বর্ষ, জুন, "সন্তান শিক্ষা" এবং "বিহারী লাল" দুইটী সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। "ফুলের সাজিতে" সুগন্ধি ফুলের অভাব।

তুমি যদি।

তুমি যদি দয়াময়! প্রাণে থাক ছেয়ে,
বুকে থাকে যদি অই অভয় চরণ,
সংসারের কোলাহল কে দেখিবে চেয়ে,
কিসে সুখ কিসে দুঃখ কে করে গণন?

যা'ক বা আসুক শত বসন্ত বরষা,
হাসুক কাঁদুক বিশ্ব স্বভাবের তরে,
নিরাশা থাকুক হৃদে অথবা ভরসা,
তাহে কিবা লাভ ক্ষতি কেবা মনে করে?

তুমি শুধু থেকো প্রাণে সম্পদে বিপদে,
দিও দয়া, দিও স্নেহ, মাখিয়া আদর,
লুটাইব শ্রান্ত শির ও রাঙ্গীব পদে
জীবন সমরে কভু হব না কাতর।

যদি তুমি কাছে—আরো কাছে এস স'রে
বুঝিবা "বিজয়ী" হয়ে সুখে যাব ম'রে!

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

—০—

তৃষিত।

আমি নবঘন আশে, রহিয়াছি বসে,
কখন ঝরিবে বারি?
কখন বহিবে শীতল বাতাস
গলিবে হৃদয় তারি?
অই আসে আসে, যায় ভেসে ভেসে,
আমার পরাণ চোর।
কখন করুণা হইবে তাহার
ভিজিবে রসনা মোর?
মোরে সকলে দেখায় তড়াগ শম্বল
সরিৎ সলিল রাশি,
সংসারের শত আবিলতা মাখা,
আমি নাহি ভালবাসি।
হয় হোক্ মোর দারুণ যাতনা,
যায় যদি যাক্ প্রাণ।
আমি শপথ করেছি করিব না কভু
অধোমুখে বারিপান।
যাক্ দূরে যাক্ বসন্ত নিদাঘ,
রহিব ধেয়ান ধরি।
আমি কাটিব বরষ এ পিপাসা ল'য়ে
বরষা ভরসা করি।

শ্রীমনোমোহন সেন

—০—

পাপ স্বপ্রকাশ।

বসনে রোধিতে চাও আগুনের কণা?
রোধিবে পদ্মার স্রোত বালির বন্ধনে?
ঢাকিয়া রাখিবে পাপ করি প্রতারণা?
হা মূর্খ, তাও কি হয়? হবে বা কেমনে?

অদৃশ্য প্রহরী এক বসি অন্তরালে
জাননা, তোমার পাপ করে দরশন?
রোধিবে তাহার আঁখি কোন মায়াজালে?
সে নহে সামান্য কেহ—জগত-লোচন।

সে সদা বাজাবে ডঙ্কা বিরলে বসিয়া
সে সদা করিবে তব কলঙ্ক ঘোষণ,
দহিবে নরকানলে তব পাপ হিয়া
কেমনে করিবে বল তারে নিবারণ ?

যত যত্ন কর, পাপ রবে না গোপনে
জলন্ত অনল ঢাকা থাকে না বসনে!

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

—o—

কদম্ব।

নিদাঘের অবসানে,
তৃপ্ত পাপিয়ার গানে,
পুলকে শিহরি উঠে কদম্ব কুসুম।
সজল সমীরে তার
বহিয়া সৌরভ ভার,
ভাঙ্গে জগতের চোকে বিরহের ঘুম।

তাহারি মধুর বাসে
স্মৃতি পরশিয়া আসে,
দূর দ্বাপরের সেই অতীত কাহিনী,
বিধুরা ব্রজের বালা,
কপট কঠিন কালা,
কালো কালিন্দীর ধারা আনন্দ বাহিনী।

হেরিয়া রোমাঞ্চ তার,
মনে পড়ে রাধিকার,
সুখ-সান্ধ্য অভিসার, নিধুবন বাসে।
মধুর ঝুলন খেলা
মনে পড়ে, সন্ধ্যা বেলা
সে যখন কেঁপে উঠে পুরবের বাতাসে।

তাহারি শ্যামল শাখে
পাপিয়া যখন ডাকে,
মনে পড়ে মধুময় শ্যামের বাঁশরী।
প্রোষিত আভীর বালা
কি ক্রুত বিরহ জ্বালা,
বিরলে বাঁশীর ডাকে আপনা পাসরি।

হে কদম্ব! তব তলে
নিতি গোচারণ ছলে
সাজিত রাখাল রাজ, রাধিকারমণ ;
তোমার শীতল ছায়ে
বসিলে, এখনো গায়ে
লাগিয়া, শীতলে তার পূত পরশন।

তোমারি সুন্দর শাখে
জড়াইয়া পাকে পাকে,
লুণ্ঠিত বসনরাশি রাখি শ্যাম রায় ;
উলঙ্গ গোপিনীগণে
সাধাইয়া প্রাণ-পণে,
আটকি রাখিয়াছিল নীল-যমুনায়।

পুণ্যময় যদুবংশ
সমূলে হইলে ধ্বংস,
শ্যাম-শষ্প শয্যা তলে—তব পুণ্য মূলে
ত্যজিয়ে ছিলেন প্রাণ,
বিশ্বপতি ভগবান,
অতি ক্ষীণজীবী সম ব্যাধ বিদ্ধ শূলে!

তোমারে দেখিয়া তরু,
সিক্ত এ হৃদয় মরু,
শ্যাম-স্মৃতি-সুধা-সিন্ধু উথলে প্রবল!
তোমারি পল্লব পত্রে
পড়ি আমি ছত্রে ছত্রে,
অতীতের ইতিহাস অতি অনর্গল।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

—o—

জাতীয় জীবন।

—o—

জাতীয়জীবনে উপযুক্তরূপ শক্তিসঞ্চয় ভিন্ন জাতীয় উন্নতি কখনও সংসাধিত হইতে পারে না, পৃথিবীর প্রত্যেক উন্নত জাতির ইতিহাস এ অভ্রান্ত সত্যের মহিমা প্রতিনিয়তই জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। আমাদের মুখেও যে সময়ে সময়ে উপযুক্ত ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত না হয়, এমত নয়; কিন্তু তাহা এত গুরুত্ব-বিহীন যে, বায়ুর আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে ঊর্দ্ধে অনন্ত ব্যোমের কোন নিভৃত কক্ষে যাইয়া বিলীন হইয়া পড়ে। বাক্যের গুরুত্ব রক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক।

মুখে, নাম মাত্র উচ্চারণে ইষ্টদেবতা কখনও অভীষ্টবর প্রদান করিতে সশরীরে সম্মুখবর্ত্তী হয়েন না। মনটাকে স্থির বিশ্বাসের বজ্র-বন্ধনে সংবদ্ধ করিয়া আবেগসংক্ষুব্ধহৃদয় সহকারে উপযুক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইতে পারিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। জাতীয় উন্নতি জাতীয় জীবনসাপেক্ষ, আমরা এ কথা জীবনে কতবার উচ্চারণ করিয়াছি, গণনা করিতে বসিলে অঙ্গুলির পর্ব্বমালায় সঙ্কুলন করিয়া উঠিতে সমর্থ হইব কিনা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু জাতিদেহে সঞ্জীবনী শক্তি-সঞ্চার-কল্পে নিঃস্বার্থ হৃদয় টুকু লইয়া কখন কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়াছ কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া স্মৃতির পুরাতন খাতাপত্র অতি সতর্কতার সহিত অনুসন্ধানেও নিশ্চয় আমাদিগকে লজ্জায় নতশির হইতে হইবে। এ বচনবাগীশ কিন্তু কার্য্যবিমুখ জাতির উন্নতিসাধন কি প্রকারে সহজসাধ্য হইতে পারে ?

এই উন্নতির যুগে সকলেই দ্রুত পদবিক্ষেপে উন্নতির স্বর্গরাজ্যাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছেন—যেন প্রত্যেকেই অপর প্রতিদ্বন্দ্বিদিগকে পরাস্ত করিয়া সম্মুখের স্বর্ণসিংহাসনটী লাভাশায় ব্যাকুল হইয়া

পড়িয়াছেন। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় "ভারত যে তিমিরে ভারত সে তিমিরে" এ লজ্জা রাখিবার স্থান নাই।

জাতিশরীরে জীবনী শক্তি অনুপ্রবিষ্ট করা ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষের সাধ্যায়ত্ত নয়; উহাতে দেশের জন সাধারণের সমবেত শক্তিসংযোগের আবশ্যকতা রহিয়াছে, এ কথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু এই বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন এ কথা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে হইবে। যাহার শক্তি যত, তাহার কর্ত্তব্যও তত। কার্য্যকারিতা শক্তির পরিমাণানুসারেই কর্ত্তব্যের গুরুত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই দেশের ইষ্ট চিন্তায় নিয়োজিত হইতে গুরুতর ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, সর্ব্ববিধ সুখসম্পদের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতায় স্বীয় জীবনটাকে মধুময় করিয়া তুলিতে পারিলেই শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদিত হইল। ইঁহারা স্ত্রীপুত্রাদিসমন্বিত স্বকীয় সামান্য সংসার খানার গণ্ডী রেখার ভিতরে সার্কাসের ঘোটকের ন্যায় বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান থাকাকেই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি মনে করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র এবং ভারতবর্ষের যাবতীয় নরনারী তাঁহাদের আত্মীয় পরিজন, এ কথা ভাবিবার অবসর পান না। জানিনা বিধাতা এ দুর্দ্দিন কতদিনে তিরোহিত করিবেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রকৃত পক্ষেই দেশের হিতকল্পে আপনাদের শক্তিসংযোজনাকে পরম পুণ্যকর কার্য্য মনে করিয়া থাকেন, ইহারই ফল, নব্যভারতের অতি গৌরবের বস্তু "ন্যাশনেল কংগ্রেশ বা জাতীয় মহাসমিতি"। জাতীয় মহাসমিতি জাতীয় জীবনে শক্তি প্রদান করিতেই জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের বিষয় নাই। কিন্তু আমরা কর্ত্তব্যানুরোধে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিনা যে পরিচালকগণ সমিতিকে সময়োচিত কার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত

না করিয়া ভ্রমবশতঃ অন্য পথে পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং তদ্দ্বারাও বিশেষ ফল লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। জাতীয় জীবন লাভের উপায় কি? এবং তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যই বা কি? ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার উপায় পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়া আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিরই গুরুতর আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি।

(১) জাতীয় ভাষার উন্নতি।
(২) সাধারণের উন্নতি।
(৩) সংকীর্ণতা পরিহার।

(১) জাতীয় ভাষার উন্নতি ভিন্ন জাতীয় জীবন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না, এ কথা বেদবাক্য তুল্য অভ্রান্ত। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলস ও আয়র্লণ্ড এই প্রদেশ চতুষ্টয়ের মধ্যে যখন ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমানছিল। যখন রোমান, সাক্সন ও নর্ম্মান জাতি ব্রিটন ভূমে ভাষা বৈষম্যের ভয়ঙ্কর দাবানল প্রজ্জলিত করিয়া দিলেন, তখন ব্রিটিশ জাতি জাতীয়তা হিসাবে জগতের অতি নিম্নদেশে অবস্থিত। কালচক্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটীশ জাতির ভাগ্যচক্রেরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল; টিউডার রাজবংশের অভ্যুদয়ে ভাষাবৈষম্যের প্রবল স্রোত মন্দীভূত হইয়া জাতীয় ভাষার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, ব্রিটন ভূমে জাতীয় জীবনের আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ইটালীর সেই তামসযুগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; ভাষা বৈষম্যজনিত প্রাদেশিক বিদ্বেষানলে ইটালী দগ্ধীভূত হইতেছিল, সময় ফিরিল, ল্যাটিন ভাষার একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল; এট্না গিরির উন্নত শৃঙ্গমালায় রোমের গৌরব ধ্বজা সগর্ব্বে উড্ডীন হইতে লাগিল।

ভারতবর্ষ বহুবিধ জাতির অধিষ্ঠান ভূমি, জাতি ভেদে ভাষা ভেদে ভারতবর্ষ বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশে এমন একটা

ভাষা প্রচলিত নাই, যাহাতে মনের ভাব অভিব্যক্ত করিলে অপামর সাধারণ সকলে তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া উঠিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষে জাতীয়ভাষা নামক একটা সাধারণ জিনিষের অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হয় না। অনেকের ধারণা এ পার্থক্যবহুল ভারতক্ষেত্রে জাতীয়ভাষারূপ একটা সাধারণ সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা কোন মতেই সম্ভবনীয় নয়। কিন্তু আমরা এ মতের সমর্থন করিতে পারি না, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকৃতি নীরবে এ অধঃপতিত জাতির জাতীয় ভাষার বিরাট ভিত্তি গ্রন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সময়ে দেখিতে পাইব বাঙ্গলা ভাষা ভারতের অপরাপর ভাষা সমূহকে হীনপ্রভ করিয়া আপনার উজ্জ্বল প্রভায় চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। নিম্নে আমাদের এ বিশ্বাসের পোষক প্রমাণ উপস্থিত করা গেল।

ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রদেশস্থ লোকই কর্ম্মসূত্রে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এ পক্ষে এরূপ বলা অসঙ্গত নয় যে, যাহা নাই বাঙ্গলায় তাহা নাই ভারতে। বাঙ্গলার জল বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলাপ্রবাসিদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে। অন্যদিকে আবার দাসত্বপ্রিয় বাঙ্গালিগণ চাকুরীর মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পদার্পণ করিতেছেন এই সূত্রে ও তৎ তৎ দেশের ঊষরক্ষেত্রে বাঙ্গলাভাষার মহাবীজ নীরবে সংরক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই যে বাঙ্গলা ভাষাজ্ঞ দুই চারি জন লোকের অস্তিত্ব দেখা যায় উপর্য্যুক্ত কারণ ব্যতীত তাহার আর হেত্বন্তর নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী শিক্ষিত লোক স্বীয় ভাষাকে দূরে রাখিয়া আজ বাঙ্গলা ভাষার সেবায় দেহমন উৎসর্গ করিতেছেন ইহা কাহার না লক্ষ্যীভূত হইতেছে? ইহা হইতেই আমরা প্রাকৃতিক শক্তির অনুকূলতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি। ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে কোন ভাষাই উন্নতির উচ্চতায় বাঙ্গলা

ভাষার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে না, সুতরাং বাঙ্গলাভাষাকে অতিক্রম করিয়া কোন ভাষাই জাতীয় ভাষার আসন গ্রহণ করিতে অধিকারিণী নহেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদে বাঙ্গলাভাষা যেরূপ বেগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায়, ইনি অচিরে পাশ্চাত্য ভাষার গৌরব চূড়া স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবেন। এই সুসময়ে আমাদিগকে শুধু দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না; পুরুষকার অবলম্বন করিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া যাহাতে বাঙ্গলা ভাষার প্রচারবাহুল্য ঘটিতে পারে এবং উচ্চাঙ্গের বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রণেতৃগণ যাহাতে উপযুক্তরূপ পুরস্কারের অধিকারী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক শক্তির সহিত আমাদের কর্ম্ম শক্তির সম্মিলন হইলে অচিরেই শুভ ফল প্রসূত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে।

(২) সাধারণের উন্নতি ভিন্ন জাতীয় জীবনের উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না। উচ্চ শিক্ষিতগণ জাতীয় শরীরের মস্তক; মধ্যম শ্রেণী হস্ত এবং নিম্ন শ্রেণী পদ বিশেষ। শরীরের এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের গুরুতর সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। শরীর দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ করিতে হইলে প্রত্যেক অঙ্গের সজীবতা রক্ষা আবশ্যক। যাহার এক অঙ্গ বাতব্যাধিতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে তিনি জীবন্মৃত। মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা তাহার নিকট বেশী কিছু আশা করা যাইতে পারে না। সাধারণের উন্নতি সাধন ভিন্ন ভারতবর্ষ কিছুতেই উত্থিত হইতে সমর্থ হইবে না। এই উন্নতি সাধন সহজ সাধ্য নয়। শব-দেহ শক্তিযুক্ত করিতে কঠোর সাধনার আবশ্যক! শিক্ষার পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর আবির্ভাব ভিন্ন এ বিপুল সগরবংশের উদ্ধার নাই। উন্নতি শিক্ষাসাপেক্ষ। শিক্ষা প্রবৃত্তির পশ্চাচ্চারিণী। প্রবৃত্তি, প্রলোভনের পরিণীতা সহধর্ম্মিণী, সুতরাং সাধারণের শিক্ষাপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতে হইলে প্রথমতঃ গুরুতর প্রলোভনের সামগ্রী তাহাদের

সম্মুখে উপস্থাপিত করা আবশ্যক। নিরক্ষরা ভারতমহিলাগণের শিক্ষা প্রবৃত্তির মূল বিশ্লেষণ করিলে তথায় প্রলোভনের সৌন্দর্য্যমণ্ডিতা মহামহিমা বিরাট মূর্ত্তির অটল অধিষ্ঠানই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীশিক্ষাসমিতি পুরস্কারের বিপুলভাণ্ডহস্তে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে, আজিও মহিলাজগতে শিক্ষার তরুণজ্যোতি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত কি না সন্দেহের বিষয়।

(৩) সংকীর্ণতা সমাজ শরীরের সন্ধিশ্লথকারী মহাব্যাধি। এ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের সহানুভূতি নাই। প্লেগের ক্ষয়কারিণী মহাশক্তি অপেক্ষা সংকীর্ণতার সর্ব্বনাশকারিণী শক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে অধিকতর ভয়াবহ। এ দুষ্ট ব্যাধির প্রতিকার সম্ভবপর না হইলে আমাদের উন্নতির আশা প্রতি মুহূর্ত্তে দুরাশায় পরিবর্ত্তিত হইবে। অনেকে ধর্ম্মোন্নতিকে এ মহাব্যাধির সুব্যবস্থিত মহৌষধ মনে করেন। আমরাও এ মতের সমর্থন না করি এমন নয়। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় আমরা ধর্ম্মোন্নতি শব্দে সমগ্র ভারত ব্যাপী এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিতে পারি না। ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই আমাদের ধারণা। সম্ভবনীয় হইলেও সে সময় ভবিষ্যতের কোন অপরিচিত রাজ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে, আমরা কল্পনার চক্ষেও তাহা নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ। আমরা ধর্ম্মোন্নতি শব্দে প্রত্যেক ধর্ম্মের সময়োচিত সংস্কার সাধনকে নির্দ্দেশ করিতেছি। ভারতের এক ধর্ম্মাবলম্বী, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর অমঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। এবং এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করাকে পাপকর কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। মতদ্রোহ হইতে ভয়ঙ্কর আত্মদ্রোহের সূচনা হইয়াছে। এই হিংসা বৃত্তির বিলোপ সাধন ব্যতীত ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। সেই জন্যই আমরা প্রত্যেক ধর্ম্মের সহিত উদারতার সংমিশ্রণের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। বিধাতার রাজ্যে সকল মনুষ্যই সমান,

সকলে একস্থান হইতে একই কার্য্য সাধনোপলক্ষে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; পরিণামে আবার সকলকে একই স্থানে মিলিত হইতে হইবে; ইত্যাদি বাক্য প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল সূত্রের সহিত সংযোজিত হওয়া আবশ্যক। এরূপ বাক্যই সংকীর্ণতারূপ সর্পযজ্ঞানুষ্ঠানের মূলমন্ত্র।

সংকীর্ণতার ধ্বংস সাধন সহজ সাধ্য করিবার আরও এক প্রকৃষ্ট উপায় বিদ্যমান আছে। তাহা এই :—দেশের স্বার্থের সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্বন্ধ নির্ণয়। এ ক্ষেত্রে দেশের বাগ্মী এবং সংবাদপত্র সমূহের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। যখন মানুষ দেশের স্বার্থের সহিত নিজ স্বার্থের অভেদত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার হৃদয় স্বদেশ প্রেমের পুণ্যালোকে আলোকিত হইয়া উঠে। এবং তখনই সংকীর্ণতার আমূল ধ্বংস সাধন সম্পন্ন হয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির ভাব সঞ্চারিত হইতে পারে না, অনেকে এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাস পরিপোষণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমরা এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। এ ধর্ম্ম বৈষম্য পরিপূর্ণ ভারত ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে যে প্রীতির খেলা দেখা যায় তাহাতে কাহার না হৃদয় আশার সঞ্জীবনী শক্তিসংস্পর্শে সজীব হইয়া উঠে? সাধারণ স্বার্থের বিষয়াবলম্বনে দুইটী গণ্ডগ্রামের মধ্যে যখন বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তখন জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ ভুলিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণ পরস্পরের পার্শ্বে কি রূপ অভিন্নভাবে দণ্ডায়মান হইতে জানে, তাহা আইন ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অথবা আজ কাল প্লেগ দাঙ্গায় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর এক প্রাণতা কাহার না দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে? তবে কেমন করিয়া স্বীকার করিব ভারতের সমগ্র জাতির স্বার্থ যখন এক হইবে, তখন তাহা সাধন জন্য ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী একই ক্ষেত্রে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইতে পারিবে না?

সংকীর্ণতার ধ্বংস সাধন সম্পন্ন এবং স্বদেশ প্রীতিরভাব জাগ-

রিত হইলে একতার একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। এ উদার নৈতিক সম্রাটের সুশাসনে ভারতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়া আসিবে। নব-সূর্য্যালোকে অমারজনীর ঘনান্ধকারসমাচ্ছাদিত ভারত-মুখ আবার সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। শান্তিমলয়ের সুমন্দপ্রবাহে অশান্তির অসহ্য আগ্নেয় স্পর্শ শীতল হইয়া আসিবে। সাহিত্যের তপোবনে বসিয়া সিদ্ধগায়ক অভিনব সামসঙ্গীতে ভারতগগণ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিবেন। অভাবের অবসান হইবে। আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইবে। সমগ্র ভারত জীবন্ত জীবনের একই তরঙ্গাভিঘাতে তরঙ্গায়িত থাকিবে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়

একখানি ঐতিহাসিক চিত্র।

—:※:—

ধর্ম্মান্ধ আলাউদ্দিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই হিন্দুবিদ্বেষ চরিতার্থ ও এসলাম্ ধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধন জন্য ভারতবর্ষের হিন্দুরাজ্য সমূহ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এজন্য তিনি রাজ্যলাভের তৃতীয়বর্ষে গুজরাট রাজ্যে মুসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য বিংশতি সহস্র পদাতিক ও চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। মুসলমান সেনাপতি বন্যার জলের ন্যায় গুজরাটরাজ্যে পতিত হইয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করে, তাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের সুখশান্তি চিরকালের জন্য নিমজ্জিত হইয়া যায়। বিজয়োন্মত্ত মুসলমান সৈন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করে, এবং তাহার পর বালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে হতাবশিষ্ট হিন্দুদিগকে বন্দী করিয়া অপরিমিত ধনরত্ন হস্তগত করে। ইতিহাসবেত্তা ওয়াসেফ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে এই অভিযানকালে কাম্বের বিংশতি সহস্র রূপবতী

অনূঢ়া বালিকা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল।

এই সময় কারণ রায় নামক এক সুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় গুজরাটের অধিপতি ছিলেন। তিনি মুসলমান সেনার গ্রাস হইতে রাজ্যরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। তদীয় মহিষী শত্রুহস্তে পতিত হন। এই রাজমহিষীর নাম কমলাদেবী। তাঁহার অতুল সৌন্দর্য্যখ্যাতি সর্ব্বত্র সুবিদিত ছিল। মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরিস্তা তাঁহাকে ভারতোদ্যানের কমনীয় কুসুম বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান সেনাপতি রাজমহিষীকে দিল্লীতে আনয়ন করিলে, কামুক-রূপলোলুপ আলাউদ্দিন সেই অপরূপ রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। মুসলমান সম্রাটের অন্তঃপুরে হিন্দুরমণী ধর্ম্মপত্নীরূপে গৃহীত হইবার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। মোগলবংশীয় বাদশাহগণ হিন্দুরাজাদিগকে আপনাদের পক্ষপাতী করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে বৈবাহিকবন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। কিন্তু এই প্রথম দৃষ্টান্তের মূলে অণুমাত্রও হিন্দুপ্রীতি বর্ত্তমান ছিল না। হিন্দুবিদ্বেষ এবং ইন্দ্রিয়লালসার চরিতার্থতাই আলাউদ্দীনের এ কার্য্যানুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

কারণ রায়ের ঔরসজাত কমলাদেবীর দুই কন্যা ছিলেন। কমলাদেবী শত্রুহস্তে বন্দিনী হইবার সময় তাঁহারা পিতার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা পলায়নকালে পথক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যা পথের অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও জীবিতা ছিলেন। কমলাদেবী তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আলাউদ্দীন কমলাদেবীর সৌন্দর্য্যমোহে এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ কনিষ্ঠা কন্যার অনুসন্ধানের নিমিত্ত সর্ব্বত্র আদেশ প্রচার ও লোক প্রেরণ করিতে অণুমাত্রও কালবিলম্ব করিলেন না। তদনুসারে আল্প খাঁ অনেক অনুসন্ধানের পর এলোরার বিচিত্র গুহাভ্যন্তরে কন্যারত্নের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহাকে

দিল্লীতে প্রেরণ করেন।

এই কন্যারত্নের নাম দেবলাদেবী। দেবলাদেবী দিল্লীর রাজ অন্তঃপুরে গৃহীত হইলে আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁর রূপগুণে মোহিত হইয়া তাঁহারই পক্ষপাতিনী হইয়া উঠেন। সে কাহিনী বিচিত্র বিলাসরসসংজাত ও আদ্যন্ত প্রেমসৌরভ পূর্ণ।

আলাউদ্দীন, খিজির খাঁ ও দেবলা দেবীকে পরিণয়সূত্রে বন্ধন করিতে অভিলাষ করেন। খিজিরের আকৃতি কমলা দেবীর ভ্রাতার অনুরূপ এবং প্রকৃতি সুমধুর ছিল। এজন্য কমলা দেবী তাঁহাকে স্নেহ করিতেন; তিনি সানন্দে সুলতানের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং বালকবালিকা একসঙ্গে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন ও বালসুলভ ক্রীড়াকৌতুকে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই ভাবে দেখিতে দেখিতে তাহাদের ক্ষুদ্রহৃদয়ে প্রগাঢ় অনুরাগের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু প্রণয়ের পরিণাম চিরকালই শোকদুঃখপূর্ণ। অশ্রুজল বিশুদ্ধ প্রণয়ের নিত্য সহচর। খিজির খাঁ এবং দেবলা দেবীর অদৃষ্টেও তাঁহার অন্যথা হয় নাই। খিজির খাঁর মাতা এই প্রণয়ের পক্ষপাতিনী ছিলেন না। তিনি আপন পথের কণ্টকস্বরূপ এই বাল্যপ্রণয়ের বীজ খিজির খাঁর হৃদয় হইতে উৎপাটন করিবার মানসে প্রণয়িযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষীণধারা স্রোতস্বতী গন্তব্যপথে বাধা প্রাপ্ত হইলে যেমন কুলপরিপ্লাবনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। পরস্পরের সাক্ষাৎ সন্দর্শনের প্রকাশ্য উপায় তিরোহিত হওয়াতে এই নবানুরাগী প্রণয়িযুগলেরও প্রেমের প্রবাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রেমোদ্বেলিতচিত্তে গোপনভাবে মিলিত হইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ইহাও প্রকাশিত হইল, রাজরাণী তখন সেপথও রুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। খিজির খাঁ প্রণয়িনীর অদর্শন আশঙ্কায় একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি বিরহ শোকাবেগ সহ্য করিতে না

পারিয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে আপনার গভীর মানসিক আবেগের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মানসিক যন্ত্রণার পরিচায়ক কাতরোক্তিতে রাজ মহিষীর হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি পুত্রের চিত্তাবেগ প্রশমিত করিবার জন্য আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর পুনরায় প্রণয়ি-যুগলের গোপন মিলনের বন্দোবস্ত হইল। এবং সে তীব্র আনন্দের মোহে তাঁহারা একেবারেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনায় রাজ মহিষী দেবলা দেবীকে পুনরায় স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। খিজির খাঁ পথিমধ্যে যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে এক গুচ্ছ কেশ স্মরণচিহ্নস্বরূপ অর্পণ করেন। দেবলা দেবীও প্রতিদানে অকৃত্রিম প্রেমনিদর্শন স্বরূপ স্বীয় অঙ্গুরীয়ক বিনিময়দ্বারা সে স্মৃতি দৃঢ়তর ভাবে রক্ষা করিলেন।

ইহার পর খিজির খাঁ মাতার সন্তোষ বিধানের জন্য সে সুখ-স্মৃতি বিসর্জ্জন করিয়া মাতুলকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দেবলা দেবী এই পরিণয় সংবাদ শ্রুত হইয়া, খিজির খাঁকে একখানি অতি মধুর ভৎর্সনাপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিলেন। খিজির খাঁ এই প্রেম-লিপি প্রাপ্ত হইয়া প্রেমোন্মত্তভাবে গভীর মর্ম্মযাতনা ভোগকরিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে এরূপ মর্ম্মবেদনা প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, রাজমহিষীর অন্তঃকরণও অবশেষে তাহাতে দ্রবীভূত হইয়া গেল, এবং তিনি সে বিবাহে অনুমতি দান করিতে বাধ্য হইয়া গেল। এইভাবে বহু কষ্টের পর প্রণয়িযুগল পরিণয় বন্ধনে সম্মিলিত হইলেন। এইভাবে বহু কষ্টের পর প্রণয়িযুগল পরিণয় বন্ধনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং আত্মহারা হইয়া আপন আপন হৃদয়পোষিত বহু-কালের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই প্রেমিক প্রেমিকা দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন মিলন সুখ-সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। রাজনীতির কুটিলচক্রের বিঘূর্ণনে খিজির খাঁ পিতৃহৃদয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন এবং

তাঁহার রোষাগ্নিতে প্রণয়িযুগলের সমস্ত সুখশান্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়।

এই সম্মিলনের পর সুলতান আলাউদ্দীন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। রাজপুত্র খিজির খাঁ পিতার আরোগ্য কামনায় এই 'মানত' করেন, যে "পিতা নিরাময় হইলে আমি নগ্নপদে পদব্রজে কোন তীর্থক্ষেত্রে গমন করিব।" যথাসময়ে আলাউদ্দীনের পীড়া কথঞ্চিৎ উপশম প্রাপ্ত হইলে, খিজির খাঁ হতানপুর নামক তীর্থক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার পদদ্বয় ভ্রমণকষ্টে ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় অনুচরবর্গের অনুরোধে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হতানপুরে উপনীত হইতে বাধ্য হয়েন। এই ঘটনাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূলসূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মালিক কাফুর নামক একজন ক্রীতদাস ভাগ্যলক্ষ্মীর আকস্মিক কৃপাকটাক্ষে এক বিশিষ্ট রাজপদে উন্নতিলাভ করেন এবং যাবতীয় রাজকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। খিজির খাঁর শ্বশুর আল্প খাঁর সঙ্গে (আল্প খাঁ খিজির খাঁর মাতার ভ্রাতা ও প্রথমা পত্নীর পিতা) কাফুরের মনোমালিন্য ছিল। খিজির খাঁ সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র, সুতরাং রাজসিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য। খিজির খাঁ রাজ্যাধিকারী হইলে আল্প খাঁর প্রাধান্য সংস্থাপিত হইবে এবং মালিক কাফুর ক্ষমতাচ্যুত হইবেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। এজন্য কাফুর আপন প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ ঘটাইবার সুযোগ অন্বেষণে নিরত ছিলেন। খিজির খাঁর পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজনিত অবিবেচনার সূত্র অবলম্বন করিয়া মালিক কাফুর তাঁহার বিরুদ্ধে সুলতানকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার সুনিপুণ কৌশলে সুলতানের প্রতীতি জন্মিল যে তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্যই খিজির খাঁ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন। কৌশলী মন্ত্রীর প্ররোচনায় আলাউদ্দীনের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং তাহাতে সর্ব্ব প্রথমেই আল্প খাঁর জীবন আহুতিস্বরূপ প্রদত্ত হয়। এই সময় খিজির খাঁ মিরাটে অবস্থান

করিতেছিলেন। সুলতান তাঁহাকে বিনা অনুমতিতে, রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়া রাজপ্রাসাদের চিহ্নস্বরূপ যে সকল চন্দ্রাতপ, 'দুর্ব্বাস', পতাকা এবং হস্তী প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিতে ও অচিরে অমরোহে যাইতে আদেশলিপি প্রেরণ করেন। অম্বর নামক জনৈক কদাকার এবং বলবান দূতের সঙ্গে এই আদেশ লিপি প্রেরিত হয়। কথিত আছে যে, সে ব্যক্তি এক রাত্রিতেই দিল্লী হইতে মিরাট অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিল।

খিজির খাঁ পিতৃ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অকারণ ক্রোধে একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রাজপ্রসাদের চিহ্নস্বরূপ যে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্বকীয় ভৃত্য হিসামউদ্দীনের সহযোগে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তাহার পর তিনি পিতৃনির্দ্দেশ মত অমরোহে বাস করিবার জন্য বাষ্পাকুললোচনে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হয়েন। নির্ব্বাসনের অব্যবহিত পরেই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য প্রবলাকার ধারণ করে এবং তিনি পিতৃদর্শন জন্য বিনা অনুমতিতে রাজধানীতে উপনীত হন। এইবার কাফুরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন দোষে মালিক কাফুরের চক্রান্তে খিজির খাঁ গোয়ালিয়ারের ভীষণ দুর্গে চিরবন্দী হইলেন। এই ভীষণ কারাগারেও দেবলা দেবী তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। এই দুর্ব্বহ অবস্থায় সাধ্বী পত্নীর প্রেমময় সেবাশুশ্রূষাই খিজিরের একমাত্র সান্ত্বনার হেতু হইয়াছিল।

১৩১৬ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন জীবলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র সাহাবুদ্দীন ওমর মালিক কাফুরের সাহায্যে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। মালিক কাফুর খিজির খাঁর চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য সম্বলনামক এক জন দুরাত্মাকে প্রেরণ করেন। এই নৃশংসকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, সম্বল স্বীয় দুষ্কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ নায়েব হাজিরের পদে উন্নীত হন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিয়দ্দিবস পরেই আলাউদ্দীনের ক্রীতদাস ও শরীর রক্ষকগণ মালিক কাফুরকে হত্যা করিয়া সম্রাটের চতুর্থ পুত্র কুতুব উদ্দীন খাঁকে রাজসিংহাসন প্রদান করে। ইন্দ্রিয়পরবশ কুতুব উদ্দীন রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেবলা দেবীর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সাধ্বী রমণীর নির্ম্মল চরিত্র তাঁহার পাপ-লালসা সংযত করিতে পারে নাই। কুতুব আপনার পাপাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য দেবলা দেবীকে দিল্লীতে আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করে। দেবলা দেবী অন্ধপতির পক্ষে আলোক স্বরূপিণী ছিলেন। তাঁহার সুশীতল প্রেম-চ্ছায়ায় খিজির খাঁর যন্ত্রণাবিদগ্ধ হৃদয় শান্তি লাভ করিতে ছিল। পতিপ্রাণা সতীর তাদৃশ অবমাননা অনুভব করিয়া খিজির খাঁর বদন মণ্ডল ক্রোধে ও ক্ষোভে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি অবজ্ঞাভরে ভৎর্সনাপূর্ণ উত্তর দিয়া রাজদূতকে বিদায় করিয়া দেন। কুতুব আপনার পাপসঙ্কল্পে ব্যর্থকাম হইয়া রোষদীপ্ত হইয়া উঠে। পূর্ব্ব হইতেই কুতুব উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদিগকে তরবারি সাহায্যে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়া নিরাপদ হইবার জন্য অবসর খুজিতে ছিল। এই ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া সে, আপন ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। খিজির খাঁ, সাদি খাঁ ও ওমর এই তিন রাজপুত্র গোয়ালিয়ার দুর্গের কারাগারে রাজাজ্ঞায় বন্দী ছিলেন। কুতুব এই সকল রাজপুত্রকে নিহত করিবার জন্য সাদি নামধেয় জনৈক দুরাত্মাকে গোয়ালিয়ার দুর্গে প্রেরণ করে। সাদি তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাদিগকে অশনিসম্পাতের ন্যায় আক্রমণ করে। ভয়ানক অজগরের প্রবেশে পক্ষিণী যেরূপ প্রাণপণে আপন সহচরকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, নরঘাতকের খড়্গ উত্থিত হইলে, পতিপ্রাণা দেবলা দেবী তদ্রূপ ব্যাকুল হৃদয়ে আপনার সমস্ত শক্তি ঘনীভূত করিয়া খিজির খাঁকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ছিলেন। কিন্তু হায়!

প্রেম-দীপ্ত সতী-তেজ সেই নির্ম্মম পাষাণহৃদয় নরহন্তাকে দ্রবীভূত করিতে পারিল না। তাহার অসি সঞ্চালনে দেবীর হস্তদ্বয় ছিন্ন ও বদন মণ্ডল ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল, তাহারপর খিজির খাঁর ছিন্নমুণ্ড ভূতল চুম্বন করিয়া রক্ত ধারায় পৃথিবী কলঙ্কিত করিল। রাজকুমার গণের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইবার পর পাপিষ্ঠ রাজসেনাগণ রক্তরঞ্জিতহস্তে শোকসন্তপ্ত পুরমহিলাদিগের পবিত্র রূপরাশি কলঙ্কিত করে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত না হওয়াতে তাহারা সেই মর্ম্মপীড়িত যন্ত্রণাবিদগ্ধ রমণীকুলকে তরবারি মুখে সমর্পণ করিয়া গোয়ালিয়ার দুর্গ রক্তস্রোতে প্লাবিত করে। তাঁহা-দের সেই রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়া ভীষণ গোয়ালিয়ার দুর্গ আরও ভীষণতর হইয়া উঠে।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

দেবী ও দানবী।

—০—

বঙ্গচন্দ্রের উত্তর জীবনটা রূপযৌবন সম্পন্না অঙ্কলক্ষ্মীর প্রেম-সংস্পর্শে অতি পুলকপূরিত চিত্তে অতিবাহিত হইতে লাগিলেও তাহার পরিণামে যে একটা ভীষণ দুঃখময়ফল বঙ্গচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সে কালটা বড়ই তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

বঙ্গচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত হইলেও তিনি অগাধ বিদ্যার খনি বলিয়া তাঁহার মনে যে একটা অন্তর্নিহিত আস্ফালন, হিসাব করিয়া দেখিলে সর্ব্বদা অনুভব করা যাইত, সে অনুভূতির একট দার্শনিক প্রমাণের বড়ই অসদ্ভাব ছিল। তবে তিনি যখন তিন ফিট পরিমিত সুচিক্কণ রসায়নিক অস্ত্রটী লইয়া শিশুশিক্ষার পাত উল্টাই

তেন অনেক ছেলেকেই তখন 'লিভরের' গুরুগম্ভীর ধ্বনি থামাইতে অশক্ত হইয়া অন্নপ্রাশণের অন্নজল পর্য্যন্তও ছাড়িয়া দিতে হইত।

শিক্ষকদিগের বিদ্যাবুদ্ধির লঘুত্ব গুরুত্ব লইয়া তুলনায় সমালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষক বঙ্গ রায়ের অগাধ বিদ্যা ছেলেদের বন্ধুর-পৃষ্ঠদেশের উপর লক্ষ্য করিয়াই নাহয় ঠাওরাইয়া লইলাম। যাই হউক সে সকল অবান্তর কথা ছাড়িয়া আসল কথা হউক।

(১)

সে অনেকদিনের কথা বলিতেছি—একটী শুভদিনে অতি অল্পায়াসেই বঙ্গচন্দ্র একটী বালিকার পতিত্বে বরিত হইলেন।

কল্পনাপ্রিয় বঙ্গচন্দ্র পত্নীলাভের পূর্ব্বে যে রূপকটী ভারতচন্দ্র আওড়াইয়া ঠিক করিয়া ছিলেন, যখন দেখিলেন মৃণ্ময়ীর ঘোর আবলুশ রং রঞ্জিতদেহে লোকললামভূতা হিরণ্ময়ী নায়িকার রূপলাবণ্য অসম্ভব, তখন অনর্থক সে "কে বলে শারদ শশী" রূপকের অন্ধ অনুসরণ লাভ জনক বিবেচনা করিলেন না। কালোকেই কজ্জল বলিয়া মনে করিয়া লইতে চেষ্টা দেখিলেন।

বঙ্গচন্দ্র প্রেমিক, কাজেই সরল এবং রসিক। তাই নব প্রণয়িনীর ভালবাসার একটা ওজন ঠিক করিতে অবসর গ্রহণ না করিয়াই একেবারে তাহাকে ষোল আনা রকমে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মৃণ্ময়ী প্রতিদানে ততটা মুক্তহস্ত হইতে অবকাশ পাইয়া উঠিল না। বঙ্গচন্দ্রের সরল হৃদয় তাই কতক পরিমাণে প্রতিহত হইল। বঙ্গচন্দ্র তখন বুঝিতে পারিলেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী উপকরণ লইয়া রমণী হৃদয় গঠিত হয় নাই। তাহাদের লাজ লজ্জার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে এবং থাকাই স্বাভাবিক তাই ব্যস্তবাগীশ বঙ্গ পণ্ডিত একেবারে স্ত্রীর স্ত্রীত্বেই ঘোর সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

মৃণ্ময়ীর বয়ঃক্রম তখন ত্রয়োদশ। বঙ্গচন্দ্র লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, মৃণ্ময়ী যদি কখন কাহারও নিকট কোন উপদেশ পাইয়া থাকে তবে

তাহা কেবল শাশুড়ীর প্রতি যথোচিত সম্মান, দেবরের প্রতি অমায়িকতার আতিশয্য ও গৃহকার্য্যে নিপুণতা প্রদর্শন ব্যতীত, স্বামিনামে একটা জিনিসের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে আদপেই তাহা শিক্ষালাভ করে নাই।

বঙ্গচন্দ্র আর যাহা লক্ষ্য করিলেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে কোন প্রতিবন্ধক দেখিলেন না যে মৃণ্ময়ী "বোবা"। মৃণ্ময়ীও কিন্তু সে ভ্রান্তি অপনোদনের কোন চিহ্ন দেখাইতে চেষ্টা করিলেন না। বঙ্গচন্দ্র প্রতি নিশীথে তৈলদাহ পূর্ব্বক শয্যাগৃহে মানভঞ্জন বিচিত্র বিলাসের অভিনয় করিতে লাগিলেন। ব্রীড়াবনতা বালিকা মৃণ্ময়ী নিঃশব্দে সে ভালবাসার অত্যাচারগুলি সহ্য করিতে লাগিলেন। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি মুখ ফুটিল না আমরাও জানি—

"বদন থাকিতে না পারে বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম।"

কিন্তু আমরা জানিলে কি হয়, যাহার সে বুঝিল কই?

কোলাহল প্রিয় অল্পমতি মানব-শিশুকে দমন করিতে যাইয়া, রসায়নশাস্ত্রের গুরুতর বিশ্লেষণ সাধারণ মস্তিষ্কের যোগ্য নয়, বঙ্গচন্দ্রের এই একটী প্রকাণ্ড রকমের অঘটন ঘটন পটীয়সী বিদ্যার বাহাদুরী।

কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্গচন্দ্র স্বীয় প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পরাঙ্মুখ হইয়া মৃণ্ময়ীকে কয়েকদিনের জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতে সংকল্প করিলেন। যাওয়ার দিনে নির্জ্জনগৃহে আসিয়া মৃণ্ময়ী বঙ্গচন্দ্রের পায়ে টিপ করিয়া এক প্রণাম করিয়া চারুহাসির বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে বঙ্গকে ভুলাইয়া গেল। দিবসে মৃণ্ময়ীর সহিত বঙ্গের এই প্রথম সন্দর্শন। বঙ্গের যদি ক্ষমতা থাকিত, সে ক্ষমতায় যদি লজ্জায় ছায়া স্পর্শ না করিত, তবে কি আর মৃণ্ময়ী সেদিন যাইতে পারে

২

বিদায়কালে বঙ্গ মৃণ্ময়ীকে বলিয়াছিলেন "যাইয়া চিঠি লিখিও।" আবক্ষলম্বিত অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে কোন উত্তর আসিল না বটে, তথাপি বঙ্গচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন, মৃণ্ময়ী পিত্রালয়ে গিয়াই তাহার নিকট একটা বিস্তৃত ক্ষমাপত্র লিখিয়া বিস্তর কান্নাকাটী করিবে। মৃণ্ময়ীরও যে সে ইচ্ছা না ছিল তাহা নহে, কিন্তু লজ্জা সে ক্ষেত্রে ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষ মৃণ্ময়ী ভাল করিয়া লিখিতে পড়িতেও জানিত না।

কিছুদিন দেখিয়া বঙ্গচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। অভিমানের এক সুদীর্ঘ গদ্য-পদ্যময়ী গাথা লিখিয়া মৃণ্ময়ীর নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রেরণ করিয়া বড়ই সুখী হইলেন। সুখের কারণ মৃণ্ময়ী তাহা পাঠ করিয়া মর্ম্মাহত হইবে। তারপর কত কাঁদিয়া কাটিয়া কত শত সহস্রবার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখিবে। সে চিঠি পড়িয়া বঙ্গ কত সুখী হইবেন। প্রেমিকের ইহাই রীতি। প্রেমিকা যদি প্রেমিকের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া একটী মাত্র অশ্রুও ত্যাগ করে, প্রেমিক অম্লানবদনে সে সুখের নিকট স্বর্গসুখও বলিদান করিতে কুণ্ঠিত নন্। তাই প্রেমিকের মনে প্রেমিকার অশ্রু সুখের উৎস ছুটাইয়া দেয়, প্রেমের বন্ধন দৃঢ় করে। দুঃখের বিষয় মৃণ্ময়ীর বাল্যশিক্ষার বিদ্যা বঙ্গচন্দ্রের কাদম্বরীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিল না।

মৃণ্ময়ী পত্র পাইয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল। কেহ দেখিতে না পায় এমন একটী নির্জ্জন কুঠরীতে যাইয়া পত্র খুলিল, খোলা হইল, খোলার পরেই বন্ধাবন্ধ হইল, এখন উত্তরের পালা, যথা সম্ভব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পত্র লেখা শেষ হইল। তারপর দুইদিন বস্তায় রহিল, চতুর্থ দিন তাহা বিছানার নীচে আসিল, পঞ্চম দিবসে বস্ত্রাঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও কোন ক্রমে ডাক-বাক্স প্রাপ্ত হইল না।

ষষ্ঠদিনে গোপনে তাহা ডাকঘরে গমন করিল। পত্র তখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া আসিয়া বঙ্গচন্দ্রের বৈঠকখানায় পঁহুছিল। এদিকে বঙ্গচন্দ্র উৎকণ্ঠায় সংজ্ঞা শূন্য।

কল্পনার পুঞ্জীভূত আবেগ লইয়া বঙ্গ পত্র খুলিলেন। পত্র খুলিয়া তাহার সকল আশা বর্ত্তুলাকার হইয়া গেল। ললাটে হস্ত প্রদান করিয়া বরুচিকে স্মরণ করিলেন—

"————চতুরানন
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।"

মৃণ্ময়ী লিখিয়াছে—

"শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

আপনা একানা পত্র পায়া বড়ৈ সুকি হৈলাম। ইরুপ সময় সময় লিখিয়া পত্র লিখি সুকি করিবেন। আমরা এখানে সবাই ভালই আছি। উত্তরে আপনাদের সকল সংবাদ লিকিয়া সুকি করিবেন। সময়২ পত্র লিকিবেন আমরা ভাল মঙ্গল চাই নিবেদন ইতি

সেবিকা
শ্রীমৃণ্ময়ী দাস্যা।"

৩

মৃণ্ময়ী পিত্রালয় হইতে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়া প্রকাশিত হইল। নিশীথে নিভৃতকক্ষে প্রথম সাক্ষাতেই বঙ্গচন্দ্র একটী প্রণাম পাইলেন। প্রণাম করিয়া উঠিয়া মৃণ্ময়ী দীর্ঘ অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া ব্রীড়াবনত মস্তকে একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে গৃহে আসিয়াই মৃণ্ময়ী তাহার সমস্ত ক্রোধের ভার নিরীহ প্রদীপটার উপর প্রকাশ করিত। এবার এ আংশিক পরিবর্ত্তনে বঙ্গ পণ্ডিত সুখী হইলেন সন্দেহ নাই। তিনি মৃণ্ময়ীকে কোলে টানিয়া বসাইলেন, এবং প্রীতির অপার্থিব উপহার বিনিময়ে অসঙ্কোচ হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিলেন।

মৃণ্ময়ী লজ্জাবনত মুখে তাহার বক্ষ চাপিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে বঙ্গচন্দ্র মৃণ্ময়ীকে অনেকখানি ভালবাসা দিয়া ফেলিলেন বলিয়া মনে করিলেন; কিন্তু মৃণ্ময়ী তাহাকে ততখানি দিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

প্রকাশ্যে বঙ্গচন্দ্র মৃণ্ময়ীকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন; শুনিয়া মৃণ্ময়ীর বুক ফাটিয়া গেল, চোক্ ভাসিয়া গেল, মুখও খুলিল না চোক্ও ফুটিল না।

৪

দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি প্রাখর্য্যে বঙ্গচন্দ্রের বৃদ্ধা জননী যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে পুত্রবধূর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া থাকাটাই যেন বর্ত্তমানযুগে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া যাইবার একমাত্র পন্থা বলিয়া তিনি মনে করিতে পারিয়াছেন। তাই নববধূর মুখ দর্শন করিয়া যদিও তাহা হইতে ততটা অনিষ্টাশঙ্কা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না তথাপি বধূরকর্ণে বাক্যালাপের নিষ্প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধীয় উপদেশটী ঢালিয়া দিতে দূরদর্শিনী বৃদ্ধা ভুলিয়া ছিলেন না। মৃণ্ময়ী তাই কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না। হঠাৎ কাহারও চক্ষে চোখ পড়িলে, শাশুড়ীই হউন আর দেবরই হউন, স্বয়ং বঙ্গচন্দ্রই হউন আর আটপ'রে চাকরই হউক, মৃণ্ময়ী সীমন্তের কাপড় বক্ষে টানিয়া আনিতেন।

বঙ্গচন্দ্র কিন্তু এগুলি বড়ই অসুখকর দৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি তাহার গৃহ, মাতা, ভ্রাতা ও পত্নীর উচ্চকণ্ঠে মুখরিত হউক মনে না করিলেও এমন অসঙ্গত নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা সুখদ মনে করিতেন না।

বঙ্গ চাহিতেন, মৃণ্ময়ী তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া, চক্ষু চাহিয়া, মুখ তুলিয়া, অবগুণ্ঠন সরাইয়া, দিবসে নিশিতে সমভাবে প্রেমের লীলাময়ী বাক্যচাতুরীতে তাহার হৃদয়-তন্ত্রী ধ্বনিত করিয়া দিউক।

মৃণ্ময়ী মনে মনে চাহিত, তিনি দিবসে আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়ান আড়ালে থাকিয়া দেখি। নিশীথে নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিদ্রাযান, আর আমি বসিয়া বসিয়া প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে সে প্রিয়তম মুখের দিকে চাহিয়া থাকি। মৃণ্ময়ীর অভ্যন্তরস্থ রক্তমাংস ভালবাসার প্রতি বঙ্গচন্দ্র চাহিতেন না, তাই তিনি মৃণ্ময়ীর মুখ ফুটাইতে চেষ্টা করিতেন।

একদিন বঙ্গচন্দ্র যখন তাঁহার বাঞ্ছিত বিষয়গুলির সংস্কারের জন্য বড়ই ধরিয়া বাঁধিয়া পড়িলেন, মৃণ্ময়ীর ওষ্ঠ বন্ধন সে দিন শিথিল হইয়া গেল। অতি ধীরে মৃণ্ময়ী স্বামীকে জানাইতে চেষ্টা করিলেন, দিবসে আসিতে ভয় হয়—পাছে কেহ কিছু বলে; চোখ মেলিয়া চাহিতে—লজ্জা করে; কথাবার্ত্তা বলেনা—কায়দা পায়না। বঙ্গচন্দ্র শুনিয়া অনেক আদর করিলেন, সাহস দিলেন এবং লজ্জাবন্ধনটার আর একটুক উনিশ বিশ করিতে উপদেশ দিতেও ত্রুটী করিলেন না।

বঙ্গ পণ্ডিত এতদিনে তাহার বিদ্যার পাকা রেওয়াজ ভ্রম বলিয়া বুঝিলেন। বুঝিলেন মৃণ্ময়ীই ঠিক। বঙ্গ ভালবাসিয়া এবং ভালবাসা দেখাইয়া সুখী, মৃণ্ময়ী কেবল ভাল বাসিয়াই সুখী।

৫

এইরূপে সময় চলিতে ছিল। অকস্মাৎ বঙ্গচন্দ্র বসন্তের কঠোর আক্রমণে যমালয়াভিমুখে ধাবিত হইলেন। যমলোকে তাহার ডাক পড়িল।

মৃণ্ময়ী দুইহাতে দ্বার চাপিয়া ধরিলেন। সতীর মহাযুদ্ধে যমরাজ পরাজয় স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু যাত্রা নিষ্ফল করিলেন না।

চতুর্দ্দশ দিবসের মহা আহবের পর যমরাজ নিরস্ত হইলেন। এ চতুর্দ্দশ দিবস মৃণ্ময়ী স্বামীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া লাজভয় ত্যাগ করিয়া আনত মস্তকে তাঁহার যা গুলি পরিষ্কার করিয়াছেন, স্বামীর যাতনায় নিজ যন্ত্রণা বোধ করিয়া দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

বঙ্গ তাহা দেখিতে অবকাশ পাইলেন না। পঞ্চদশ দিবসে বঙ্গ

উঠিয়া বসিলেন; তাঁহার পরিত্যক্ত রোগ ক্লান্তি ও অবসাদ লইয়া সাধ্বী সতী মৃণ্ময়ী স্বামীর পরিবর্ত্তে কালের পশ্চাত অনুসরণ করিলেন।

৬

বিপত্নীক বঙ্গচন্দ্র মৃণ্ময়ীর শোকে কতকদিন বড়ই অধীরছিলেন সত্য। কিন্তু এই পঞ্চবিংশতি বর্ষেই তাহার সব ফুরাইল; এইরূপ গোছের কোন কিছু হা-হতোস্মি তাহার পাণ্ডিত্যাভিমানী হৃদয়ে স্থান দিতে প্রস্তুত হইলেন না। ধৈর্য্যধারণ করিয়া আবার বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন।

এবার সাধিয়া ভজিয়া প্রেম করিতে হয়, এরূপ প্রেমশূন্য নিরেট বাঙ্গালকে পত্নীত্বে বরণ করিতে একটা তুমুল বাদ প্রতিবাদ উত্থাপন করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই অবধারিত রহিল। কারণ মৃণ্ময়ী সতী সাধ্বী হইলেও প্রেম-প্রপঞ্চে তাহার নিকট অনেক অত্যাচার বঙ্গচন্দ্রকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

* * * * * *

এক অতি শুভদিনে বঙ্গচন্দ্রের শুভ বিবাহ সংঘটন হইয়া গেল। অলোক সামান্যা নববধূর রূপলাবণ্যে, বিবাহ-গৃহ আলোকিত হইয়া গেল। মাতা বধূ দেখিয়া সুখী হইলেন। বঙ্গ বাবুর আনন্দ মনে ধরে না। স্ত্রী বিরাজময়ী, সুন্দরী, বিদূষী, সুচতুরা, সুপ্রেমিকা, সুকণ্ঠী ইত্যাদি ইত্যাদি। নামের সহিত পত্নীর দোষগুণের কোন পার্থক্য না থাকিতে পারে চিন্তা করিয়া বঙ্গচন্দ্র পত্নীর পৈতৃক নামটী বাতিল করিয়া তৎস্থানে "হিরণ্ময়ী"র সমাবেশ করিয়া সুখী হইলেন। হিরণ্ময়ী বাসরেই বঙ্গকে বলাইতে কুণ্ঠিত হইল না যে হিরণ্ময়ী ও মৃণ্ময়ী—আকাশ আর পাতাল।

হিরণ্ময়ী বঙ্গচন্দ্রের চিত্তবিনোদনার্থে সদা সর্ব্বদাই সে অপরূপ রূপের ডালি লইয়া তাহার বিলাস কক্ষের শোভা সংবর্দ্ধনে যত্নবতী। গৃহকার্য্য কিম্বা শাশুড়ী সেবায় তাহার লক্ষ্য অতি সামান্য।

বঙ্গ এখন সাংসারিক কাজ কর্ম্মের ততটা খবর রাখেন না। হিরণ্ময়ীর খাস দরবারে তাহার আমূল হিসাব চুকাইয়া দিয়াছেন। হিরণ্ময়ীই এখন গৃহকর্ত্রী। বঙ্গচন্দ্র অতি অল্পদিনের মধ্যেই হিরণ্ময়ীকে তাহার একজন অতি সুদক্ষ মন্ত্রী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। হিরণ্ময়ীও সর্ব্বতোভাবে বঙ্গচন্দ্রের কল্যাণ কামনা করিতে ত্রুটী দর্শাইতেছে না।

শাশুড়ী, দেবর ও জা-এর খরচ লাঘবের পক্ষে তাহার দৃষ্টি যতদূর প্রখরা, নিজ অতিরিক্ত বিলাস বাসনার সম্যক পরিতুষ্টির ব্যয় বাহুল্যের দিকে আবার ততদূর উদাসীন। এবিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যদিও তরুণী-জনোচিত নাতিউচ্চ, নাতিমধ্যম নিক্কণে প্রতিবেশী-দিগকে লক্ষ্য করিয়া দেবর ও জা'কে শুনাইতে ছাড়িত না যে তাহার পকেট খরচের একটা বিশেষ বরাদ্দ তাহার বাবা তাহার জন্য বাঁধিয়া দিয়াছেন, তথাপি পূর্ণচন্দ্রের সন্দিহান চিত্তে সে কৈফিয়ৎটা ততদূর কার্য্যকারী হইতে পারিল না। সেজন্য তিনি কয়েক মাস দেখিয়া শুনিয়া নিজ মোসাহারার টাকাটা বধূ ঠাকুরাণীর করকমলে আনিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাটা উঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে সে নালিশ বঙ্গচন্দ্রের কাণে উঠিল। তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। এইরূপ খুটিনাটী ঘটনায় কয়েক দিন চলিতে লাগিল।

৭

হিরণ্ময়ীর লাজলজ্জা পরিমাণ অতিক্রম করিয়া উপযুক্ত তদ্বিরের অভাবে বহুপূর্ব্বেই নির্ব্বাসিত হইয়া ছিল। স্বামী স্কুলে চলিয়া গেলে হিরণ্ময়ী আপন লাবণ্য উচ্ছলিত শশাঙ্কলাঞ্ছিত রূপরাশি লইয়া পথি-পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত কক্ষ বাতায়নে দণ্ডায়মান হইত এবং কৌমুদীদীপ্ত বিলোল কটাক্ষে আফিস ও কলেজগমনোন্মুখ টেরাকাটা বাবুদিগকে দেখিত এবং স্বীয় অপরূপ রূপযৌবনপুষ্পিত মাধুরীমহিমা দেখাইতে ভাল বাসিত। বাবুদের যাহারা সে জ্বলন্ত অনল দেখিত হঠাৎ থামিয়া

পতঙ্গ জন্মের অশেষ ধন্যবাদ দিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার আশু প্রত্যাশা না দেখিয়া মনের ব্যথা মনে লুকাইয়া আপন মনে চলিয়া যাইত। হিরণ্ময়ী তাহাতে অপরিমিত সুখ অনুভব করিত। চাকর বাকরগুলি তাহার একার্য্যে ছোট খাট রকমের মিষ্ট ঠাট্টা করিত, বালিকা জা দেখিয়া লজ্জায় সরিয়া যাইত, শাশুড়ীর চক্ষে তাহা অসহ্য হইত, কিন্তু বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে কিছু বলিতে সাহসী হইতেন না।

বৃদ্ধা পুত্রবধূর এই অতিরিক্ত স্বাধীনতার কথা বড় পুত্রের নিকট না তুলিয়া ছোট পুত্র পূর্ণের নিকট তুলিতে আপত্তি দেখিলেন না। পূর্ণ আফিসের কোন বন্ধুর নিকটও এইরূপ একটুক আভাস পাইয়া ছিলেন, তাই হিরণ্ময়ীর স্বাধীনতার একটুক কড়া সমালোচনা করিয়া বড়ই শক্ত কথা শুনাইয়া দিলেন। এত শক্ত কথা হিরণ্ময়ীকে কেহ কখন বলে নাই।

যথাসময়ে ঝড় আসিল, ছানি উড়াইল, খুটী নাড়িল, ঘন গর্জ্জন অনুভূত হইল, মুষলধারে বারিপাতও হইয়া গেল। বঙ্গের বুক ফাটিল, মুখ ফুটিল না।

৮

আপদ বালাই গিয়াছে, এখন আর হিরণ্ময়ীর উপরে কে? শাশুড়ীর মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী নিশ্চিন্ত মনে ১১টা হইতে ৩॥ টা পর্য্যন্ত পাড়া বেড়াইতে বাহির হইত। কে কি বলিবে? বঙ্গচন্দ্র তাহা জানিতে পারিতেন না। সে অতিরিক্ত কার্য্যের জন্য তাহাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। দিন এমন ভাবেই চলিতে লাগিল।

একদিন হঠাৎ একটা চিঠির গোলমালে হিরণ্ময়ীর প্রতি পূর্ণচন্দ্র সন্দিহান হইলেন, স্বীয় স্ত্রীর নিকট হইতেও তাহার অজ্ঞাত বাসের অনেকটা অনুসন্ধান লইলেন। তারপর বঙ্গকে প্রকারান্তরে জানাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না যে "হিরণ্ময়ীর উচ্ছৃঙ্খলতাদির জন্য একটু বিশেষ

দৃষ্টি সম্প্রতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।" পূর্ণের এ ধৃষ্টতা জানিতে হিরণ্ময়ীর ৫ মিনিটের বেশী সময় লাগিল না।

হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া কাটিয়া নিজ ক্যাসবাক্স হইতে ৫০০ টাকার নোট খুলিয়া বঙ্গচন্দ্রের পদতলে রাখিল এবং সকরুণ স্বরে বলিল "এই নেও তোমাদের বেসাত—আমার কলঙ্ক, ভাইকে ভাগ করে দিয়ে সুখে থাক। আমাকে কলঙ্কিণী বলিতে হয় বল। দশবছর তোমার সংসার নাড়িয়া যাহা করিয়া ছিলাম, তাহা লইয়া যাও। এরজন্য এত কথা!" হিরণ্ময়ীর সে সকরুণ মিষ্টস্বরে বঙ্গ পণ্ডিত মুগ্ধ হইলেন, পূর্ণের ধৃষ্টতা স্মরণ করিয়া মধুর সম্মোহন অস্ত্রগুলির আপেক্ষিক গুরুত্বের ব্যবহার করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর যাহা হইবার হইয়া গেল।

৯

অনেক চেষ্টা করিয়াও যে ব্যাধি বঙ্গের দেহ-মন্দির ধ্বংস করিতে মায়া করিতেছিল; সেই বহু মূত্রের মাত্রা হঠাৎ এত বৃদ্ধি হইয়া গেল যে বঙ্গচন্দ্র একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। হিরণ্ময়ীর সৌহৃদ্যে তাহার প্রবল বিশ্বাস; তাই রোগশয্যায়ও কতকটা সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুখও নিবিয়া গেল।

রোগ যখন প্রবল হইয়া উঠিল, হঠাৎ একদিন হিরণ্ময়ী শয্যা শায়িনী হইলেন। রোগ আমাশয়, "হাতে ঘটী" অবস্থাতেই থাকেন। রাত্রেই অধিক। তাতেও বিরাম নাই, দিবসে বঙ্গের অনেকটা তত্ত্ব খবর করিয়া থাকেন। রাত্রিতেও যতক্ষণ পারেন অকুণ্ঠিত চিত্তে সেবা শুশ্রূষা করিতে ছাড়েন না। হঠাৎ নিজের পীড়া পাইলে ঘটী হাতে বাহির হন! কোন দিবস ঘরে আসেন কোন দিবস বা আসিতেও পারেন না। দেখিবে কে?

একদিন হঠাৎ হিরণ্ময়ীর চিত্ত-চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। চতুর্দ্দশীর সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া হিরণ্ময়ী ঘটী হস্তে বাহির হইলেন। বঙ্গচন্দ্র অনেক কষ্ট অনুভব করিলেন। উৎসুক দৃষ্টিতে দরজার প্রতি

চাহিয়া রহিলেন। ভয়নাই! তাহার অভয় বাণীতে তিনি নিজেই আশ্ব
হইলেন। ধীরে ধীরে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

পরদিন সকলে জানিল হিরণ্ময়ী প্রাচীরসংলগ্ন গৃহের, নীরো
বাবুর সহিত অদৃশ্য হইয়াছে। বঙ্গচন্দ্রের শয্যা পার্শ্বে যখন এক
পহুছিল, বঙ্গ চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তারপ
যখন সংজ্ঞা হইল, বিংশতি বৎসরের বিগত স্মৃতি যেন তাহার ম
জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যেন সেই শঙ্কিত, সলজ্জ
অবগুণ্ঠণবতী-দেবী তাহার পদতলে বসিয়া ক্লান্তির অবসাদগু
ঢাকিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। পার্শ্বে বসিয়া পূর্ণচন্দ্র অশ্রুসি
নয়নে বলিল—"দাদা আমরা থাকিতে তোমার ভয় কি?"

বেদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যোগদর্শনের প্রভাবে ঋষিগণ অপূর্ব্বদ্রষ্টা, তাই তাঁহারা ম
দর্শন করিয়াছেন। এই দর্শনক্রিয়া সম্বন্ধেও আবার সময় সময় মতদ্বৈ
উপস্থিত হইয়া থাকে। জ্ঞানবিশ্বাসের অল্পাধিক্য ও তারতম্যবশত
এই মতভেদের যুক্তি কারণও নানারূপে আলোচিত ও বিন্যস্ত হইয়া থাকে
একদল বলেন, ঋষিগণ বাহ্যনয়ন বা চর্ম্মচক্ষুদ্বারা জ্বলদক্ষরে লিখি
বেদমন্ত্র সকল দর্শন করিয়া বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাদের উচ্চার
করিয়াছেন। অপরদলের মতে মানসনয়ন বা দিব্যদর্শনেন্দ্রিয়েরদ্বা
যোগনিরত ঋষিগণ বেদমন্ত্র অদ্ভুতভাবে বিলোকন করিয়া রসন
রসনা-সংযোগে উচ্চারণ করিয়া নিজের ও অপরের শ্রুতিগোচ
করিয়া দিয়াছেন। প্রথম দলের মতানুযায়ী যুক্তি অনুসারে বা
জগতের ব্যাপারসম্পৃক্ত জড় পদার্থের মধ্যে অনলময়ী অক্ষরশ্রেণী
দ্বারা উজ্জ্বলরূপে বেদমন্ত্র সকল প্রতিভাত হওয়ার বিষয় শুনিতে পাও

যায়। অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন, অসীমতেজঃপুঞ্জ পরমপুরুষ করুণা করিয়া
তদ্গতচিত্ত ও তদ্ভাবাপন্ন ভক্তের সম্মুখে বিদ্যুন্ময়ী বর্ণশ্রেণীতে তাহার
মানসিক অভাব দূর বা অন্তর্ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশে অপরূপ
মন্ত্রাবলী সজ্জিত করিয়া রাখিবেন, এবিষয়ে কিছুই বিস্ময়ের ভাব নাই।
বিশ্বাসী ভক্ত এভাবে অবিশ্বাসও করেন না। অভীষ্টদেবের স্তুতিও উপা-
সনা উপলক্ষে মন্ত্র বিকাশ স্বাভাবিক কার্য্য। যখন অঘটনঘটনপটীয়সী
মায়াশক্তি স্বকীয় প্রভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল
সংসাধন করিয়া আমাদের আনন্দ, বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করিয়া
দিতেছে, তখন প্রকৃতিপর পরমপুরুষের শক্তিসামর্থ্যের নিকট অঘটনীয়
বা অসম্ভব কি থাকিতে পারে? যাহাই হউক এমতের প্রধান লক্ষ্য
জড়জগতের বাহ্যব্যাপার লইয়া। এক্ষণে অপরমতপোষক যুক্তিতত্ত্বের
অনুসরণ করা যাউক। যাঁহারা মানসনয়নে, দিব্যদর্শনে বেদমন্ত্রের
দ্রষ্টা বলিয়া ঋষিগণকে জানেন, মানেন ও বিশ্বাস করেন, তাঁহারা
অসীম শক্তিপ্রসারময় আধ্যাত্মিকতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, অসম্ভব কার্য্যসাধক
যোগতত্ত্বে বিশ্বাসবান্, এবং রহস্যময় অন্তস্তত্ত্বের পূর্ণপ্রবাহে প্রতি-
নিয়ত ভাসমান। ইহাঁদের মত বলীয়ান্ মহীয়ান্ বা গরীয়ান্ ব্যক্তি
জগতে দুর্লভ। বিশ্বাস ভক্তি বলে ইহাঁদের নিকট অকরণীয়, অঘটনীয়
অদর্শনীয়, অশ্রবণীয় বা অভাবনীয় কিছুই নাই। তাঁহাদের মত অদ্ভুত
দর্শনশীল লোক কোথায়? ভগবান্ মনু বলেন—

ঋষয়ঃ সংযতাত্মানঃ ফলমূলানিলাশিনঃ।
তপসৈব প্রপশ্যন্তি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ২৩৭। ১১
যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চদুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্॥ ২৩৮। ১১

অর্থাৎ সংযতাত্মা, ফলমূলবায়ুভোজী ঋষিগণ তপোবলে স্থাবর-
জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকের সমস্তই পরিদর্শন করেন।

যাহা দুস্তর, দুষ্প্রাপ্য, দুর্গম ও দুষ্কর তাহা সমস্তই তপস্যাদ্বারা

সাধ্য (সম্ভব)। কারণ তপস্যাকে অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। তপোবলে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য বিষয়ও সুখসাধ্য ও সুসাধ্য হইয়া থাকে।

এই সংযতাত্মা যোগসাধক ভক্তগণই যোগসমাধিতে নিরত হইয়া মানসনয়নের দিব্যদর্শনে দিব্যরূপে দিব্যমন্ত্র বিলোকন করিয়া তাহাই রসনাযোগে বাক্যবিন্যাসে উচ্চারণশক্তি সাহায্যে বাহিরে আনিয়াছেন। এই যে মানসনয়নের দিব্যদর্শন এইটী একটু বুঝিবার কথা ও ভাবিবার বিষয়, বলিতে কি এইটীই আবার বড় গোলের কথা। বিশেষতঃ অধুনাতন জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে স্থূলজ্ঞান ও বাহ্যব্যাপার পরিদর্শনের জন্য যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে, তাহার প্রাবল্যে আধ্যাত্মিক জগতের অন্তস্তত্ত্বের কোন বিষয় সহজে উপলব্ধি হয় না। বাহিরে বাহিরে সকল কথা বেশ বলিতে ও শুনিতে পারি, বাহিরে বাহিরে বাহ্যব্যাপার লক্ষ্য করিয়া সকল বিষয় বেশ বুঝিতে ও বুঝাইতে পারি, কিন্তু ভিতরের কথা বলিতে শুনিতে, আভ্যন্তরীণ বিষয় সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে বা বুঝাইতে গেলেই মাথা ঘুরিয়া উঠে। তখন সন্দেহসন্দোহ স্বতঃই প্রবলরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম। এইটী বড় গোলের কথা। দেখা যাউক মানসনয়নে দিব্যদর্শনের কথা বলিলে কি বুঝা যায়। যদি ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা যে সময়ে ঈশ্বরাদিষ্ট, ঈশ্বর-প্রেমাবিষ্ট, ঈশ্বরানুজ্ঞাত, ঈশ্বরগতচিত্ত, ঈশ্বরানুপ্রাণিত এবং ঈশ্বরভাব-ভাবিত হইয়া যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, সেই সময়োচ্চারিত সেই সকল মন্ত্রকে অপৌরুষেয় বেদমন্ত্র বলিতে কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না, কেননা সেই সমুদায় মন্ত্র কোন পুরুষ বিশেষের উচ্চারিত সাময়িক ও আবশ্যকীয় উক্তি বা প্রার্থনা নহে।

এখন মানসনয়নে দিব্যদর্শনের বিষয় একটু আলোচনা করা আবশ্যক। পাঠকগণ দেখিয়াছেন আমরা প্রবন্ধ মধ্যে সংস্কৃত বচন প্রমাণ, উদ্ধার করিতে যথাসাধ্য বিরত ও নিবৃত্ত রহিয়াছি। কোন

বিশিষ্টমত সংস্থাপনের জন্য আমরা প্রয়াসী বা অভিলাষী হই নাই। সত্যকথা বলিতে, সত্যতত্ত্ব আলোচনা করিতে আমরা যত্নবান্ হইয়াছি মাত্র। প্রবন্ধলিখিত কথাগুলির মধ্যে আমাদের নিজের কথা অতি অল্পই আছে। সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সেই পুরাতন কথাগুলিই আমরা আমাদের নূতন ভাষাসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছি মাত্র। তাহাও হয়ত সূতার দৃঢ়তার অভাবে ভাল গাঁথা হয় নাই এবং কোন কোন স্থানে হয় ত কথার মাঝে মাঝে কেবল সূতাই দেখা যাইতে পারে। যাহা হউক পক্ষপাতশূন্য, তথ্যজিজ্ঞাসু সুদূরদর্শী; সহৃদয় পাঠকগণ সূতা ত্যাগ করিয়া কথা ও কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এই আমাদের প্রার্থনা।

এখন ২। ৪টী শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া তাহার অনুমোদিত যুক্তি প্রদর্শন ও মত সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দিব্যদর্শনের কথা তাহাতেই বিশদরূপে বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা।

নিম্নে যে বেদ মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইল, তাহা প্রায়শঃ সর্ব্বজনবিদিত ও নিত্য ব্যবহৃত।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর (সূর্য্যের) ন্যায় পণ্ডিতগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদ নিয়ত দর্শন করেন।

সূরী, কবি, বিপ্র, পণ্ডিত, যোগী প্রভৃতি শব্দগুলি ঋষিশব্দের সমার্থক বলিয়াই বেদমধ্যে বহুস্থলে ব্যবহৃত। এখন বুঝিয়া দেখা উচিত সূরীগণ যে বিষ্ণুর পরমপদ সতত দর্শন করেন, এইটী কিসের দ্বারা। পদটী জ্যোতির্ম্ময় ও স্বপ্রকাশ, কারণ গগণ বিস্তৃত বিভাময় সূর্য্যই তাহার উপমান। তেজঃপূর্ণ স্বপ্রকাশ পরমপদের নিয়ত পরিদর্শন চর্ম্মচক্ষুর কর্ম্ম নয়। শ্রুতির কথা শুনিলেন, এখন বেদ-বিভাগ কর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাসের কথা শুনুন।

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বৈদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ—১৩শ অধ্যায়।

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বরুণ ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্গণ যাঁহাকে দিব্য স্তবেরদ্বারা স্তুতি করিয়া থাকেন, সামগায়কগণ অঙ্গপদক্রম ও উপনিষদের সহিত বৈদিক মন্ত্রদ্বারা যাঁহার গান করিয়া থাকেন, ধ্যাননিরত তদ্গত চিত্তেরদ্বারা যোগিগণ যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানিতে সমর্থ নহেন সেই পরমদেবকে নমস্কার। সুচতুর পাঠকগণ উদ্ধৃত শ্লোকটীর প্রতি একটু মনোযোগ করিলেই তাহার বিশেষত্ব পরিলক্ষ্য করিতে পারিবেন। "ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি" ধ্যাননিমগ্ন, যোগিগণ, ধ্যানরত মানসনয়নের দ্বারাই দর্শন করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টিই দিব্যদৃষ্টি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এ দৃষ্টিলাভ বড় সহজ ব্যাপার নহে। দীক্ষিত উপাসক মাত্রেই রক্তমাংসময়দেহধারী ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলেন;—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখণ্ড বিশ্বমণ্ডল যাঁহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত, সেই পরমপদ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম। এখানেও লক্ষ্য করা আবশ্যক, যে অখণ্ড মণ্ডলব্যাপ্ত ব্রহ্মের পরম পদ এ চর্ম্মচক্ষুর গোচর নহে। তাহা দর্শন করিতে হইলে দিব্যদর্শনের আবশ্যক। সেই দিব্যদৃষ্টি গুরুদেবের উপদেশ, আদেশ, ততোধিক তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদ সাপেক্ষ, এই জন্যই তাঁহার নিকট দিব্য-দর্শন প্রার্থনীয়।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন।

শরত সুবর্ণ সন্ধ্যা—সুনীল আকাশ,
মিশিয়া সে নীলে লালে, চোখে, মুখে, বুকে, গালে
একটী বালিকা মূর্ত্তি পাইল প্রকাশ!
কি সে রূপ নীল সোনা, দেখা থাক্ নাহি শোনা
সোনালী নয়ন কোণা কমল পলাশ!
দেবতা মথিয়া সদা, তুলেছে অমৃত মদা,
অধরে ভাসিছে তার মধুর সে হাস!
কি "সুধা-ষোড়শী" বালা, যৌবনের জয়মালা,
উরসে অমৃত জ্বালা বসন্ত উচ্ছ্বাস!
শরত সুবর্ণ সন্ধ্যা, সুনীল আকাশ।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে নিকট আসিয়া
জগৎ করিয়া শূন্য, যেন সে অমৃত পুণ্য,
আমি পাপী—আমায় সে করুণায় দিয়া
কহিল সে কত কথা, বসন্ত কোকিল যথা
করে মত্ত নীলাকাশ গাইয়া গাইয়া

* * * * *

ছুটিয়া আসিনু নীচে, তুমি এলে পিছে পিছে,
নহে সে স্বপন মিছে দেখিনু চাহিয়া!
তুমিইত সে বালিকা, শশীর অমৃত শিখা
হাসিলে মাটীর বুকে করুণা করিয়া
পাপ তাপ শোক ভরা বাঁচালে জীবিত মরা
অমিয়া নিশ্বাসে দুটী কথা শুনাইয়া।

সারা রাত ছট্ ফট ঘুম নাহি হয়,
এ পাশে ও পাশে খুজি, মনে ভাবি এলে বুঝি,
তুমি যে করুণাময়ী—নহত নিদয়!
তোমারে পাইব আশে, প্রাণ কি আনন্দে ভাসে
হৃদয় খুলিয়া রাখি যদি দয়া হয়,
এত দেবী এক রাতি, নিত্য রাখি প্রাণ পাতি,
এ সাধনা আত্মঘাতী প্রাণে কত সয়?
তোমারে পূজিবে ভক্ত, প্রদানি হৃদয় রক্ত,
দেও বুকে একবার ও পদ অভয়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

আলোকের দেশ।

অনন্ত চৈতন্যময় আলোকের দেশ!
চিন্ময়ী প্রকৃতি তথা, চিন্ময় তরুলতা,
চিন্ময় ঘরবাড়ী, চিন্ময় বেশ
সেত আঁধারের নয়, আলোকের দেশ,

সুখে আছে সেইলোকে "আপনার যারা",
আবার প্রাণের টানে, মিলিব তাদের সনে,
স্মরণে পরাণে বহে অমৃতের ধারা!
সুখে আছে সেইলোকে "আপনার যারা"!

"মাখনের" ফুল্ল মুখ ফুটেছে তথায়,
"প্রভার" মধুর বাণী, আজিও শ্রবণে শুনি,
"খোকার" অমৃত কণ্ঠে প্রাণ ভেসে যায়!
বেঁচে আছি জীর্ণ দেহে তাদের আশায়!

কে বলে হবেনা দেখা? তারা নাই সেথা?
প্রাণের প্রেমের টান, মিছা কল্পনার গান?
সবকলি ধূলির সাথে পড়ে রবে হেথা?
আরকি হবেনা দেখা? তারা নাই সেথা?

আমার প্রাণের কথা শুনিবে তোমরা?
নিতি নিতি তারা আসে, মধুর মধুর ভাষে,
দূরে থেকে কথা কয় জ্যোতির্ম্ময় বেশে,
আনন্দে বিহরে তারা আলোকের দেশে।

সংসারের হাসি, কান্না, তৃষা ভালবাসা,
তোমায় লাগেনা ভাল, তাই বুঝি ছাড়ি আলো
করিতেছ অন্ধকারে, নির্ব্বাণের আশা!
ভাবিয়াছ, মিটিবেনা প্রাণের পিয়াসা?

কিন্তু ভাই, মানবের এইত জীবন;
সুখ দুঃখ, তৃপ্তি তৃষা, বীতরাগ, ভালবাস
নিয়ত কর্ম্মের পথে উত্থান পতন;
অতৃপ্ত বাসনা ময় অনন্ত জীবন!

চলেনা যে দিন আর, তাও সত্য বটে,
জীবন সংগ্রামে হায়, শোণিতে প্লাবিত ক
ঝলকে ঝলকে আহা, মুখে রক্ত উঠে!
হাহাকার করে প্রাণ, সংসার সঙ্কটে!

আবার আবার দেখ, মধুর মধুর,
প্রেম-নদী কূল কূল, পরাণ করি আকুল,
বহিছে ঢালিছে আহা অমৃত প্রচুর!
আনন্দ হিল্লোল বহে মধুর মধুর!

উঠিছে লীলার ঢেউ, ছুটিছে লহরী,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে, চল আলোকের দেশে,
চল ভাই ভয় নাই, বল হরি হরি,
উঠিছে লীলার ঢেউ ছুটিছে লহরী!

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

—০—

প্রভাত মঙ্গল।

গাহিয়া উঠিতে প্রভাতী রাগিণী
পাখীটী;
ঊষার অধরে দেখাদিল হাসি,
ফুটে উঠে হাসে কুসুমের রাশি,
লতাবধূ সহ ঢালে পাশাপাশি—
নীহার মুকুতা শাখিটী!
ডুবে গেল ধীরে প্রভাতিয়া তারা,
যেন দেবতার আঁখিটী।

ছুটিছে পবন, লুঠি ফুল-বন—
সুরভি!
মধুর পরশে জাগিল ধরণী,
জাগে দিক্ বধূ হিরণ-বরণী,
ছুটিল নবীন জীবন তরণী—
গাহিয়া সাধের পূরবী!
ছুটিছে পবন, লুঠি ফুল-বন
সুরভি!

জাগে, প্রাক্‌ভাগে নব অনুরাগে
সবিতা;
ছুটে আলো রেখা তিমিরের তীরে,
ফুটে কমলিনী সুখ সরোনীরে,
জুটে ভাবুকের হৃদয় কুটীরে—
স্নিগ্ধ সরস কবিতা!
জাগে, প্রাক্‌ভাগে নব অনুরাগে
সবিতা।

দলে দলে অই জাগিয়া কুমারী
বালিকা;
তুলিয়া যতনে নানা জাতি ফুল,
কেহ কারো কাণে দুলাইছে দুল,
কেহবা গাঁথিছে বাঁধুলী, বকুল,
কেহবা মালতী মালিকা!
তরু আলবালে ঢালে বারি ধারা
যতনে কানন পালিকা

আরতি বাজনা বাজিছে দেবতা
ভবনে।
কোথা হ'তে যেন কল কোলাহল
নামিয়া এসেছে,—চির নির্ম্মল;
বিশ্ব করিতে শান্ত, শীতল,
চড়িয়া প্রভাত পবনে
করিছে হিন্দু প্রাত-উপাসনা।
পড়িছে নমাজ যবনে।

নিয়ে যায় ধেনু, বাজাইয়া বেনু,
রাখালে।
ছেথা কৃষকেরা চলে যায় মাঠে,
জনপদ-বধূ বন-ময় বাটে
চলিয়াছে দূর তটিনীর ঘাটে—
কলসী লইয়া, কাঁকালে।
শান্ত সরল বালকের দল
বসিয়া বদন পাখালে।

হের, যায় দেখ, আলোকের রেখা
গগনে।
ঊষা ধীরে ধীরে হেসে চ'লে যায়,—
মিশাইয়া দূর-নভ-নীলিমায়,
কিরণ বালিকা ছুটিয়া খেলায়—
উচ্চ অচল জঘনে।
হাসি ভরা মুখে জাগিল জগৎ,
হেন সুখময় লগণে।

জাগোলো সজনি! আসিয়াছে আলো
কুটীরে।
আঁধার রজনী হলো অবসান,
আরকত কাল রহিবে শয়ান?
গাহিব তাঁহারি মধুময় গান—
মিলিয়া আমরা দুটি রে!
এস, দোঁহে মিলে আকুল হৃদয়ে—
তাঁহারি আদেশে ছুটি রে!

১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩০৭। ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকগণ—

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত [illegible]াদাস রায়, শ্রীযুক্ত মনোমে[illegible] শ্রীযুক্ত নীলাম্বর গুপ্ত বি, এ, [illegible] সেন ও সম্পাদক।

সূচীপত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা		বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	রায় অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর [illegible]		৫।	বর্ণসঙ্কর	১১৭
২।	বারমাস্যা	১০৭	৬।	অষ্টমূর্ত্তি	১২১
৩।	যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল	১০	৭।	আলোচনা	১২৮
৪।	যৌতুক (কবিতা)	১১	৮।	আবাহন (কবিতা)	১৩৩

ময়মনসিংহ বাসন্তী যন্ত্রে—শ্রী[illegible]মচন্দ্র অনন্তদ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা ৵০ তিন আনা।

আবার আবার দেখ, মধুর মধুর,
প্রেম-নদী কূল কূল, পরাণ করি আকুল,
বহিছে ঢালিছে আশা অমৃত প্রচুর!
আনন্দ হিল্লোল বহে মধুর মধুর!

উঠিছে লীলার ঢেউ, ছুটিছে লহরী,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে, চল আলোকের দেশে,
চল ভাই ভয় নাই, বল হরি হরি,
উঠিছে লীলার ঢেউ ছুটিছে লহরী!

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

—০—

প্রভাত মঙ্গল।

গাহিয়া উঠিতে প্রভাতী রাগিণী
পাখীটী;
ঈষার অধরে দেখাদিল হাসি,
ফুটে উঠে হাসে কুসুমের রাশি,
লতাবধূ সহ ঢালে পাশাপাশি—
নীহার মুকুতা শাখিটী!
ডুবে গেল ধীরে প্রভাতিয়া তারা,
যেন দেবতার আঁখিটী।

ছুটিছে পবন, লুঠি ফুল-বন—
সুরভি!
মধুর পরশে জাগিল ধরণী,
জাগে দিক্ বধূ হিরণ-বরণী,
ছুটিল নবীন জীবন তরণী—
গাহিয়া সাধের পূরবী!
ছুটিছে পবন, লুঠি ফুল-বন
সুরভি!

জাগে, প্রাক্‌ভাগে নব অনুরাগে
সবিতা;
ছুটে আলো রেখা তিমিরের তীরে,
ফুটে কমলিনী সুখ সরোনীরে,
জুটে ভাবুকের হৃদয় কুটীরে—
স্নিগ্ধ সরস কবিতা!
জাগে, প্রাক্‌ভাগে নব অনুরাগে
সবিতা।

দলে দলে অই জাগিয়া কুমারী
বালিকা;
তুলিয়া যতনে নানা জাতি ফুল,
কেহ কারো কাণে দুলাইছে দুল,
কেহবা গাঁথিছে বাঁধুলী, বকুল,
কেহবা মালতী মালিকা।
তরু আলবালে ঢালে বারি ধারা
যতনে কানন পালিকা

আরতি বাজনা বাজিছে দেবতা
ভবনে।
কোথা হ'তে যেন কল কোলাহল
নামিয়া এসেছে,—চির নির্ম্মল;
বিশ্ব করিতে শান্ত, শীতল,
চড়িয়া প্রভাত পবনে
করিছে হিন্দু প্রাত-উপাসনা।
পড়িছে নমাজ যবনে।

নিয়ে যায় ধেনু, বাজাইয়া বেনু,
রাখালে।
দেখা কৃষকেরা চলে যায় মাঠে,
জনপদ-বধূ বন-ময় বাটে
চলিয়াছে দূর তটিনীর ঘাটে—
কলসী লইয়া, কাঁকালে।
শান্ত সরল বালকের দল
বসিয়া বদন পাখালে।

হের, যায় দেখা, আলোকের রেখা
গগনে।
ঊষা ধীরে ধীরে হেসে চ'লে যায়,—
মিশাইয়া দূর-নভ-নীলিমায়,
কিরণ বালিকা ছুটিয়া খেলায়—
উচ্চ অচল জঘনে।
হাসি ভরা মুখে জাগিল জগৎ,
হেন সুখময় লগনে।

জাগোলো সজনি! আসিয়াছে আলো
কুটীরে।
আঁধার রজনী হলো অবসান,
আরকত কাল রহিবে শয়ান?
গাহিব তাঁহারি মধুময় গান—
মিলিয়া আমরা ছুটি রে!
এস, দোঁহে মিলে আকুল হৃদয়ে—
তাঁহারি আদেশে ছুটি রে!

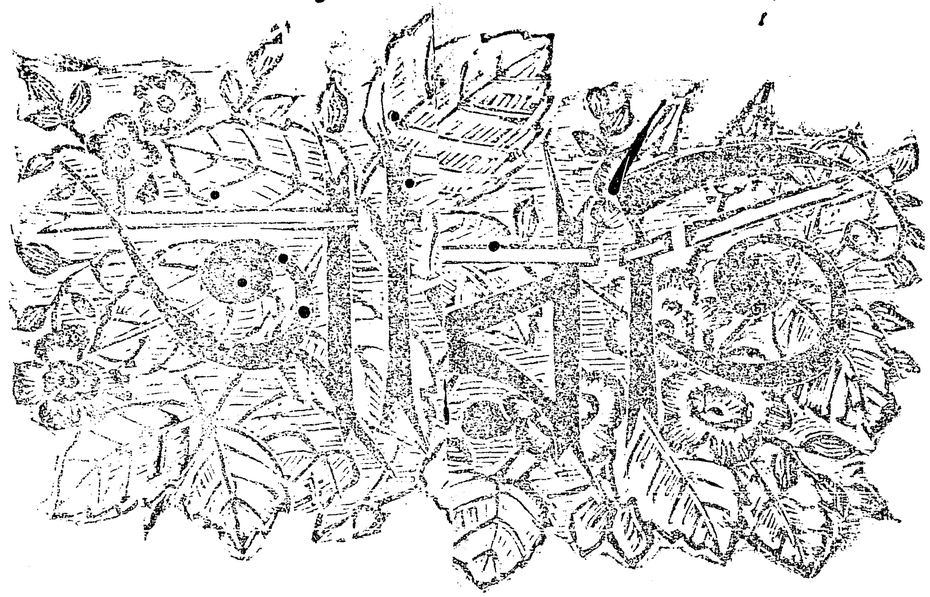

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকগণ—

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত [illegible] গাদাস রায়, শ্রীযুক্ত নীলাম্বর গুপ্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত মনোমো[illegible] সেন ও সম্পাদক।

সূচী পত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা		বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	রায় অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর [illegible]		৫।	বর্ণসঙ্কর	১১৭
২।	বারমাস্যা	১০৭	৬।	অষ্টমূর্ত্তি	১২১
৩।	যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল	১০৫	৭।	আলোচনা	১২৮
৪।	যৌতুক (কবিতা)	১১৫	৮।	আবাহন (কবিতা)	১৩৩

ময়মনসিংহ বাসন্তী যন্ত্রে—শ্রী[illegible]রামচন্দ্র অনন্ত দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা ৵০ তিন আনা।

রায় অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর। (১)

(প্রথম প্রস্তাব।)

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সফৎগঞ্জ থানার অধীন বুন্নাগ্রামে কর্ম্মবীর অভয়চন্দ্র দাসের জন্ম হয়। এই গ্রাম এক্ষণে লোনসিংহ নামে ফরিদপুর জিলায় দক্ষিণ বিক্রমপুর পরগণায় অবস্থিত। বিক্রমপুর পরগণার মধ্যদিয়া পদ্মানদী কীর্ত্তিনাশা নামে প্রবাহিত হইয়া, বিক্রমপুরকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ঢাকা জিলার মধ্যে যত পরগণা আছে, তন্মধ্যে বিক্রমপুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের উত্তর সীমায় ধলেশ্বরী (ধলেশ্বরী) ও ইছামতী, পূর্ব্ব সীমায় মেঘনাদ (মেঘনা), দক্ষিণ সীমায় ইদিলপুর, এবং পশ্চিম সীমায় ফরিদপুর জেলা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিক্রমপুরে প্রায় ৮০০ গ্রাম আছে। তন্মধ্যে উত্তরভাগে অন্যূন ৫০০ এবং দক্ষিণভাগে ৩০০ গ্রাম অবস্থিত। জেলা পাবনার পশ্চিম হইতে গঙ্গানদী পদ্মানামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কাঁচাদিয়া গ্রামের পূর্ব্বে এবং লৌহজঙ্গ গ্রামের দক্ষিণদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া, পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়াছে। বহর, বড়পেটা, নওগাঁ প্রভৃতি গ্রামের নিম্নভাগে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, কীর্ত্তিনাশা মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রাজনগরের উত্তরভাগে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইত। এই রাজনগরে মহারাজ রাজবল্লভ সেন বাস করিতেন। ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

এই ক্ষুদ্র নদী একদিন বর্ষাকালে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া তটভূমি আপ্লাবিত করে। নৈসর্গিক কারণে আইড়ল খাঁর ও ব্রহ্মপুত্রের বেগ হ্রাস হইয়া যায়। এই ক্ষুদ্র নদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই নদী ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া তেত্রিশখান গ্রাম আত্মসাৎ করে। কালক্রমে রাজা রাজবল্লভ সেনের

নিবেদন—

কার্য্যাধ্যক্ষের

মাসাধিক কাল প্রেসের কা
ফর্ম্মা একবারে দিতে পারা গেল না
রহিয়া গেল। অবশিষ্ট ৩ ফর্ম্মা ক্রমে

যাঁহারা এই সংখ্যা ভিঃ পিঃ
তাঁহাদের "আরভি" ভিঃ পিঃ তেই
মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগের
অনুগ্রহ করিয়া এই সময় মূল্য প্রেরণ
করুন।

বঙ্গের অদ্বিতীয় ভ্র
শ্রীযুক্ত জলধর

হিমালয়।

পাঁচ সিকা।

প্রকাশিত

কবিবর শ্রীযুক্ত গো
প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—২
স্থানীয় গ্রাহকগণ আমার নি
শ্রীকে

দি ময়মনসিংহ

দেশী বিলাতি সকল প্রকার পারফিউমারী,
চুরট, বিস্কুট প্রভৃতি সৌখিন খাদ্য এবং নানা রক
ইণ্ডিয়ান কার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কসের ময়মনসিংহ

দি, ময়মনসিং

ণকাহিনী লেখক
সেন প্রণীত।

প্রবাসচিত্র।

এক টাকা।

হইয়াছে।

বিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত

ল-রেণু। প্রতি খণ্ড ৸০ আনা
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা
ট হইতেও লইতে পারেন।
দারনাথ মজুমদার—ময়মনসিংহ

ট্রেডিং কোম্পানী।

কেশ-তৈল, ষ্টেসনারী, কাঠের ও ষ্টিলের জিনিষ, চ
মের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে
স্থ একমাত্র এজেন্ট—
হ ট্রেডিং কোম্পানী—ছোটবাজার

কীর্ত্তিকলাপ ও নিবাসভূমি রাজনগর আপনার কুক্ষিসাৎ করিয়া, ইহা কীর্ত্তিনাশা নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে ইহার প্রশস্ততা চারি মাইলের ন্যূন হয় না।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথমভাগে দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত বুন্নাগ্রামে কায়স্থবংশে সুবিখ্যাত অভয়চন্দ্র দাসের জন্ম হয়। এই গ্রাম এক্ষণে লোনসিংহ নামে পরিচিত এবং ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত।

মুলফৎগঞ্জ থানার অধীনে বুন্নাগ্রামে রঘুনাথ দাস নামে একজন সামান্য তালুকদার বাস করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই কায়স্থবংশীয় তালুকদার সামান্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রঘুনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ পৈতৃক ভূসম্পত্তিরদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র রামকেশব দাস পারসীভাষা শিক্ষা করিয়া, ঢাকা নগরে গমন করেন। তিনি নবাবের দরবারে উকীলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, আপানার যত্ন, বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে গঙ্গাহরি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঢাকার বিখ্যাত জমিদার জীবনবাবুর জমিদারীর শাসনভার গঙ্গাহরি দক্ষতা ও সততার সহিত সম্পাদন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। গঙ্গাহরির তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ভৈরবচন্দ্রের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। গঙ্গাহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু রামচন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র বাবু গৌরচন্দ্র ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত থাকিয়া, বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৮৫১ খৃঃ মে মাসে নদীয়ায় বাবু রামচন্দ্র দাসের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের পৌত্র বিনোদ ও রাজবিহারী দাস অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ১৮৭৬খৃঃ গৌরচন্দ্র বাবুর মৃত্যু হয়। তাঁহার অন্যতম পুত্র বাবু সূর্য্যকুমার দাস এক্ষণে ডেপুটী কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

অভয়বাবুর পিতা কালীশঙ্কর দাস ঢাকার কালেক্টরী কাছারীতে মীরমুন্সীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া, দক্ষতার সহিত আপনার কার্য্য সম্পা-

দন করিতেন। তখন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পারসীভাষা প্রচলিত ছিল। প্রচলিত রীতি অনুসারে অভয়বাবু কিছুকাল বাঙ্গলা ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ৮ বৎসর বয়সে ১৮৩৬খৃঃ তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় তাঁহার শিক্ষা কার্য্যের ভার তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র গৌরচন্দ্র বাবু গ্রহণ করেন। গৌরচন্দ্র বাবু ও তাঁহার জেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র বাবু উভয়েই তখন চট্টগ্রামে ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গৌরচন্দ্র বাবু ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের আশায়, আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতৃব্য পুত্র অভয়চন্দ্রকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। অভয় চন্দ্র ঢাকা কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও মনোযোগের সহিত ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করিয়া, তাহাতে বিশিষ্টরূপে ব্যুৎপন্ন হন। এই সময়ে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। ১৮৪৪খৃঃ অভয়বাবুর জননী দুই পুত্র রাখিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হন। অভয়বাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা বঙ্গচন্দ্র বিবাহের পর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ভ্রাতার মরণের পর ভ্রাতৃবধূ আমরণ অভয় বাবুর যত্নে ও অন্নে প্রতিপালিতা হন।

বাল্যকাল হইতেই অভয় বাবু কর্ম্মঠ, শ্রমশীল ও অধ্যবসায় সম্পন্ন ছিলেন। আশৈশব তিনি সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে অনুরক্ত ছিলেন। ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন কালে এই কর্ম্মবীরের উদ্যমশীলতার প্রথম পরিচয় প্রদত্ত হয়। সহাধ্যায়ী রামকুমার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি অল্পব্যয়ে সর্ব্বসাধারণের ইংরাজী শিক্ষা লাভের জন্য একটী ইংরাজী বাঙ্গলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। ঢাকার সুবিখ্যাত এন্ পিঁপোগোস্ সাহেবের অর্থসাহায্যে এই পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। অদ্যাপি সেই বিদ্যালয় "পোগোস্ স্কুল" নামে মৃত আর্ম্মানীয় মহাত্মার বদান্যতা ও নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঢাকাবাসীর হিতকর কার্য্যে অভয় বাবুর প্রথম উদ্যম সফল হইয়া, তাঁহাকে উত্তরোত্তর অন্যান্য অনেক হিতকর কার্য্যে

প্রবর্ত্তিত করে।

কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, অভয়বাবু বিশ বৎসর বয়সে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে চট্টগ্রামে গমন করেন। এইস্থানে তাঁহার অভিভাবক ও পিতৃব্যপুত্র গৌরচন্দ্র বাবু ডেপুটী কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, গৌরচন্দ্র বাবুর চেষ্টা ও উদ্যোগে, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে জানুয়ারী অভয়বাবু আবকারী ডেপুটী কালেক্টরের সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তিনি আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, রাজভক্তি, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, কর্ম্মদক্ষতা ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিতে থাকেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি আপনার ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন H. H, Raberts নামে একজন সিবিলিয়ান সাহেব চট্টগ্রামে আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সাহেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী J. G. Pugh সাহেবের অধীনে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, তাঁহাদিগের প্রীতি ও অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। তাঁহার সততা, কর্ম্মদক্ষতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া, সাহেবেরা বিশেষ তুষ্টিলাভ করেন। ১৮৫২খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি চট্টগ্রামের কমিশনার সাহেবের কার্য্যালয়ে প্রধানতম কেরাণীর পদে উন্নীত হন। G. Plowden, H. Stainforth, A. Sconce এবং J. A. Muspratt সাহেব সেই সময়ে (১৮৫২-৫৬খৃঃ পর্য্যন্ত) চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের পদে যথাক্রমে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সকল ইংরেজ রাজপুরুষের অনুগ্রহে দিন দিন অভয়বাবুর পদোন্নতি হইতে থাকে। ১৮৫৩খৃঃ তিনি Skipwith সাহেবের Magistrate's Guide নামে পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া, প্রশংসালাভ করেন। অভয়বাবু যখনই যাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কার্য্যকুশলতায় তিনি যেমন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর প্রিয় ছিলেন, তেমনি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরও সম্ভ্রম, ভক্তি ও শ্রদ্ধার

ভাজন ছিলেন। তাঁহার সুশাসন ও তত্ত্বাবধানের গুণে, কোন অধীন ব্যক্তি নিজের কার্য্য সম্পাদনে অমনোযোগী হইতে পারিত না। অধীন ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত থাকিত। তিনি কাহারও প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন না, কাহাকেও কর্কশ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট করিতেন না। অধীনস্থ যোগ্য ব্যক্তির যাহাতে উন্নতি হয়, সেই বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা যত্ন করিতেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অভয়বাবু কমিশনার সাহেবের সহকারীর পদে উন্নীত হন। এই কালে তিনি মাসিক ৩০০ তিন শত টাকা বেতন পাইতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি এবং তাঁহার পিতৃব্য পুত্র গৌরচন্দ্র বাবু কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য করিয়া, কমিশনার C. Chapman এবং E. F. Radcliff সাহেবের কৃতজ্ঞতা ভাজন হন *। দুষ্ট লোকের ভয়ে, চট্টগ্রাম নগরের অধিবাসীরা সর্ব্বদা শঙ্কিত ও অস্থির ছিল। সেই সময়ে তাঁহারই যত্ন, সাহস, বীরত্ব ও প্রভুভক্তির দ্বারা অনেক ইংরেজরমণী ও রাজপুরুষগণের ধন, প্রাণ ও মানরক্ষা পায়। নর্ম্মানস্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত সেনাদলে প্রবিষ্ট হন। প্রতি রজনীতে সজ্জিত অবস্থায় তিনি নগররক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া, আপনার সাহসিকতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদানে বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহারই প্ররোচনায়

* I should consider it almost a deviation of duty, were I to abstain from making mention of the name of my Assistant Babu Abhay Chandra Das with whom I have been acquainted for the last 3½ years. That he gave utmost assistance to Mr. Chapman during the mutiny of the 34th N. I. is not only manifest from that Officers report, but from my own personal observation. He was most unwearying in his exertion at that time. He is a candidate for entering the Deputy Magistrate's line on a salary some what higher than his present allowence of Rs 300 per mensum.

Annual police administration Report for 1860-61.

চট্টগ্রামের ৩৪ গণিত পদাতিক সিপাহীগণ বিদ্রোহ অবলম্বনে ক্ষান্ত থাকিয়া বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে, প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়। কিন্তু অবশেষে তাহারা সাময়িক উত্তেজনায় নিজের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া বিদ্রোহিতা অবলম্বন করে।

অভয়বাবুর কার্য্যদক্ষতায় তাঁহার প্রভু বিভাগীয় কমিসনারেরা সকলেই তাঁহাকে অশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছেন। স্কোনচ্ সাহেব তাঁহাকে মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করিতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬০খৃঃ কমিশনার ষ্টীয়ার সাহেব অভয়বাবুকে ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত করিতে অনুরোধ করেন, ১৮৬২খৃঃ চট্টগ্রামের কমিশনার C. I. Buckland সাহেব তাঁহাকে ৪০০৲ টাকা মাসিক বেতনে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। পরিশেষে তিনি ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া, দুই বৎসর কাল চট্টগ্রামে অবস্থিতি করেন।

দেশের হিতকর অনুষ্ঠানে অভয়বাবু জীবনে কখনও অলসতা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। চট্টগ্রামে অবস্থিতিকালে অভয়বাবু, রামশঙ্কর সেন, রামশঙ্করের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বারকানাথ সেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই চারি জন ঢাকাবাসী, চট্টগ্রামের নানাবিধ উপকার সাধন করেন।

অভয় বাবু আশৈশব, দেশের উপকার করিতে ভাল বাসিতেন। নিঃসহায় লোকের প্রতি যথাসাধ্য অনুগ্রহ করিতেন। পরোপকার এবং স্বদেশীয়ের উপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহারই যত্নে চট্টগ্রাম নগরে প্রথম নীতি-সাধিনী সভা "নৃপ-নীতি-বোধিনী" নামে স্থাপিত হয়। তথায় তাঁহার যত্নে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া বর্ত্তমান বাটীতে নীত হয়। অভয়বাবু চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটীর অনেক উন্নতি বিধান করেন, চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিস্তর যত্ন করেন। তাঁহারই যত্নে চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৬৪ খৃঃ কলিকাতায় সর্ব্ব প্রথম কৃষি-প্রদর্শনী মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম

হইতে প্রদর্শনের উপযোগী বিবিধ দ্রব্য প্রেরণ করিয়া অভয় বাবু বিভিন্ন পারিতোষিকের সহিত একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। চট্টগ্রামে ১৮৬৬ খৃঃ কৃষি প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়, অভয় বাবুর অকৃত্রিম যত্ন ও চেষ্টা তাঁহার মূলে অবস্থিত। চট্টগ্রামে হাতীর খেদা কোম্পানীও তাঁহারই যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই হাতীধরা ব্যবসায়ে কিরূপে লাভ হইতে পারে, অভয় বাবুই তাহা প্রথমতঃ চট্টগ্রাম বাসীকে শিক্ষা প্রদান করেন। চট্টগ্রামের কমিসনার সাহেবের অধীনে ১৮৪৮ হইতে ১৮৬৪খৃঃ পর্য্যন্ত সতর বৎসর কাল কার্য্য করিয়া, অভয় বাবু চট্টগ্রামের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করেন। অনন্তর তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র নিজের জন্মভূমি ঢাকা জেলায় প্রসারিত হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে বিভাগীয় কমিশনারের সহকারীর পদে নিযুক্ত হইয়া, অভয় বাবু ঢাকায় আগমন করেন। তিনি অতি দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত ত্রয়োদশ বৎসর কাল এইকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, স্বদেশের অশেষবিধ হিতকর কার্য্য সাধন করেন। এই সময়ে ঢাকা নগরে যে সমস্ত সভা ও সমিতি স্থাপিত এবং সাধারণের হিতকর সদনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, অভয় বাবু সেই সকলের অগ্রণী ছিলেন। বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকা জিলায় তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ ও ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই অভয় বাবুর মত সাময়িক সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে নিঃস্বার্থ ভাবে মনে প্রাণে যোগদান করিয়া ঢাকাবাসীর অকৃত্রিম প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ হইতে পারেন নাই। এই প্রতিভাশালী কর্ম্মবীর এবং উদারহৃদয় ক্ষণজন্মা পুরুষ স্বদেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, ঢাকাবাসীকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে তাঁহার ন্যায় কার্য্যদক্ষ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থপর, পরোপকারী, অমায়িক, নিরহঙ্কার শ্রমশীল, প্রশস্ত হৃদয়, মহানুভব এবং পরদুঃখকাতর স্বদেশহিতৈষী

ঢাকায় আর কেহ আবির্ভূত হন নাই। স্বদেশের সেবায় অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনার মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন, এমন মহানুভব ব্যক্তি ঢাকার ভাগ্যে মহাত্মা অভয়চন্দ্র দাসের পর আর কেহ অবতীর্ণ হন নাই। ঢাকা এখন জীবন্মৃত, ঢাকা এখন স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, পর নিন্দা, আত্মাভিমান এবং পরশ্রীকাতরতার পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ। ঢাকার জীবনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। অভয় বাবুর মত নিঃস্বার্থপর কর্ম্মবীর ও মহাপ্রাণ স্বদেশ হিতৈষীর আবির্ভাবে, ঢাকা কবে পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীর গৌরবান্বিত পদ গ্রহণ করিবে, তাহা ভগবান জানেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "অমৃতবাজার পত্রিকা" বাঙ্গলা ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকার আকারে প্রকাশিত হইত। স্বর্গীয় মহাত্মা হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয় সেই সময়ে পর্য্যটন উপলক্ষে ঢাকা নগরে আগমন করিয়া অভয় বাবুর সহিত পরিচিত হন। বৈষ্ণব-কুল-চূড়ামণি মহাত্মা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। হেমন্ত বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ এক্ষণে অতি ধীরতা, দক্ষতা, বিবেচনা ও লিপি-নৈপুণ্যের সহিত দৈনিক "অমৃতবাজার পত্রিকা" ইংরেজী ভাষায় পরিচালনা করিয়া, স্বদেশের সেবায় নিযুক্ত আছেন। ঢাকায় অবস্থিতি কালে হেমন্ত বাবু মহানুভব অভয়চন্দ্র দাসের কার্য্য কুশলতা ও স্বদেশ হিতৈষিতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হন। তিনি মুক্তকণ্ঠে অভয় বাবুর প্রশংসা করিয়া স্বীয় মহানুভাবকতার পরিচয় প্রদান করেন। অভয় বাবুর অনুচিত প্রশংসাবাদে যে বর্ত্তমান লেখক সত্যের অপলাপ দ্বারা লেখনী কলঙ্কিত করে নাই, তাহার প্রমাণ স্থলে সূক্ষ্মদর্শী ও স্বদেশ প্রেমিক হেমন্ত বাবুর লিখিত পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ভবিষ্যতে অভয়বাবুর কার্য্যময় জীবনী সংক্ষেপে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

"ঢাকার লোকের জীবনীশক্তি এখনও সম্পূর্ণ দীপ্যমান রহিয়াছে। পলিটিভিজমের নৈরাশ্যভাব এবং বিজ্ঞদিগের অনুৎসাহ সূচক উপদেশ অদ্যাপি পদ্মানদী পার হয় নাই। ঢাকার হিতকারী শুভসাধিনী সভা হইতে পলিটিকেল এসোসিয়েসন পর্য্যন্ত সমুদয় সমিতি গুলি জীবন্ত ভাবাপন্ন। কমিসনারের এসিষ্টেন্ট অভয়চন্দ্র বাবু একরূপ সমুদয় সভার সভাপতি। এ সমুদয়ের মধ্যে ঢাকার প্রায় প্রধান প্রধান সকলেই আছেন। দেশের দশজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইলেই শুনা যায়, নানা সভার বিষয় আলোচনা হইতেছে। অভয় বাবু একটী আশ্চর্য্য লোক। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেক বিদ্বান্ আছেন, বুদ্ধিমান আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় অভয় বাবু আছেন কি না সন্দেহ। দশজন বালকে কোন বিষয়ের উদ্যোগ করিতেছে। এখানে অভয় বাবু কর্ত্তা। আবার কোন গুরুতর বিষয়ের তর্ক বিতর্ক হইতেছে, সেখানেও তিনি কর্ত্তা। ইনি কি মোহন মন্ত্র জানেন। ইঁহার নিকট সকল শ্রেণীর সকল বয়স্ক সর্ব্বপ্রকারের লোক অনুগত। ইনি সাহেবদিগের বন্ধু, বাঙ্গালীদিগের বন্ধু, ব্রাহ্মদের বন্ধু, হিন্দুদের বন্ধু, জমিদারের বন্ধু, প্রজার বন্ধু। ইঁহার ন্যায় প্রসারিত হৃদয়, সহিষ্ণুতা, মহানুভাবকতা, আর কাহারও আছে কিনা, তাহা আমি জানি না। আমি ঢাকার অনেকগুলি সভা দেখিয়াছি। ঢাকার সভার নাম শুনিলেই আপনি জানিবেন অভয় বাবু উঁহার সভাপতি।"

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

বারমাস্যা।

বঙ্গভাষার অনেক প্রাচীন গীতিকাব্যেই বারমাস্যা (বার মাসের বর্ণনা) দেখিতে পাওয়া যায়। সুখে দুঃখে বারমাস্যা বর্ণনা প্রাচীন কবিদিগের বড়ই প্রিয় ছিল। বারমাস্যাতে বাঙ্গালীর অস্থি মজ্জাগত

সুখ দুঃখের একটা করুণ স্রোত যেমন প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যকোন কবিতাতে তেমন করুণ বেদনার আভাস দেখা যায়না। বাঙ্গালী হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখের চিত্র বারমাস্যাতে বড়ই পরিস্ফুট। এক করুণ উদাসভাব প্রাণের সরল ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়া একটী হৃদয়ের কাতরতায় সহস্র হৃদয় কাতর করিয়া তুলে। প্রাচীন গীতিকাব্যে নায়িকার মুখেই প্রায় বারমাস্যা বর্ণিত হইয়াছে। বিরহ কালে বা ভাবী বিরহের আশঙ্কায় যখন হৃদয় বড়ই আকুল হইয়া উঠিয়াছে তখনই নায়িকা বারমাসের সুখ দুঃখের সহিত অতীতের করুণ স্মৃতি বা বর্ত্তমানের বেদনা মিশাইয়া সখীর নিকট বা প্রিয়জনের নিকট বারমাসের বর্ণনা করিয়াছেন। গীতিকাব্যে লিখিত বারমাস্যা ব্যতীত সে কালে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক কবি আপনাদের জীবনে অনুভূত সুখ দুঃখ লইয়া অনেক বারমাস্যা বর্ণনা করিয়া ছিলেন। সেই সকল সরল মধুর কবিতা বড়ই প্রাণস্পর্শী। এক অব্যক্ত করুণ ছায়াপাতে উহা বড়ই শীতল ও শান্তিপ্রদ। এক কালে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ বসন্তে বাঙ্গালী গৃহস্থ, পথিক ও কৃষক উহা গাহিয়া উদাস ভাবে বিভোর হইত। এক্ষণে সেক্ষপীয়র, মিলটন প্রভৃতি ইংরেজ কবির ভাবে বিভোর শিক্ষিত বঙ্গবাসী হেম, নবীন, রবীন্দ্রের হারমোনিয়ম ধ্বনিতে সে সরল বংশীধ্বনি বিস্মৃত হইয়াছেন। দূর পল্লীতেও এখন আর সে প্রাণারাম গীত ধ্বনি বড় শুনা যায় না। এখন মুকুন্দরামের জায়গায় মতি বাবু, হরিচরণের স্থলে হারাণ বাবু আসন পাইয়াছেন। আরও কিছু দিন গেলে হয়ত সেই মধুর গীতগুলি চিরদিনের জন্য বাঙ্গালীর স্মৃতির অতীত হইয়া পড়িবে। গাহিবার জন্য না হউক কিন্তু খাটী বাঙ্গলা কবিতার সরল সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য এবং সে কালের বাঙ্গালী বধূর আকাঙ্ক্ষা বুঝিবার জন্য এই বারমাস্যা যত্নের সহিত রক্ষণীয়। এমন খাটী বাঙ্গলা গ্রাম্য গাথা বাঙ্গালী হৃদয় প্রকাশক এমন সরল গীত লহরী আর নাই।

আরও এক কারণে প্রাচীন বারমাস্যা রক্ষা করা প্রয়োজন। যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন প্রায় কোন প্রাচীন গীতিকাব্যই একমাত্র কবির চেষ্টায় বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয় নাই। বহু কবির চেষ্টায় এক এক খানি কাব্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রাম্যগাথা, উপকথা, বারমাস্যাদি গান অনেক কাব্যের মূল। আমরা এমনই বারমাস্যা সংগ্রহ করিয়াছি, যাহা সাক্ষাৎ ভাবে কোন একখানি প্রসিদ্ধ গীতিকাব্যের মূল বলিয়া বুঝা যায়। এই সকল সূত্রাকারে গঠিত বারমাস্যাদি গান ও গ্রাম্য গাথাই পরবর্ত্তী কবিগণের চেষ্টায় বৃহৎ হইতে বৃহত্তম গীতিকাব্যে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য প্রাচীন কাব্যের মূলানুসন্ধানার্থে বারমাস্যা রক্ষা করা আবশ্যক। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল উদ্দীপনের জন্য ২।১টী গ্রাম্য বারমাস্যা উদ্ধৃত করিতেছি। না গাহিলে এই সকল গ্রাম্য কবিতার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারা যায় না। যখন সবুজ ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে সরল চিত্ত কৃষকগণ সমস্বরে কণ্ঠ খুলিয়া এই গ্রাম্য গাথা গান করে, তখন তাহাদের সেই করুণ স্বর লহরীতে প্রাণে যে কি এক অব্যক্ত উদাস ভাবের সঞ্চার করে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না।

১। গোপীবিরহ—বারমাস্যা।

১। মাঘেতে মাধব গেল মথুরা নগর।
আহিরী রমণী মোরা ভাবি নিরন্তর।

২। ফাল্গুণে ফাগুয়া খেলিতে,
মনে বলে প্রাণ বন্ধু আসিবেন ইহাতে।

৩। চৈত্রেতে চঞ্চলা মোরা গোপী সর্ব্বজনে।
চমকি চমকি উঠি শয়নে স্বপনে।

৪। বৈশাখে বিষম বড় রবির কিরণ।
একত্র বসিয়া ভাবি নাথের কারণ।

৫। জ্যৈষ্ঠেতে যতেক মোরা আহিরী রমণী।
একত্র বসিয়া কহি দুঃখের কাহিনী।

৬। আষাঢ়েতে লোক মুখে রথ যাত্রা শুনি।
মনে বলে প্রাণবন্ধু আসিবেন এখনি।

৭। শ্রাবণে ঝুলন খেলিতে,
মনে বলে প্রাণবন্ধু আসিবেন ইহাতে।

৮। ভাদ্র মাসে ভরা নদী হইল সাঁতার।
নিরাশ হইলাম বন্ধু না আসিলা আর।

৯। আশ্বিনে অম্বিকা পূজে এ তিন ভুবন।
মনে বলে প্রাণবন্ধু আসিবেন এখন।

১০। কার্ত্তিকে কাননে কৃষ্ণ চড়াইতেন ধেনু।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তটে বাজাইতেন বেণু।

১১। অস্ত্রাণে অক্রূর মুনি আনিল সংবাদ।
বৃন্দাবনে আসিবেন কৃষ্ণ দিনেক দুই চার বাদ।

১২। পৌষ মাসে বড় শীত সহন না যায়।
পীরিতি বিচ্ছেদ জ্বালা দ্বিগুণ জ্বালায়।

সখিরে! কাঁল আসবে বলে
বন্ধু গেছে, কাল কাল আর কত সয়।

২। ময়মনসিংহের প্রচলিত বারমাস্যা।

১। জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল,
আষাঢ়ে বরিষার জল,
শ্রাবণ মাস গেল নারীর
নাইয়রে নাইয়রে হারে নাইয়রে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধু বৈদেশে বৈদেশে।
ধুয়া।

২। ভাদ্রেতে আওলাইয়া কেশ,
আশ্বিনে বরিষার শেষ,
কার্ত্তিক মাস গেল নারীর
সায়রে সায়রে কত কান্দরে।
কত পাষাণ.....ইত্যাদি।

৩। আঘনে নবীন ধান,
পৌষে নারীর না রয় প্রাণ,
মাঘের শীত গেল কত
দুখেতে, দুখেতে হারে দুখেতে।
কত পাষাণ.....ইত্যাদি।

৪। ফাল্গুনে বিরহ জ্বালা
চৈত্রতে শরীর কালা,
ধৈর্য্য না মানে কাল
বৈশাখে বৈশাখে হারে বৈশাখে।

চার মাস পূর্ণ যে হৈল
আমার সাধু দেশে আইল,
আইল সাধু রইল কার
মন্দিরে মন্দিরে হারে মন্দিরে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বাপর যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরও দ্বাপরে সংঘটিত হইয়াছিল, এই ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এই সর্ব্বজনীন ধারণার মূল সমর্থনের পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কুরুক্ষেত্র মহা সমরের ইতিহাস "মহাভারত"। মহাভারতেও দ্বাপর যুগে যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাবের কোনরূপ সুস্পষ্ট ছায়া প্রতিভাত হয় নাই। পরন্তু তদুক্ত ঘটনা নিচয় বর্ত্তমান কলি যুগের সহিত বহুল পরিমাণে বিজড়িত রহিয়াছে দৃষ্ট হয়"।

মহারাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী মহামতি ভীষ্ম দেব সমীপে যুগধর্ম্ম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন "দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় পুত্র কাম হইয়া যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কলি যুগে কেবল শত্রু মারণাদি কামনা করতঃ লোকে যজ্ঞ করিয়া থাকে।"*

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে "ভগবান মুকুন্দ যে দিন দেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন অবিবেকীদিগের অমঙ্গল কারী কলির পূর্ণ প্রভুত্ব জগতে প্রবর্ত্তিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির পরম পণ্ডিত ছিলেন সুতরাং লোভ, মিথ্যা, কৌটিল্য ও হিংসাদি অধর্ম্ম চক্রকে চলিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন আপনার রাজ্যে, নগরে গৃহে ও দেহে কলির সঞ্চার হইয়াছে, অতএব অবিলম্বেই মহাপ্রস্থান করিবার নিমিত্ত তদুপযোগী বসন পরিধান করিলেন।†

এইরূপে অনুমিত হয় যে মহারাজ যুধিষ্ঠির কলির প্রারম্ভ কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবিতকাল পর্য্যন্ত কলি তাহার প্রভুত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার তিরোভাবের পর হইতেই কলির পূর্ণ প্রভুত্ব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকালের যথার্থ সময় নিরূপণ কিরূপে হইতে পারে?

ভারতীয় প্রাচীন তত্ত্বের ঐতিহাসিকত্ব নিরূপণ করা বড়ই কষ্ট সাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার। সে কষ্ট এবং শ্রমলব্ধ তত্ত্বও অধিকাংশই অনুমান মূলক। তাহার ১ম কারণ, প্রকৃত ইতিহাস বলিলে আমরা যাহা মনে করি সেরূপ গ্রন্থের অভাব, যে দু এক খানা আছে তাহাতেও একের সহিত অন্যের মত পার্থক্য। ২য় কারণ ঐ সকল পুরাণ গ্রন্থাদিতে সময় নির্দ্দেশক অব্দের অপ্রচলন।

মহাভারত পাঠে জানাযায় কার্ত্তিক মাসের ১৬ই তারিখ, সোমবার, ধনু রাশি, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে, চন্দ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে,

* শান্তি পর্ব্ব ২৩১ অধ্যায়, বঙ্গবাসীর অনুবাদ। † ৩য় স্কন্ধ ১৫শ অঃ—৩৫—৪০ শ্লোক, ঐ।

অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে, বেলা দ্বিতীয় প্রহর সময় শতশৃঙ্গ কন্দরে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।* সত্য বটে যুধিষ্ঠিরের জন্মকালের অতি সূক্ষ্মতম তত্ত্বটী পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইলাম কিন্তু ইনি কোন সময়ে, দ্বাপরে কি কল্যব্দে, শকে কি সংবতে, বুদ্ধাব্দে কি খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইবার কোন সহজ পন্থা নাই। যাহা কিছু আছে তাহাও ভ্রমসঙ্কুল, পদে পদে বৈষম্য পূর্ণ এবং দুর্ব্বোধ। কাজেই এমন স্থলে যুক্তি ও আনুমানিক প্রমাণের আশ্রয় ব্যতিরেকে এরূপ বিষয়ের মীমাংসায় অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে না।

এতৎ প্রমাণ কল্পে সর্ব্বাগ্রে পুরাণাদির আলোচনাই সর্ব্বথা সমীচীন। বিষ্ণু পুরাণে পরিক্ষিতের সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে

"যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং ॥৩২—৪অং ২৪অধ্যায়।

অর্থাৎ পরিক্ষিতের জন্ম কাল হইতে নন্দের অভিষেক কাল ১০১৫ বৎসর।

"তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ।"৩৪

তখন (পরিক্ষিতের সময়) দিব্য দ্বাদশাব্দ শতাত্মক কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে এক শত বৎসরের গোল। ভাগবতের পাঠ এইরূপ

"আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ১২স্ক—২অ—২৬শ্লোক।

বিষ্ণুপুরাণের "জ্ঞেয়ং" স্থলে ভাগবত "শতং" যোজনা করিয়া শত বৎসরের গোল করিয়াছেন।

বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণের মত এক। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে

* মহাভারতম্ আদিপর্ব্ব ১২৩ অধ্যায় ৬ শ্লোক।

পরিক্ষিত হইতে নন্দের কাল ১০১৫ বৎসর অন্তর দৃষ্ট হয়।

উপর্য্যুক্ত পুরাণসমূহ হইতে নিম্নলিখিত সময় অবগত হওয়া যায়।

	ভাগবতমতে	বিষ্ণুপুরাণমতে	বায়ুপুরাণমতে	মৎস্যপুরাণমতে
পরিক্ষিতের জন্মকাল হইতে নন্দের অভিষেক কাল	১১১৫	১০১৫	১০১৫	১০১৫
নন্দবংশের শাসনকাল—	১০০	১০০	১০০	১০০
	১২১৫	১১১৫	১১১৫	১১১৫

নন্দবংশের উচ্ছেদের পর উপর্য্যুক্ত পুরাণসমূহের মতেই মৌর্য্য-বংশের আবির্ভাব। মৌর্য্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত ৩২০খ্রীঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; চন্দ্রগুপ্তের অনতিকাল পূর্ব্বেই ৩২৫খ্রীঃ পূঃ সুপ্রসিদ্ধগ্রীক বিজয় সংসাধিত হয়। এসকল তত্ত্ব আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

যদি পুরাণাদির উপর্য্যুক্ত নির্দ্দেশ সর্ব্ববাদি সম্মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় এবং ৩২০খ্রীঃ পূঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল আরম্ভ সঙ্গত বলিয়া অবধারিত হয়, তাহা হইলে (১২১৫+৩২০) ১৪৩৫ অথবা (১১১৫+৩২০) ১৪৩৫ অথবা (১১১৫+৩২০) ১৪৭০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে অর্জ্জুন-পৌত্র পরিক্ষিত রাজত্ব করিতেছিলেন এরূপ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এ নির্দ্দেশ ভ্রান্তিশূন্য অনুমান করিবার অণুমাত্রও কারণ নাই।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণচরিত্রে" বিষ্ণুপুরাণের "তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ।" শ্লোকের ব্যাখ্যার স্থলে লিখিয়াছেন "তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" অনেকে বঙ্কিমবাবুর ব্যাখ্যায় দোষ ধরিয়াছেন।

"দ্বাদশাব্দ শতাত্মক কলি" এইরূপ অন্বয়ে অনেকে হাস্য করিতে পারেন সত্য, কিন্তু ইহাকে "দিব্য দ্বাদশাব্দ শতাত্মক" করিয়া ব্যাখ্যা করিলে বোধ হয় পুরাণকারেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, হাস্য করিবারও

কোন কারণ থাকে না। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীও তাহাই করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা এখানে বঙ্কিমবাবুর মতেই সর্ব্বাগ্রে গণনা করিয়া দেখিব তাঁহার মত পরিক্ষিতের সময় কলি বারশত বৎসরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল পরিক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি যুধিষ্ঠির। সুতরাং যুধিষ্ঠির বারশত সা ১১৯৯ কল্যব্দে জীবিত ছিলেন। বর্ত্তমানে ৫০০১ [illegible] বলাব্দ হইতে খ্রীষ্টাব্দ বাদ দিলে অবগত হওয়া যায় যে ৫০০১—১৯০০ ৩১০১ কল্যব্দে খ্রীষ্টাব্দ প্রবর্ত্তিত হয়; এবং কল্যব্দ ৩১০১ হইতে পরিক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী ১২০০ বৎসর বাদ দিলে (৩১০১—১২০০) ১৯০১ বা ১৯০০ খ্রীঃ পূঃ যুধিষ্ঠির জীবিত ছিলেন অবগত হওয়া যায়

এখন খ্রীঃ পূঃ ১৯০০ বৎসরের ইতিহাস সংগৃহীত হইলে বর্ত্তমান নির্দ্দেশ অস্বীকার করিবার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু তাহা সংগৃহীত হইবার অণুমাত্রও উপায় নাই; কারণ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে পুরাণাদিতে পরিক্ষিত হইতে খ্রীষ্টাব্দারম্ভকাল ১৫৩৫, ১৪৩৫, ১৪৭০ প্রভৃতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতেই খ্রীঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ সমীচীন বোধ হয় না

পুরাণাদি হইতে ইহা অপেক্ষা পরিষ্কার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মত আলোচনা করিলে প্রকৃত তত্ত্ব দূরে থাকুক আরও ভ্রমে নিপতিত হইতে হয়। তাঁহারা পুরাণ সমূহের শ্লোকার্থের বিকৃতি করিয়া এক একজন, এক এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন

কোলব্রুক, এলফিনষ্টোন এবং উইলফোর্ডের একমত। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের কাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অবধারিত করিয়াছেন।

স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু এবং সুপণ্ডিত রমেশবাবুর এক মত। তাঁহারা পরিশেষে বিষ্ণুপুরাণের মতই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছেন। ক্যানিংহাম এবং মার্সম্যানও বিষ্ণুপুরাণের মত স্বীকার করিয়াছেন। হ্যামিলটন খ্রীঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে এবং সার উইলিয়ম জোন্স্ কলির প্রথম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ বহুব্যক্তির বৈষম্যপূর্ণ মত হইতে প্রকৃত বিবরণ অবগত হওয়া অসম্ভব।

অনন্তর পুরাণাদির উল্লেখ ছাড়িয়া অন্য একখানা আধুনিক গ্রন্থের সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইব। অনেক প্রতীচ্য বুধজন কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া প্রশংসিত হইয়া আসিয়াছে। সে গ্রন্থ কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী। ভারতের অমূল্য এবং অদ্বিতীয় রত্ন। রাজতরঙ্গিণী হিন্দুর প্রামাণ্য ইতিহাস। হিন্দুজাতির ইতিহাসহীনতা কলঙ্কের স্পর্দ্ধা। ১০৭০ শকাব্দায়; খ্রীষ্টীয় ১১৪৮ অব্দে কাশ্মীরাধিপের মহামাত্য চম্পক প্রভুর পুত্র কহ্লন পণ্ডিত এই বিপুল ইতিহাসের সংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং বহু বিজ্ঞজন সাহায্যে ইহার পরিসমাপ্তি হয়।

উক্ত গ্রন্থালোচনায় অবগত হওয়া যায় কাশ্মীর রাজবংশের আদিপুরুষ ১ম গোনর্দ্দের রাজ্যশাসন সময়ে, ৬৫৩ কলিগতাব্দে কুরু এবং পাণ্ডু বংশীয়েরা বর্ত্তমান ছিলেন। *

রাজা গোনর্দ্দ তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ মগধরাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক সাহায্যার্থে আহূত হইয়া মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী আক্রমণ করেন এবং যমুনাতীরে বিশেষ শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক হলধর-হস্তে নিহত হন। † রাজা গোনর্দ্দ ৩৬। ৬ মাস রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দামোদর পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ

* শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ॥ ১ম তরঙ্গঃ ৫১ শ্লোকঃ।
কাশ্মীরেষ্বাদি গোনর্দ্দঃ খ্যাতঃ সর্ব্বধরাভুজাম্। সমকাল ভবঃ পাণ্ডু পুত্রাণাং শৌর্য্যশালিনাম্॥

† অথ শস্ত্রক্ষতৈ রঙ্গৈ রালিলিঙ্গ রণাঙ্গনে। ভুবং কাশ্মীরিকো রাজা যাদবস্তু জয়শ্রিয়ম্॥ ৩০

করেন। তিনি পিতৃঋণ পরিশোধার্থ পিতৃশত্রু বধ করিতে যাইয়া গান্ধার প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হন। * দামোদরের পুত্র ২য় গোনর্দ্দ শ্রীকৃষ্ণের সহানুভূতি ও সাহায্যক্রমে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অতি শৈশবসময়ে রাজ্যপ্রাপ্তি হয় এবং সেই সময়ে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। শিশুত্ব নিবন্ধন তিনি কোন পক্ষে যোগদান করেন নাই। †

রাজতরঙ্গিণীর উল্লিখিত অংশ পরম্পরা হইতে প্রধানতঃ এই দুইটী বিষয় অবগত হওয়া যায় যে ৬৫৩ কলিগতাব্দে গিরিব্রজনগরে (মগধে) জরাসন্ধ ও ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। মহাভারতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও যুধিষ্ঠিরের সময়ে জরাসন্ধের অবস্থিতি সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে।

রাজতরঙ্গিণী হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে আদি গোনর্দ্দ হইতে তাঁহার দ্বিপঞ্চাশৎ পুরুষ অধস্তন ৩য় গোনর্দ্দ পর্য্যন্ত উক্ত বংশীয়েরা ১২৬৬ বৎসরকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন এবং ৩য় গোনর্দ্দ হইতে গ্রন্থকারের সময় ১০৭০শকাব্দা পর্য্যন্ত ২৩৩০ বৎসর গতহইয়াছিল। ‡

তাহা হইলে দেখা যায় যে—

আদি গোনর্দ্দ হইতে ৩য় গোনর্দ্দ	১২৬৬
৩য় গোনর্দ্দ হইতে গ্রন্থকারের সময়	২৩৩০
গ্রন্থকারের সময় হইতে বর্ত্তমান ১৯০০ খ্রীঃ (১৯০০—১১৪৮)	৭৫২
	৪৩৪৮

* তদাক্রান্তা সুহৃচ্চক্রঃ সচ ক্রাযুধ সংগরে। চক্রধারা ধ্বনাধীর শ্চক্রবর্ত্তী দিবং যযৌ॥ ৬৯

† ইতি কাশ্মীরিকো রাজা বর্ত্তমানঃ স শৈশবে। সঙ্গায় কায় সমরে ন নিন্যে কুরুপাণ্ডবৈঃ॥ ৮২

‡ বর্ষাণাং দ্বাদশ শত ষষ্টিঃ ষড় ভিশ্চ সংযুতা। ভূভুজাং কাল সংখ্যায়াং তৎ দ্বাপঞ্চাশতোমতা॥ ৫৪
লৌকিকেব্দে চতুর্ব্বিংশে শক কালস্য সাম্প্রতং। সপ্ততাতাধিকং যাতং সহস্র পরিবৎসরাঃ॥ ৫২
প্রায়ঃ তৃতীয় গোনর্দ্দা দারভ্য শরদাংবদা। দ্বে সহস্রে গতে ত্রিংশদধিকং চ শতত্রয়ং॥ ৫৩

বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে গোনর্দ্দ রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কলিগতাব্দা হইতে এই সংখ্যা বাদ দিলে (৫০০১—৪৩৪৮=৬৫৩) গোনর্দ্দের আবির্ভাব কালের সহিত গণনার ঐক্য দৃষ্ট হইবে। যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবেরও কাল নির্ণীত হইতে পারিবে।

যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় জ্যোতিষীমতও রাজতরঙ্গিণীতে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। জ্যোতিষাভিজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিবেন, সে মত বিচার করিতে যাইয়া অযথা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।"

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। উপর্যুক্ত মত সর্ব্ববাদি সম্মত এবং প্রজ্ঞাগৃহীত। বিষ্ণুপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণসমূহেও ঐমতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজতরঙ্গিণীর গ্রন্থকারও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। ইহা প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহিরের মত।

জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে সপ্তর্ষির স্থিতি প্রতি নক্ষত্রে ১০০ বৎসর কাল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। * এই নির্দ্দেশ অনুসারে গণনা করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণ আচার্য্যগণের পক্ষে বোধ হয় দুরূহ হইবে না।

উক্ত শ্লোকের ২য় চরণ "ষড়দ্বিক পঞ্চদ্বিযুত শক কালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ।" হইতে অবগত হওয়া যায় যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভকাল হইতে ২৫২৬ (অঙ্কস্য বামাগতিঃ) বৎসর পর শকাব্দা প্রবর্ত্তিত। এ উভয়ের যোগেও যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল বর্ত্তমানকাল হইতে ৪৩৪৮ পূর্ব্ব অব্দে অবগত হওয়া যায়।

* একৈকস্মিন্ নৃক্ষে শতং শতং চরতি তে বর্ষাণাম্॥ বৃহৎ সংহিতা॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দ শতং নৃণাম্॥ বিষ্ণুপুরাণ॥

জ্যোতির্ব্বিদাভরণে অবগত হওয়া যায় যুধিষ্ঠিরের প্রচলিত অব্দ কলির ৩০৪৪ গতাব্দ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত ছিল। * তৎপর উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সংবৎ প্রচলিত হয়। বর্ত্তমানে ১৯৫৭ সংবৎ। এ উভয় সংখ্যার যোগেও যুধিষ্ঠিরের সময় ৪৩৪৮ পূর্ব্ব অব্দে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতও আমাদের পোষক প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে কলির তিন সহস্র বৎসর পূর্ণ হইবার তিন শত দশ বৎসর অবশিষ্ট থাকিতে অর্থাৎ ২৬৯০ কল্যব্দে নন্দবংশ রাজত্ব করিবেন। † রাজতরঙ্গিণীর গণনামতে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল হইতে ঐ সংখ্যা বাদ দিলে (২৬৯০—৬৫৩=২০৩৭) যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ২০৩৭ বৎসর পর নন্দের রাজত্বকাল পাওয়া যায়, এবং বর্ত্তমান সময় হইতে (২০৩৭+১০০+৩২০+১৯০০) ৪৩৫৭ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব অনুমিত হয়। সুতরাং এমতও রাজতরঙ্গিণী এবং বরাহমিহিরের অনুকূল। চারি সহস্র বৎসরের গণনায় ১০। ২০ বা শত বৎসরের গোল গণনার প্রতিকূল নহে। বিশেষ সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সংযোগে এ গোল ঘটিবেই।

আমরা রাজতরঙ্গিণীর মতই প্রামাণ্য সিদ্ধান্তিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বা ৬৫৩ কল্যব্দে নির্দ্দেশ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। বারান্তরে মহাভারতীয় আলোচনায় ও তদন্তর্গত প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহের সময় নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

---

* যুধিষ্ঠিরাব্দেরয় গম্যরাগ্নয়ঃ—জ্যোতির্ব্বিদাভরণ॥

† ততোঽপি ত্রি সহস্রেষু শতাধিক ষু ত্রয়ে। ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যোবান্ হনিষ্যতি॥

যৌতুক।

জলধি মথিলে মিলে ইন্দিরা সুন্দরী,
পর্ব্বতে পার্ব্বতী মিলে করি অন্বেষণ,
বিদেহে বৈদেহী মিলে ভূমি চাষ করি,
মিলে যজ্ঞে যাজ্ঞসেনী, তুষি হুতাশন!
মিলে গো হীরক, চুণী, পার্থিব রতন,
কত দেশে কত খনি আছে মণিভরা,
মিলে কত মরকত করিলে যতন;
অগণিত রত্নপূর্ণ এই বসুন্ধরা!
এ নহে পার্থিব কিছু, পূর্ব্ব পুণ্য ফলে
অবতীর্ণ এ সুবর্ণ বিধির প্রসাদ,
স্নেহ শান্তি পবিত্রতা মমতা মঙ্গলে,
একত্র সঞ্চিত ছিল দেব-আশীর্ব্বাদ।
বিষ্ণুর অধিক বৎস, তুমি ভাগ্যবান্
লহ পুণ্য-পুরস্কার—লহ দেব দান। *

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বর্ণসঙ্কর।

বর্ণসঙ্কর কাহাকে কহে? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে একটী অপোগণ্ড শিশুও বলিয়া উঠিবে, "দ্বিবর্ণসম্ভূত ব্যক্তি মাত্রই বর্ণসঙ্কর শব্দের বিষয়ীভূত"। অধীয়ান্ হইতে অনধীয়ান, পণ্ডিত হইতে মূর্খ, ধনী হইতে দরিদ্র, গৃহী হইতে সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত আমূল মানব মণ্ডলীরই সাধারণ জ্ঞান, ধারণা ও বদ্ধ সংস্কার যে Mixed caste ও বর্ণসঙ্কর শব্দ অভিন্ন ও একার্থবাচী।

* কোন বিবাহ উপলক্ষে লিখিত।

কিন্তু তাহা নহে। কোন কোন বর্ণসঙ্কর ও Mixed caste দ্বিবর্ণসম্ভূত বটে, কিন্তু তা বলিয়া দ্বিবর্ণসম্ভূত জাতি মাত্রই বর্ণসঙ্কর, সঙ্কর বা সঙ্কীর্ণ পদবাচ্য হইবে না। দুই বর্ণের সমবায় অর্থাৎ মিলন হইলেই তৎ-প্রসূতি বর্ণসঙ্কর হইবে, এ সংস্কার সাধীয়ান্ নহে। বর্ণের সাম্য থাকা সত্ত্বেও অবস্থা বিশেষে দুই বর্ণের বিনা মিশ্রণে সাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে।

তবে বর্ণসঙ্কর জিনিসটা কি? শাস্ত্রের অনুসরণ কর অবশ্যই পদার্থ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। জগন্মান্য মহর্ষি মনু বলিয়াছেন

ব্যভিচারেণ বর্ণানা মবেদ্যা বেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ (১০ অ—২৫)

অর্থাৎ ব্যভিচার, অবেদ্যা-বেদন, ও স্বকর্ম্ম ত্যাগ এই হেতু ত্রিতয়ে বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের "স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়, জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ এই উক্তিও মনুর উক্তির সম্পূর্ণ অনুসারিণী।

পাঠক! এখন বিচার করিয়া দেখ, মনুর ২টী কারণ উৎপত্তিগত, ৩য় কারণ ক্রিয়াগত। লোক কেবল উৎপত্তিগত দোষে বর্ণসঙ্কর হয় এরূপ নহে, ক্রিয়া লোপেও লোকের বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে। তুমি ব্রাহ্মণ অতএব তুমি ষট্‌কর্ম্মা। এখন যদি তুমি বিয়াল্লিশ কর্ম্মা হও অথবা শাস্ত্রসঙ্গত ষট্ কর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কর তাহা হইলেও তুমি বর্ণসঙ্কর শব্দের বিষয়ীভূত হইবে। ঐরূপ চিকিৎসাবৃত্তিক অম্বষ্ঠ যদি চিকিৎসা ছাড়িয়া ব্যবহারাজীব হয়, এবং অক্ষরাজীব কায়স্থ যদি লেখনী ছাড়িয়া নাড়ী টিপিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে, তবে তাহারাও বর্ণসঙ্কর হইয়া যাইবে। শাস্ত্র মানিলে আমরা সকলেই বর্ণসঙ্কর হইয়া গিয়াছি। "সর্ব্বং বৈ মূর্খ মণ্ডলং" বলিয়াছি। স্বকর্ম্মত্যাগের কথা বলা হইল এখন আমরা উৎপত্তিগত সাঙ্কর্য্যের কথা বলিব।

ব্যভিচার বর্ণসাঙ্কর্য্যের একটী মুখ্য কারণ। নিয়মের অন্যথা চরণের নাম ব্যভিচার। মানুষ আপনার ধর্ম্মপত্নীতে উপগত হইবে ইহাই হইল সনাতন বিধি। যদি কেহ সেই পবিত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যের বা অন্য স্ত্রীতে উপগত হয় তবে সে ব্যভিচার করিল। এই ব্যভিচার জাত সন্তান বর্ণসঙ্কর হইবে। মনে কর ক খ, এর বিবাহিতা স্ত্রী এখন যদি গ নামক অপর কোন পুরুষ ও ক এতদুভয়ের উপগতিতে ঘ নামক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সে বর্ণসঙ্কর সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবে।

বর্ণসাঙ্কর্য্যের অন্যতর কারণ অবেদ্যা-বেদন। বেদ্যা অর্থ বিবাহ্যা বা বিবাহ-যোগ্যা। শাস্ত্রানুসারে যে যাহাকে বিবাহ করিতে না পারে যদি সে তাহাকে বিবাহ করে তবে তথায় অবেদ্যা-বেদন ঘটিল এরূপ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কেহ সগোত্রা ও সপিণ্ডা কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিবে না। এবং শাস্ত্রে ইহাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে "নাধমঃ পূর্ব্ব বর্ণজ্ঞাং" অর্থাৎ অধম বর্ণ কখনই উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। মনে কর ক ব্রাহ্মণ খ ও ব্রাহ্মণ কন্যা এবং ক, খ এর খুড়াত, মামাত, মাসতাত বা পিসতাত ভাই; যদি এরূপ স্থলে উভয়ের বিবাহ হয় তাহা হইলে তদুভয়ের প্রসূতিগণও বর্ণসঙ্কর হইবে। কেননা ক আপন সগোত্রা বা সপিণ্ডা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া শাস্ত্রের প্রতিকূলতা করিয়াছে। খ কিন্তুতেই তাহার বেদ্যা নহে। আবার ক যদি ক্ষত্রিয় ও খ যদি ব্রাহ্মণ কন্যা হয়, তবে তাহাদের বিবাহ হইয়া গ এর উৎপত্তি হইলেও গ বর্ণ সাঙ্কর্য্য হইতে নিরাকৃত হইতে পারিবে না। কেননা ব্রাহ্মণ কন্যা ক্ষত্রিয়ের বেদ্যা নহে। এখানে অবেদ্যাবেদনহেতু গ নির্ব্যূঢ় বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য হইতেছে।

কিন্তু ক যদি ব্রাহ্মণ ও খ যদি বৈশ্য কন্যা হয় এবং ক যদি খ কে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করে; তবে তাহাদিগের প্রসূতি অম্বষ্ঠ গ বর্ণ-সঙ্কর হইবে না, কেননা ইহা অবেদ্যাবেদন হয় নাই। ব্রাহ্মণ চারিবর্ণের

কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন ও করিতেন, তাহা শাস্ত্রেই বিবৃত রহিয়াছে? অতএব ব্যভিচার ও অবেদ্যাবেদন উৎপত্তিগত এই দুইটী কারণের একটীও অম্বষ্ঠের নিদান না হওয়াতে অম্বষ্ঠ গ বর্ণ সঙ্কর শব্দের বিষয়ীভূত হইতেছে না।

অতএব পাঠক, দুই বর্ণের সমবায় হইলেই অর্থাৎ মানুষ Mixed caste হইলেই যে বর্ণসঙ্কর হইবে, তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভ্রমাত্মক হইতেছে। বর্ণসঙ্কর ও Mixed caste কখনই একার্থবাচী নহে। অম্বষ্ঠ একতর Mixed caste বা মিশ্রবর্ণ বটে, কিন্তু সে বর্ণসঙ্কর হইবে না কেননা সে যেমন ব্যভিচার জাত নয়, তেমনই অবেদ্যাবেদনজও নয়। ঐ কারণে কোন বৈধ অনুলোমজ সন্তানই বর্ণসঙ্কর সংজ্ঞার অন্তর্নিবিষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রতিলোমজগণ (সূত মাগধাদি) অবেদ্যাবেদনজ, সুতরাং তাহারাই নির্ব্যূঢ় বর্ণসঙ্কর পদ বাচ্য। মহর্ষি নারদও তদীয় সংহিতায় বলিয়াছেন:—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম, সংজ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥

অতএব পাঠক দ্বিবর্ণসম্ভূত হইলেই সে বর্ণসঙ্কর হইবে, বোধহয় তুমি এ জ্বলন্ত ভ্রম আর কখনই হৃদয়ে পোষণ করিবে না। পরন্তু ব্যভিচার ও অবেদ্যাবেদন ঘটিলে যে এক বর্ণেই বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিতে পারে বোধহয় তাহাও তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে। সত্যবটে কোন কোন গ্রন্থকার সঙ্কর শব্দ মিশ্রণ ও সঙ্কীর্ণ শব্দ মিশ্রিতার্থে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু উহা সাধীয়ান্ প্রয়োগ নহে। তাঁহারা কোন প্রামাণ্য শাস্ত্র বা কোষ হইতে স্বমত সমর্থন করিতে পারিবেন না। অমরকোষে অমর যে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে সঙ্কীর্ণ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহা তাঁহার সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা ব্যামোহ মাত্র।

অষ্টমূর্ত্তি।

ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ, পৃথিবীর অদ্বিতীয় কবি, সুপ্রসিদ্ধ নাটক প্রণেতা মহাকবি কালিদাস স্বরচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নামক অলৌকিক নাটকের প্রারম্ভে অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি কামনায় ইষ্টদেব স্বরূপে মহাকাল শিবের বন্দনা করিয়া শ্রোতৃ পাঠক এবং অভিনয় দর্শক ব্যক্তি-বর্গকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদের শ্লোকটী এই:—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যাচ হোত্রী,
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ।
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতুবস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

অর্থাৎ—যাহার জলময়ী মূর্ত্তি স্রষ্টার আদ্যা সৃষ্টি, যিনি হোমে প্রদত্ত হবিঃ অনলময়ী মূর্ত্তিতে গ্রহণ করেন, যিনি যজমান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হোম সম্পাদন করিয়া থাকেন, যিনি দিবস ও রজনী এই দুই কালকে সূর্য্যময়ী ও চন্দ্রময়ী মূর্ত্তিদ্বারা বিভক্ত ও পরিব্যক্ত করিতেছেন, শ্রুতি বিষয় সংসাধন জন্য আকাশমূর্ত্তিতে যিনি বিরাজমান, যিনি সর্ব্ব বীজের প্রকৃতি স্বরূপা ধরাময়ী মূর্ত্তিতে পরিলক্ষিত, যিনি বায়ু মূর্ত্তি দ্বারা নিয়ত প্রবাহিত হইয়া প্রাণীদিগের জীবনরক্ষা করিতেছেন, এই সর্ব্বজন পরিদৃশ্যমানা প্রত্যক্ষরূপা অষ্টমূর্ত্তিতে যাঁহার মূর্ত্তি নিরন্তর বিকাশিত, সেই পরমদেব তোমাদের মঙ্গল বিধান করিয়া রক্ষা করুন।

কালিদাস সর্ব্বজন পরিচিত শিবের যে অষ্টমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা শৈব মাত্রেরই নিত্য পূজনীয়। শিবোপাসকগণ শিবপূজার সময় মহাদেবের এই অষ্ট মূর্ত্তির পূজাই করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিবেত্তা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নিজ সংকলিত আহ্নিক তত্ত্বের মধ্যে শিবপূজা প্রকরণে শিবের এই অষ্টমূর্ত্তির নিম্নোক্তমতে উল্লেখ করিয়া শিব ভক্তের ভক্তিপূজার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছেন:—

"সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ ॥"

ভক্তপ্রবর পুষ্পদন্ত তাঁহার অদ্ভুত স্তুতিচ্ছলে 'মহিম্নঃস্তব' নামক সুবিখ্যাত স্তবমধ্যে এই অষ্টমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে শিবকে প্রণাম করিয়াছেন :—

ভবঃ শর্ব্বোরুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ মহমহান্,
তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টক মিদং।
অমুস্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেবশ্রুতিরপি,
প্রিয়ায়াস্মৈ নাম্নে প্রণিহিত নমস্যোস্মি ভবতে ॥

অর্থাৎ, হে দেব! ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য এবং যজমান এই অষ্টমূর্ত্তি প্রতিপাদক ভব, শর্ব্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম ও ঈশান এই নামাষ্টকের একটী নামও শ্রবণের জন্য দেবগণের শ্রুতি অথবা শ্রুতি (বেদ) ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। প্রভো তুমি এই প্রিয় নামাষ্টকের প্রতিপাদ্য, তোমাকে আমি মনের মত করিয়া বার বার প্রণাম করিতেছি ॥

শিবের অষ্টমূর্ত্তির কথা শুনিয়া অনেকে হয় ত বলিবেন, যাঁহারা অন্য দেবদেবীর উপাসক, তাঁহাদের জন্য কোন অষ্টমূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা করা হয় নাই। যাঁহারা নিত্য পূজা করিয়া থাকেন, যাঁহারা ইষ্টদেবের মূর্ত্তিতত্ত্ব ও পূজার প্রণালী পদ্ধতি রীতিমত চিন্তাকরিয়া দেখিয়াছেন এবং যাঁহারা পূজার ধ্যান, মন্ত্র মাত্র না শিখিয়া পূজার প্রকরণ পদ্ধতির সারমর্ম্ম অবগত হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন, সেই সকল সাধক, উপাসক ও দেবদেবীপূজকদিগকে একবার স্থিরভাবে ধীরচিত্তে অষ্টমূর্ত্তিতত্ত্ব ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এ তত্ত্ব ভাবিয়া দেখিয়া বুঝিবার বিষয়, কথার কথা নয়। যিনি নিয়তকাল বিশ্বব্যাপিনী

মূর্ত্তিতে বিরাজমান, অষ্টমূর্ত্তিময়ী মূর্ত্তিদ্বারা তাঁহাকে আরাধনা, অর্চ্চনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনার বিষয় নয় কি? কিন্তু এই অষ্টমূর্ত্তিতত্ত্বও পর্য্যালোচনার বিষয়। অতএব আমরা সাধারণ পাঠকবর্গের উপাসনা তত্ত্বের আনুকূল্য-বিধানার্থ অষ্টমূর্ত্তির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সকল পূজার প্রারম্ভে পঞ্চদেবতার, নবগ্রহের ও দিক্‌পালদিগের পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নবগ্রহের আদিগ্রহ আদিত্য পঞ্চদেবতার অন্তর্গত। আবার সূর্য্যকে মধ্যস্থ বা কেন্দ্রস্থ করিয়া অপর গ্রহগুলিকে অষ্টদিকে সাজাইলে আমরা সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু এই অষ্টগ্রহকে অষ্টদিকে দেখিতে পাই, সুতরাং এখানিও অষ্টমূর্ত্তি অষ্টগ্রহরূপে বিরাজমানা। আবার দিক্‌পালগণের সংস্থান দেখুন। অমরকোষে লিখিত আছে—

ইন্দ্রোবহ্নিঃ পিতৃপতি র্নৈর্ঋতোবরুণো মরুৎ।
কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে বহ্নি, দক্ষিণে পিতৃপতি (যম) নৈর্ঋতকোণে নৈর্ঋত, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে পবন, উত্তরদিকে কুবের এবং ঈশানকোণে ঈশান (শিব?) এই অষ্টমূর্ত্তিতে অষ্টদিক্‌পাল অষ্টদিকে পূজনীয়।

দুর্গাপূজার সময় দুর্গাদেবীর অষ্টমূর্ত্তির (অষ্ট শক্তির) অর্চ্চনা করিবার বিধি আছে। দুর্গার ধ্যানেই আছে :—

"উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাচ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥"

অর্থাৎ উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা এবং অতিচণ্ডিকা এই আটটী শক্তি নিরন্তর দেবীকে পরি-

বেষ্টন করিয়া আছেন; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিধানকর্ত্রী, বিশ্বধাত্রী দুর্গাদেবীকে এইরূপে চিন্তা করিবে।

সরস্বতী পূজার পর তাঁহাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রার্থনা করিতে হয়;

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্ম্মাং সরস্বতি!

অর্থাৎ লক্ষ্মী, মেধা, ধরা পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা এবং ধৃতি এই অষ্টমূর্ত্তিদ্বারা হে সরস্বতি! আমাকে নিরন্তর রক্ষা কর।

কালীপূজার অবসানে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহার এই অষ্টভৈরবের পূজার ব্যবস্থা আছে।

মনসা পূজার শেষে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীরব, কর্কট ও শঙ্খ এই অষ্টনাগের পূজার বিধি আছে।

এই সকল অষ্টশক্তি বা অষ্টমূর্ত্তি উপাসকগণের চিন্তনীয় বিষয়। কারণ এই সকল মূর্ত্তিদ্বারা উপাস্য দেবদেবীগণ নিয়ত পরিবেষ্টিত।

এখন একবার বাসুদেবের এবং শ্রীকৃষ্ণের অষ্টশক্তির বা অষ্টমূর্ত্তিময়ী মহাশক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ অষ্টশক্তিদ্বারা নিয়ত বেষ্টিত। তাঁহার ধ্যানের তত্ত্ব আমরা পরে আলোচনা করিব। এখন একবার পাঠককে তাঁহার অন্য সময়ের অন্য ভাবের অন্য অবস্থার কথা ভাবিতে অনুরোধ করি। বিষয়টী নূতন নহে, কিন্তু ইহাতে যে অষ্টশক্তির তত্ত্ব আছে অন্ততঃ অনেকের নিকট তাহা অপরিজ্ঞাত, সুতরাং নূতন বলিয়া বোধ হইবে।

অক্রূর পরম ভক্ত, অদ্ভুত বৈষ্ণব। তিনি কংসের আদেশে নন্দালয়ে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবলরামকে নিজ রথে লইয়া আসিতেছেন। যমুনাতীরে রথ আসিলে তিনি কৃষ্ণবলরামকে রথে রাখিয়া অবগাহনার্থ যমুনার জলে অবতরণ করিলেন। জলে মস্তক নিমজ্জনপূর্ব্বক তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, আবার মস্তক উত্তোলন করিলে

রথোপরিস্থ ঐ দুই মূর্ত্তিই দেখিতে পাইলেন। তখন অক্রূর অপূর্ব্ব বিস্ময়রসে আপ্লুতহৃদয় হইয়া ভক্তিভরে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবটী বৃহৎ আমরা তাহার কয়েকটী শ্লোকমাত্র তুলিয়া দিলাম যিনি সম্পূর্ণ স্তবটী দেখিতে, পড়িতে বা জানিতে উৎসুক, তিনি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দশমস্কন্ধের, ৪০ চল্লিশ অধ্যায় পাঠ করিবেন। অক্রূর বলিতেছেন;—

একেত্বাখিলকর্ম্মাণি সংন্যস্যোপশমংগতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্॥
অন্যেচ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥
সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥
যথা দ্রি প্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যা পূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥

বঙ্গানুবাদঃ—কতকগুলি জ্ঞানিলোক, সকল কর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক পরম শান্তিলাভ করিয়া জ্ঞানযজ্ঞেরদ্বারা তোমার জ্ঞানময়ী মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন।

অপর কতকগুলি লোক আত্মসংস্কার সাধন করিয়া তোমার স্বরূপ ভাবিয়া বেদোক্ত বিধিদ্বারা বহুমূর্ত্তি বিশিষ্ট তোমার এক মূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন। হে প্রভো! অন্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া যদিও কেহ কেহ অন্য দেবতার ভক্ত হয়, সে সকল ব্যক্তিও হে সর্ব্বদেবময়েশ্বর, তোমাকেই পূজা করিয়া থাকে।

নদী সকল যেমন পর্ব্বত নিঃসৃত হইয়া বৃষ্টির জলে বর্দ্ধিতায়তনা হইয়াও মহাসাগরে প্রবেশ করে, হে প্রভো! অন্তকালে সেইরূপ সকলে তোমাতেই চরমগতি প্রাপ্ত হয়।

স্তবের শেষে অক্রূর প্রণাম করিয়া বলিতেছেন;—

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে।
পুরুষেশ প্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ॥

অর্থাৎ হে বিজ্ঞানস্বরূপ হে সর্ব্ববিশ্বাসের কারণ, হে সর্ব্বপুরুষশ্রেষ্ঠ, হে অনন্তশক্তি, হে ব্রহ্মন্—তোমাকে নমস্কার ॥

অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণের দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করেন তখন শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, (বাণী) কান্তি. কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, ঊর্জ্জা এই অষ্টশক্তিদ্বারা তিনি নিষেবিত হইতেছিলেন এবং প্রহ্লাদ, নারদ প্রভৃতি ভাগবতোত্তম ভক্তগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল শক্তির প্রধানা শক্তি শ্রীমতি রাধিকা দেবী। তাঁহার সখী ও মঞ্জরীর সংখ্যা নির্দ্ধারণেও আমরা অষ্টশক্তির বা অষ্টমূর্ত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই অষ্টমূর্ত্তি এখানে অষ্টসখী নামে অভিহিত।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার এই যুগল মূর্ত্তির উপাসক, তাঁহারা বুঝিবেন যে অষ্টদল পদ্মে অষ্টসখী অষ্টমঞ্জরীর সহিত বিরাজমান। পদ্ম কর্ণিকার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা যুগলরূপে সাধকের হৃদয় আলো করিবার জন্য পূজনীয়। কোন্ দলে কোন্ সখীর অবস্থান তাহা নিম্নে লিখিত হইল ;—

১ম দলে	ললিতা সখী	শ্রীরূপমঞ্জরী।
২য় দলে	বিশাখা ...	রসমঞ্জরী।
৩য় দলে	চিত্রা ...	লবঙ্গমঞ্জরী।
৪র্থ দলে	চম্পকলতা...	কস্তূরীমঞ্জরী।
৫ম দলে	রঙ্গদেবী ...	মঞ্জুনালীমঞ্জরী।
৬ষ্ঠ দলে	সুদেবী ...	গুণমঞ্জরী।
৭ম দলে	তুঙ্গবিদ্যা ...	রতিমঞ্জরী।
৮ম দলে	ইন্দুরেখা ...	বিলাসমঞ্জরী।

অষ্টদলে অষ্টসখী প্রধান সাধিকা।
পদ্মমধ্যে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণরাধিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় এই অষ্টসখীর সেবা ও তাহাদের কার্য্যালোচনা উপাসনা তত্ত্বের প্রধান সহায়। উপাসকগণ এই তত্ত্ব অবগত হইলেই তাহার মর্ম্ম জ্ঞানে নৈপুণ্য লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলাতেও অষ্টমহিষী সর্ব্বজন পরিচিতা। শ্রীবাসুদেবধ্যানেও আমরা দেখিতে পাই ঃ—

রুক্মিণী সত্যভামে দ্বে মূর্দ্ধ্নি রত্নৌঘধারয়া।
সিঞ্চন্ত্যৌ দক্ষবামস্থে স্বদোঃস্থ কলসোত্থয়া।
নাগ্নজিতী সুনন্দা চ দিশন্ত্যৌ কলসৌ তয়োঃ।
তাভ্যাঞ্চ দক্ষবামস্থে মিত্রবিন্দা সুলক্ষণে।
রত্ননদ্যোঃ সমুদ্ধৃত্য রত্নপূর্ণৌ ঘটৌ তয়োঃ।
জাম্ববতী সুশীলা চ দিশন্ত্যৌ দক্ষবামকে ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রুক্মিণী ও সত্যভামা দক্ষিণ ও বামভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বহস্তধৃত কলসোত্থিত রত্নধারায় (সেই বাসুদেবের) মস্তকে অভিষেক করিতেছেন। নাগ্নজিতী ও সুনন্দা নাম্নী রমণী কলস প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদিগের দক্ষিণ ও বামভাগে মিত্রবিন্দা ও সুলক্ষণা নামে দুই রমণী রত্ননদী হইতে রত্ন উদ্ধার করিয়া ঘটদ্বয় পূর্ণ করিতেছেন জাম্ববতী ও সুশীলা নামে রমণীদ্বয় দক্ষিণ ও বামভাগে স্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আদেশ করিতেছেন।

আমরা অষ্টমূর্ত্তি পূজার অবতারণা করিয়া বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার, অষ্টশক্তি পূজার বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ করিলাম। দেবদেবীগণ অষ্টশক্তিতে পরিবেষ্টিত তাহাও প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করি নাই। এক্ষণে উপাসক, সাধক এবং পূজক ব্যক্তিদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যার্থ আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। সকল উপাসনা সকল সাধনা ও সকল আরাধনার মূল উদ্দেশ্য ও চরমলক্ষ্য একমাত্র চিত্তশুদ্ধি। চিত্তবৃত্তিনিরোধকে যোগ বলিয়া যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত

হইয়াছে। এই যোগের অঙ্গ আটটী। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই অষ্টাঙ্গযোগ সাধন হইলে যোগেশ্বরকে লাভ করা যায়। যেমন অষ্টদলে অষ্টশক্তি কর্ণিকার মধ্যে ধ্যেয়, ঈশ্বর তেমনই অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যস্থ যোগপীঠে যোগেশ্বর। অতএব এই অষ্টাঙ্গযোগ সাধনে কৃতার্থ হওয়াই অষ্টমূর্ত্তি পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য ও সার তত্ত্ব। অনুসন্ধিৎসু সাধকগণ মূলতত্ত্বের সহিত এসকল বাহ্য তত্ত্বের সামঞ্জস্য মিলাইয়া লইবেন। অন্যান্য তত্ত্বের গোল মিটিলেই মূলাধারে মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। আমরা কেবল তত্ত্বকথা আলোচনার নিমিত্তই এতকথা বলিলাম।

আলোচনা।

সত্যোদ্ধার, কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং কুসংস্কারাদি সামাজিক কলঙ্কাপনয়নপ্রভৃতির জন্য আলোচনা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। আলোচনার সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষ একাকী এই সকলের একটী সামান্যকার্য্যও সুসম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না। জগতের ইতিহাস গাঢ় মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে এবং সমসাময়িক সমাজ ও লোকচরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, ভ্রমপ্রমাদ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং একান্ত অপরিহার্য্য। অলৌকিক মেধা ও প্রখরা ধীশক্তির প্রভাবে যাঁহাদিগের নাম অদ্যাপি আমাদিগের হৃদয়ে দেদীপ্যমান আছে, সেই প্রাতঃস্মরণীয় শঙ্করাচার্য্য, সক্রেটীশ, নিউটন, হাক্সলী, হেল্‌ম্‌হোল্‌টজ্‌ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের জীবনী আলোচনা করিলে আলোচনার মহিমা ও উপকারিতা ক্রমেই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সক্রেটীশ যদি নিজকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন

তাহাহইলে তিনি কখনই জিম্নেশিয়াম্‌, এরিওপেগাস্‌ প্রভৃতি জনতাপূর্ণ স্থানে তত্ত্বালোচনার জন্য পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেন না। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যে প্রবল আলোচনাস্পৃহা প্রণোদিত হইয়াই দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ বয়স মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং আধুনিক বিদ্বন্মণ্ডলীর শিরোমণি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হাক্সলি যে আলোচনাকেই জীবনের এক প্রধান অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা তৎতৎচরিত পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ধীশক্তি প্রখরাই হউক আর প্রভূত পর্য্যবেক্ষণশক্তিই বিদ্যমান থাকুক, তৎসঙ্গে সঙ্গে যদি আলোচনা-স্পৃহা না থাকে তাহা হইলে তৎপ্রসূত বহুগবেষণাসম্ভূত সিদ্ধান্তও যে জনসমাজে অবধীরিত হইবে তাহা একপ্রকার অবধারিত। মানব-প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা অর্থাৎ এথ্‌নোলজির একপ্রকার জন্মদাতা জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত যোহন্‌ব্লুমেনবেকের ককেশিয়ান্‌ জাতির প্রাধান্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত স্মরণ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে যদি তিনি উক্ত বিষয়ে তৎসমসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিতগণের কিঞ্চিন্মাত্রও আলোচনা করিতেন তাহা হইলে তিনি কখনই ককেশিয়ান্‌ দিগকে মানবজাতির চূড়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। পণ্ডিত ডারুইনের জগতের ক্রমবিকাশ বিষয়ক সিদ্ধান্ত যে আজও নিউটন আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের ন্যায় সংশয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে পরিণত হইতে পারে নাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাদৃশ বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্তকে সংশয়ের সীমা অতিক্রম করাইয়া স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত করিতে হইলে যাদৃশী আলোচনা আবশ্যক তাহার শতাংশের একাংশও একাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং তাহা যে অদ্যাপি সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই—তাহা যে আজও বিজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, পরন্তু তাহাকে যে আজও অনেকে কবিহৃদয়সুলভ কল্পনাপ্রসূত বলিয়া অনুমান করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ও

থাকিতে পারে ?

ভুলভ্রান্তির প্রসার সংকীর্ণ করিয়া কোনও বিষয়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ ও সত্যোদ্ধারের পন্থা সহজ করিয়া আনিতে আলোচনা যাদৃশী পটু—বিস্মৃতির ঘন ঘন আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া হৃদয়মনকে সর্ব্বদা সুচিন্তা ও সুমতির শুভ্র আলোকে উজ্জ্বল রাখিতে আলোচনা যাদৃশী ফলবতী এবং অতি দুর্গম যে জীবনপথ তাহার সম্মুখ হইতে সংশয় অবিশ্বাস ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত করিয়া মানবকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে আলোচনা যেরূপ সহায় এমন আর কিছুই নহে। প্রদীপ্ত হুতাশন যদ্রূপ আকরোত্থাপিত স্বর্ণকে বারম্বার দগ্ধ করিয়া তাহাকে উজ্জ্বলও নির্ম্মল করিয়া তোলে, আলোচনাও তদ্রূপ স্বয়ং নির্ণীত অনুমানকে ভুলভ্রান্তির মলিনতা হইতে বিমুক্ত করিয়া পরিশেষে তাহার উজ্জ্বল আলোকে আমাদিগের হৃদয়কে সংস্কৃত ও প্রফুল্ল করিয়া থাকে। এই জন্যই যে জীবনে আলোচনার বাহুল্য বিদ্যমান, যে সমাজে আলোচনার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যে জাতির মধ্যে আলোচনার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধ, সেই জাতির—সেই সমাজের—সেই জীবনের এত উন্নতি, এত গৌরব। ধনগর্ব্বিত ফিনিক্‌জাতি চিরকালের তরে পৃথিবী হইবে অন্তর্হিত হইয়াছে। বাহুবলদৃপ্ত রোমানজাতিও পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহা সুনিশ্চয়, যাবৎ আলোচনা বিদ্যমান থাকিবে তাবৎ ইংলণ্ডের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইংলণ্ড বুঝিয়াছে আলোচনা ব্যতিরেকে উন্নতি অসম্ভব, জাতীয় জীবন অসম্ভব, তাই তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলোচনা প্রবেশ করিয়াছে। সেই জন্যই রয়েল সোশায়িটীর সৃষ্টি, পার্লেমেণ্ট মহাসভার মন্ত্রণা এবং বৎসর বৎসর ওরিয়েণ্টেল, মেডিকেল প্রভৃতি কংগ্রেসের অধিষ্ঠান। ভারতেরও যে দিন সুদিন ছিল, যে সময়ে ভারতীয় দার্শনিক ও ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌বর্গের জ্ঞানপ্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত ছিল সেই সুসময়ে, সেই সুদিনে ভারতেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলোচনা

প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তখন পর্ণকুটীরবাসী দীনদরিদ্র ঋষির আশ্রম হইতে নৃপতির স্বর্ণ সিংহাসন পর্য্যন্ত "আসিন্ধু ব্রহ্মপুত্রাচ আহিমাদ্রি কুমারিকা" আলোচনার প্রসার বিস্তৃত হইয়াছিল সেই সুদিনে ক্ষীণ-কল্মষ তীব্রতপা ঋষিগণ অমৃতের অভিলাষী হইয়া। পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া পুণ্যসলিলা জাহ্নবী সরযূ সরস্বতীর তীরে তীরে যেরূপ প্রমত্তভাবে ব্রহ্মজ্ঞানালোচনায় অহোরাত্র অতিবাহিত করিতেন সেই প্রমত্ত আলোচনা, সেই অনুশীলন, সেই চর্চ্চা, কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

ধর্ম্মই বল আর রাজনীতিই বল, সাহিত্যই বল আর বিজ্ঞানই বল, সর্ব্ব শাস্ত্রেই আলোচনার প্রয়োজন। আলোচনা ব্যতিরেকে ইহাদিগের কোন একটীও প্রসারলাভ করিতে পারে না। আলোচনা স্থগিত হইলেই ধর্ম্ম কুধর্ম্মে পরিণত হয়, রাজনীতি কুনীতিতে পরিবর্ত্তিত হয় এবং বিজ্ঞান কুজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। জগতের ইতিহাস এই অভ্রান্ত সত্যের নিদর্শন প্রতিনিয়ত প্রচার করিতেছে। পৃথিবীর কুধর্ম্ম, পৃথিবীর কুনীতি, পৃথিবীর কুজ্ঞান, আলোচনার অন্তর্দ্ধানেরই ফল মাত্র।

বিদ্যাবর্দ্ধনের জন্য যদ্রূপ অধ্যয়ন আবশ্যক, জ্ঞান প্রসারের জন্য যদ্রূপ বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক, অভিজ্ঞতা বর্দ্ধনের জন্যও তদ্রূপ আলোচনা আবশ্যক। পর্য্যবেক্ষণ ও বহুদর্শনদ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হয় বটে, কিন্তু সেই পর্য্যবেক্ষণ ও বহুদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতার সীমা দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্রের ন্যায় বিস্তারিত করিতে হইলে আলোচনা ঐকান্তিক ভাবে প্রয়োজনীয়। মানব একাকী কত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে ? যদি সেই পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদীয় অভিজ্ঞতা সংযোজিত না হয় তবে তাদৃশী অভিজ্ঞতার সীমা যে কূপ-মণ্ডূকের অভিজ্ঞতার ন্যায় সঙ্কীর্ণ হইবে এবং তাহা যে অভিজ্ঞতা নামের একান্ত অযোগ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

শুধু তাহাই নহে। একাকী অভিজ্ঞ হইয়াও কোন ফল নাই। যাহাদিগের সহিত নিরন্তর একত্র অবস্থান করিতে হইবে, যাহাদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র কার্য্যকরিতে হইবে সেই বন্ধু-বান্ধব সেই স্বদেশ বাসী ভ্রাতৃবৃন্দ যদি অনভিজ্ঞ রহিল তবে আমি একাকী অভিজ্ঞতা লইয়া কি করিব? সুতরাং যাহাতে তাহারাও সকলে অভিজ্ঞ হইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগের সহিত বারম্বার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বারম্বার আলোচনার ফলে তাহাদিগের কিয়ৎপরিমাণে হইলেও অভিজ্ঞতা জন্মিবে। এই জন্যই আমরা প্রচলিত—

"আবৃত্তিঃ সর্ব্ব শাস্ত্রাণাম্ বোধাদপি গরিয়সী"

এই বাক্য হইতে একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই—

"আলোচনা সর্ব্ব শাস্ত্রাণাম্ আবৃত্তেরপি গরিয়সী"

যেহেতু আবৃত্তি কেবল আবৃত্তিকারীর জ্ঞান মার্জ্জিত করে, কিন্তু আলোচনা জন সাধারণের অভিজ্ঞতা বর্দ্ধন করে। সূক্ষ্মদর্শী অশেষ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বেকন বলিয়া গিয়াছেন "We may grow wiser by an hour's talk than by a day's meditation" বাস্তবিক এক ঘণ্টার আলোচনা আমাদিগকে সমস্তদিনব্যাপী চিন্তা অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ করে।

যদি আমরা প্রকৃতই নিজকে উন্নত করিতে চাই এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে ও স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে স্বীয় পাণ্ডিত্যের ফল-ভোগী করিতে চাই তবে পাণ্ডিত্যাভিমান পরিহার পূর্ব্বক যথার্থ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত মূর্খ সকলের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। যদি লুপ্তশ্রী, ভ্রষ্টগৌরব স্বজাতিবর্গের অদৃষ্ট গগণে সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে মেঘ-মুক্ত ভাস্করের ন্যায় পুনর্ব্বার চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাও, তবে যাহাতে স্বদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আবার আলোচনার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে পারে সর্ব্বাগ্রে তাহার উপায় অবলম্বন কর। যতদিন দেশে আলোচনা সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে, যতদিন

সকলে আলোচনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম না করিবে ততদিন—

তোমরা "আজও যে আঁধারে
কালও সে আঁধারে" ই থাকিবে।

শ্রীনীলাম্বর গুপ্ত।

আবাহন।

এস শক্তি প্রীতিময়ি, এস মা আমার!
এসেছে শরৎ অই, হের জলে থই থই,
ফুটেছে অমল কত কমল কহ্লার!
ফুটেছে শেফালী রাশি, সে ত মা তোমারি হাসি
ছড়ায়ে রয়েছে ওই দেহে বসুধার!
চারু চন্দ্রাতপ তলে মণি মরকত জ্বলে
উজল হীরার ফুল শোভে তারকার।
তোমারি স্নেহের দিঠি, জ্বলে তায় মিটি মিটি
তোমারি লাবণ্যে মাখা দেহ চন্দ্রমার।
উষার কাঞ্চন কায়া তোমারিত প্রতিচ্ছায়া
মলয় মারুত বহে শুভ সমাচার।
তোমারি অমৃত গন্ধ ভাসে তায় মন্দ মন্দ
ও নহে সুরভিশ্বাস বন-বালিকার।
শ্যামল অঞ্চল মাঝে মমতা মুকুতা রাজে
নিশির শিশির রূপে মরি কি বাহার!
বিমল আনন্দধারা নদ নদী ভরা ভরা
কুলু কুলু হুলুধ্বনি দেয় অনিবার।
আরক্ত গোধূলি শিরে দিনমণি ডোবে ধীরে
তোরি বৈতালিক শুনি কণ্ঠে পাপিয়ার।

এস শক্তি প্রাণময়ি ! এস মা আমার !
দশ প্রহরণ করে, দশদিক আলো করে,
প্রকাশ আবার ওই মূর্ত্তি মহিমার।
গরজে কেশরী পদে উনমত্ত রণমদে
যেরূপে করিয়াছিলে অসুর সংহার।
জ্ঞান ধন দুই পাশে, ভাস্বর মোহন বেশে,
এস লয়ে সেনাপতি কার্ত্তিক কুমার।
সিদ্ধিদাতা মহামতি, আন মা সে গণপতি ;
যে দেয় বাঞ্ছিত ফল সব সাধনার।

এস শক্তি প্রাণময়ি ! এস মা আমার !
হের মা ভারতবর্ষ নাহি সে উল্লাস হর্ষ
নয়নে ঝরিছে ধারা, মুখে হাহাকার !
সে শস্যশ্যামল দেশ দরিদ্রের একশেষ
দুই বেলা দুই মুঠা জোটেনা আহার।
কি কব দুঃখের কথা মহাশক্তিসুতসুতা
অশক্তের পূর্ণমূর্ত্তি অচল অসার।
নাহি মা এমন শাক্ত নাহি মা এমন ভক্ত
যে দিবে হৃদয়রক্ত পূজায় তোমার।
সব মেদমাংসহীন কেবল কঙ্কাললীন।
ক্ষীণ সে ধমনী শিরা বহেনাকো আর।
নিনাদে রাক্ষস দ্বারে কি ভৈরব হুহুঙ্কারে
কালরূপী মহামারী ভীষণ আকার !
হায় সে করালগ্রাসে বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে
কত শত জনপদ হল ছারখার।

পাষাণি ! নয়ন বুজি দাঁড়ায়ে রহিবি বুঝি ?
নিদ্রাবিজড়িত নেত্র খোল একবার !
সন্তান যাহার মরে সে কি থাকে ঘুমঘোরে
এই কি গো নিদর্শন মায়ের মায়ার ?
দানবদলনীরূপে অবতীর্ণ হও ভবে
নাশ কর, আশু ওই দানব দুর্ব্বার !
নাশ মা বিয়োগ শোক, নাশ অনাহার দুঃখ
কর মাগো মৃতদেহে জীবন সঞ্চার।
শিখাও মা আরাধনা প্রাণ দিয়ে উপাসনা,
আবার সাধক সৃষ্টি কর মা তোমার।
উপাড়িতে নেত্র নীল গণিবে না এক তিল
সৃজন কর গো সেই বীর অযোধ্যার।
শিখাও কর্ত্তব্যজ্ঞান, হোক্ সবে মহাপ্রাণ
শক্তির সেবকে পূর্ণ কর মা সংসার।
মুখেতে অমৃত "ওম্", হৃদে বন্দে "মাতরম্"
উপরে অনন্ত ব্যোম দিগন্ত প্রসার।
সংকীর্ণতা যাক্ ঘুচে, অবসাদ যাক্ মুছে
দূরে যাক্ ভেদজ্ঞান পর আপনার !

এস দেবি মহাশক্তি ! এস মা আমার !
উজলি ত্রিদিব পথ ছুটাও কনক রথ
ভারতে বহিছে আজ আনন্দ অপার।
ও পবিত্র পদধূলি প্রতি শিরে দেহ ঢালি
পিয়াও অমৃতময়ি ! অমৃত আসার।
পল্লব মুকুলে ফুলে, স্থাপি কুম্ভ বিল্বমূলে
গায়িছে অযুত কণ্ঠ বোধন তোমার।

আনন্দে সকলে মিলি প্রচণ্ড খ[illegible] ডগ তুলি
নবমী পূজায় শত্রু করিব সংহার।
"রোগ-শোক-ভয়-ক্লেশাঃ" —হৃদয়ে প্রবল আ[illegible] শা—
নিপাতিত শত্রুশিরে দিব উপহার।
"ধনং দেহি রূপং দেহি জয়ং দেহি দ্বিষো জহি [illegible]দে
মাগিব অক্ষয় বর চরণে তোমার।
ভাই ভাই দিব কোল আনন্দেতে উতরোল
কি পবিত্র পুণ্যদিন প্রেম বিজয়ার!
আর না করিব দ্বেষ হিংসা অসূয়া লেশ
তোমারি অঞ্চল ধরি হব আগুসার।
ধন ধান্যে বসুন্ধরা আবার হইবে ভরা
ও পদপঙ্কজে মতি হোক্ সবাকার।
প্রীতিময়ি! প্রাণময়ি! এস মা আমার।

শ্রীমনোমোহন সেন।

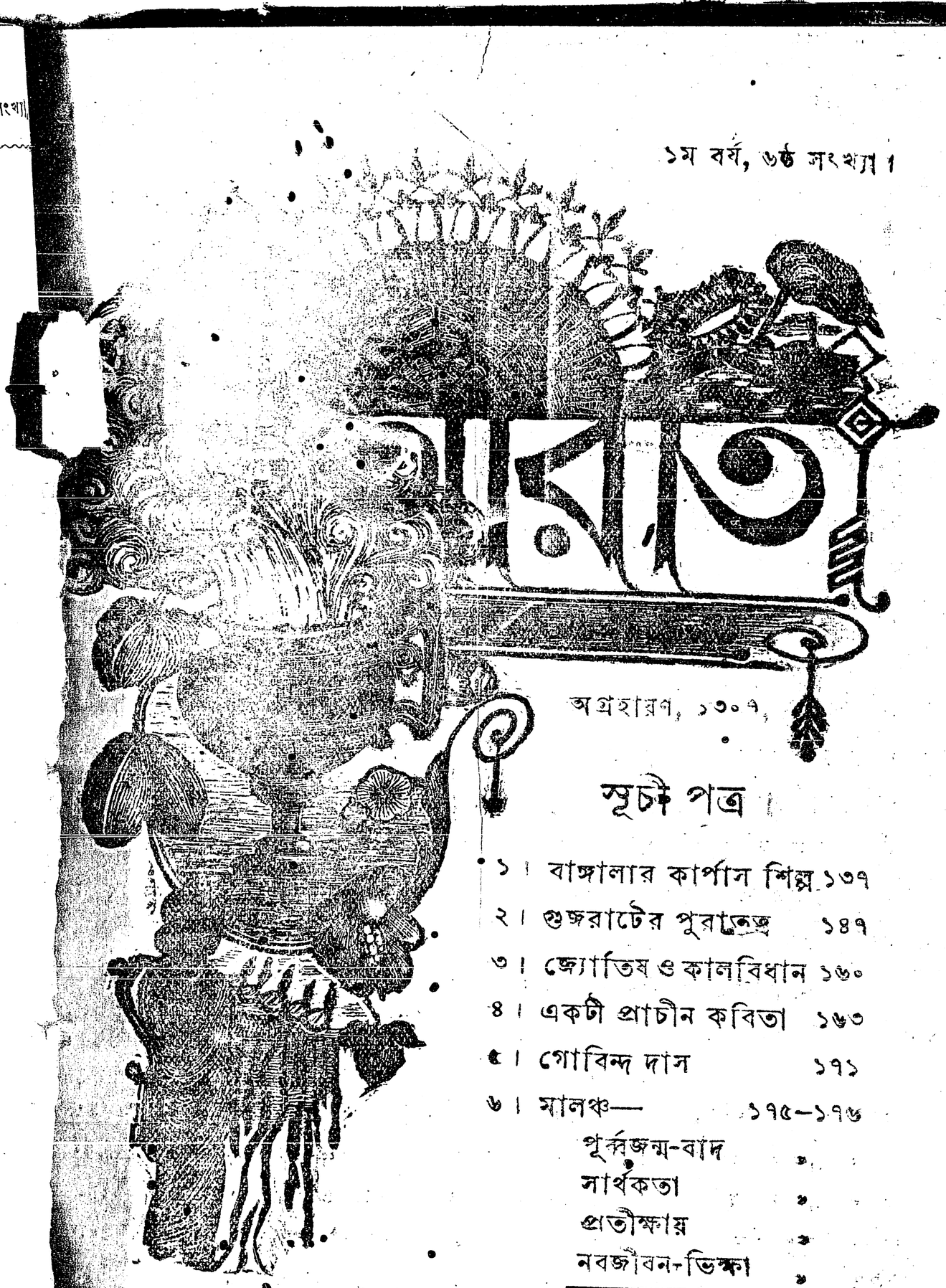

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

সূচীপত্র।

১। বাঙ্গালার কার্পাস শিল্প ১৩৭
২। গুজরাটের পুরাতত্ত্ব ১৪৭
৩। জ্যোতিষ ও কালবিধান ১৬০
৪। একটী প্রাচীন কবিতা ১৬৩
৫। গোবিন্দ দাস ১৭১
৬। মালঞ্চ— ১৭৫—১৭৬
পূর্ব্বজন্ম-বাদ
সার্থকতা
প্রতীক্ষায়
নবজীবন-ভিক্ষা

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ময়মনসিংহ বাসন্তী যন্ত্রে—শ্রীরামচন্দ্র অনন্তদ্বারা মুদ্রিত।
বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৸০ দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা ৵০ তিন আনা।

এই সংখ্যার লে

৺ত্রৈলোকানাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, শ্রীযু
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু,
মতী কনকাঞ্জলী রচয়িত্রী, শ্রীযুক্ত মনোমে

—o—

কার্য্যাধ্যক্ষের

আরতি ৬ষ্ঠ মাস অতিক্রম ক
মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগে
হইবে। সহৃদয় গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব
করিবেন। ভিঃ পিঃ করিয়া প্রেরণে
ভোগ করিতে হইবে না বলিয়াই এর

আমরা গভীর শোকসন্তপ্তহৃদ
শ্রদ্ধেয় লেখক, মাতৃভাষার অকৃত্রিম
পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম
অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে
তাঁহার সংক্ষীপ্ত জীবনী প্রকাশিত
হওয়ায় এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

ভ্রম সংশোধন— ১৪০ পৃষ্ঠার ফুট

লেখকগণ—

ক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত——বি, এ,
শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
হুসেন, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নিবেদন—

রল। এপর্য্যন্তও যাঁহারা আরতির
আরতি ভিঃ পিঃ তে প্রেরিত
বক্স প্যাকেটগুলি রাখিয়া বাধিত
তাঁহাদের কোন ক্ষতি ও অসুবিধা
প করা হইল।

য়ে প্রকাশ করিতেছি যে আরতির
অনুরাগী, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্
-এ, বি-এল মহাশয় ১লা অগ্রহায়ণ
ন। আগামী সংখ্যা আরতিতে
ইবে। জীবনীটী অসময়ে হস্তগত
না। এই সংখ্যায় তাঁহার একটী

নোটে "আনিকগঞ্জ" স্থলে "মদনগঞ্জ" হইয়াছে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

১৭৯	বাবু কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী	১৷৷০
৩২৬	,, বিপিনচন্দ্র চৌধুরী	১৷৷০
১১৮	,, সারদাচরণ নিয়োগী	১৷৷০
১৭৮	শ্রীযুক্ত গুনু মিশ্র জমিদার	৩৲
১১২	বাবু কেদারনাথ চৌধুরী	১৷৷০
৮৮	,, হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৷৷০
৩০৯	,, মহেন্দ্রচন্দ্র বসু	১৷৷০
১৫৫	,, কালীসুন্দর মজুমদার	১৷৷০
৩৩৬	বাবু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৷৷০
৫৬	,, শ্রীমতী সরলাবালা সেনগুপ্তা	১৷৷০
২৬৭	,, রাজেন্দ্রকিশোর সোম	১৷৷০
৯১	,, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৷৷০
৩৪৩	,, কৃষ্ণনারায়ণ রায়	১৷৷০
৪০১	,, শ্রীশচন্দ্র রায়	১৷৷০
৭৬	,, বরদাকান্ত সরকার	১৷৷০
২০১	,, অশ্বিনীকুমার রায়	১৷৷০, ক্রমশ

বাঙ্গালার কার্পাসশিল্প।

—o—

অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্পাস ভারতবর্ষের সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। আমাদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় * এবং তন্ত্রে † ইহার বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই সময়েও কার্পাস সূত্র পাঁজিয়া ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞসূত্র প্রস্তুত হইত। তখন কার্পাসের প্রচুর চাষ হইত এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইত। মনুর পূর্ব্বেও যে ইহার প্রচলন ছিল না তাহা বলা যাইতে পারে না এবং তাহার প্রমাণ সংগ্রহও বোধ হয় আয়াসপ্রদ হইবে না; কারণ ঋগ্বেদে বস্ত্রবয়নের প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ‡ তখন স্ত্রীলোকেরা কার্পাস সূত্রদ্বারা তন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্রবয়ন করিতেন এবং সেই বস্ত্র সমগ্র সমাজের লজ্জা নিবারণ করিত।

অধঃপতিত অবস্থায় প্রাচীন গৌরব কাহিনীর আবৃত্তি করিয়া জগতের শ্রদ্ধা ও সম্মানলাভের প্রত্যাশা করিতে যাওয়া নিজ অক্ষমতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, হইলেও সে প্রাচীন গৌরব স্মৃতি হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। তাই বর্ত্তমানে তদ্বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কার্পাস একদিন ভারতবর্ষেরই সম্পত্তি ছিল। পাশ্চাত্য লেখক হেরোডোটাস্ পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে কার্পাস সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন। তিনি ভারতের কার্পাসক্ষেত্র দেখিয়া লিখিয়াছিলেন "ভারতীয় বৃক্ষসমূহ যেমন ফল প্রদান করিয়া থাকে তেমনি তুলাও

* কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ। ২। ৪৪ মনু
শতেদশ পল বৃদ্ধি রৌর্ণে কার্পাস সৌত্রিকে। ইত্যাদি ২। ১৮২ যাজ্ঞ

† কার্পাস সম্ভবং সূত্রং যজ্ঞসূত্রং বিনির্ম্মিতম্। তন্ত্র

‡ ঋক্‌বেদ ৩য় সূক্ত ৩৪ ঋক্ ২য় মণ্ডল।

প্রদান করে। সেই সমস্ত তুলা মেষলোম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষীয় নরনারী সেই সকল তুলাদ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।"*

খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হেরোডোটাস্ ভারতীয় কার্পাসের প্রশংসা গীতি গাহিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে নিয়ার্কাস্ ও খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে এরিয়ান্ ভারতবর্ষে আগমন করেন। হেরোডোটাসের ন্যায় তাঁহারাও ভারতীয় কার্পাস নির্ম্মিত পোষাক পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।† সেই সময় বরোচ, মসলিপটম্ কল্যাণ, ঢাকা শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল।‡ এমন কি তখন সমগ্র পৃথিবীর উপর ঢাকার তাঁত প্রাধান্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আরবীয়, আসিরীয় ও বেবিলনীয়গণ তখন ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের অনুকরণ করিতে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই বেবিলনীয়দিগের বাণিজ্যশ্রী প্রতীচ্যদেশ সমূহকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। তাঁহাদিগের শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ইউফ্রেটীস্ তীরস্থ আরিচ নগরের শিল্পনৈপুণ্য প্রতীচ্যদেশ সমূহের স্পর্দ্ধার বিষয় হইয়াছিল। সাময়িক প্রতিযোগিতা দেখাইয়া, আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে কোন লেখক আরিচের তাঁত ব্যবসায় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন— "ইউফ্রেটীস্ তীরস্থ আরিচের তাঁত ব্যবসায় মেঘনাতটস্থ ঢাকানগরীর ব্যবসায় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হইয়াছিল না।" §

কার্পাস ভারতের প্রাচীন সম্পত্তি এবং ঢাকার তাঁত ব্যবসায় একদিন সমগ্র পৃথিবীর উপর সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা প্রতীচ্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

* Dr Watt's Dictionary of Economic Products of India, Vol. II.

† Arrian's Indica translated by Mc. Crindle.

‡ Arrian's Periplus &c. translated by Mc. Crindle (The circumnavigation of the Erythræan Sea)

§ That the town of Arech on the Euphratis was no less celebrated for its looms than Dacca on the Megna ——— Calcutta Review no. XCII Page 398.

এরিয়ানের ভারতাগমনের পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতীয় কার্পাস ভারতবর্ষ হইতে পারস্য, আরব, ঈজিপ্ত প্রভৃতিস্থানে রপ্তানী হইতেছিল। আরবদিগের বাণিজ্যস্থান লোহিতসাগর-তীরস্থ আদুলী তখন ভারতীয় কার্পাসের রপ্তানীর প্রধান স্থান।* এরিয়ানের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ য়ুরোপে বিস্তৃত হয়। এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ য়ুরোপে কার্পাস শিল্পের সুন্দর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তাহার পর দক্ষিণ য়ুরোপ হইতে বিস্তৃতি লাভ করিয়া ক্রমে ভারতীয় শিল্পলক্ষ্মী সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে উপনীত হন

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে উপস্থিত করেন। তখন ভারতীয় কার্পাসবস্ত্র ইংলণ্ডীয় নরনারীর চক্ষে এতই আদরের জিনিস হইয়া উঠিল যে তাঁহারা দেশীয় পশমের জিনিস অবহেলা করিয়া ভারতীয় বস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এই ঘটনায় ইংলণ্ডে মহাহুলুস্থুল পড়িয়া গেল, মহাহুজুগে পার্লেমেণ্টের অধিবেশন হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বহুমূল্য পশমবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের আবাল বৃদ্ধবনিতা ভারতীয় কার্পাসবস্ত্রের আদর করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বদেশহিতৈষী নাগরিকগণ দেশীয় শিল্পের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া "The ancient trades decayed and repaired again" নামক পুস্তক ছাপিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত ডেঁফো প্রভৃতি ওজস্বিনী ভাষায় উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী লিখিয়া দেশীয় ভ্রাতা-ভগিনীর রুচি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল। অনন্যোপায় হইয়া তখন তাঁহারা রাজপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডীয় মহাসভা হইতে কড়াকড়ি আইন বাহির হইতে লাগিল। "যাহারা কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করিবে তাহাদিগকে ২০০ পাউণ্ড করিয়া

* Dr Vincent's translation of Pariplus &c.

অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইবে।" আইনের ভয়ে প্রকাশ্য ব্যবহার রহিত হইল বটে কিন্তু প্রচলন থামিল না। নিরুপায় হইয়া গভর্ণমেণ্টকে আইন তুলিয়া লইতে হইল। এবং কার্পাস ব্যবসায়ের প্রকাশ্য অনুমতি দিতে বাধ্য হইতে হইল।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্করাইট ব্যবসায়ের রাজদত্ত সনন্দ গ্রহণ করেন এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রেমটন সুতার কল আবিষ্কার করেন। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দী অতিবাহিত হইতে না হইতে সমগ্র য়ুরোপে তাহা সংক্রামিত হইয়া পড়িল। তাহার পর হইতে ইংলণ্ড ভারতের বস্ত্র যোগাইতেছেন। এবং বর্ত্তমানে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পড়িয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একবারে অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় বস্ত্রের তুলনায় স্বল্প মূল্যে সুন্দর বিলাতীবস্ত্র পাওয়া যায়, এমন স্থলে অধিক মূল্য দিয়া কেন জনসাধারণ দেশীয়বস্ত্র ক্রয় করিবে? দেশে প্রবল হুজুগ-স্রোত প্রবাহিত হইতে চলিল—দেশ অর্থ শূন্য, যাহা স্বল্প-অর্থ-লভ্য তাহাই গ্রহণীয়। দেশী যুগী, জোলার "ঠেঁটী" সস্তা বটে কিন্তু তাহাতে বাবুয়ানা চলে না। হুজুগের স্রোতে দেশী কারবারে হঠাৎ বাধা পড়িল। দেশীয় শিল্পশালায় হাহাকার রব উত্থিত হইল। ব্যবসায়িগণ সকলেই তাঁত গুটাইয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়া স্ত্রী, পুত্র, পরিজন প্রতিপালনের উপায় চিন্তায় বিব্রত হইল।

তাহার পর হইতে এই শতাধিক বৎসর যাবৎ ম্যানচেষ্টারের হস্তে ভারতবাসীর লজ্জা নিবারণের ভার পড়িয়াছে। এ দোষ ম্যানচেষ্টারের নহে, ভারতেরই। ভারতবাসী বিদেশীর হস্তে সে ভার রক্ষা করিয়া আজ শতবৎসর যাবৎ দেশীয় শিল্পের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকিলেও, সে আদিম ভিত্তি এখনও সম্পূর্ণরূপ ক্ষয়িতমূল হয় নাই। ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গার তাঁতিরা আজও পূর্ব্বগৌরব কতক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ রহিয়াছে। কিন্তু

কার্য্যের পুরস্কার মিলে কোথায়? দেশ অর্থশূন্য। সে মহার্ঘ জিনিস ক্রয় করিবার উপযুক্ত লোক কয়জন আছে? বহু আয়াস ও অর্থব্যয়ে দুই একখানা বস্ত্র প্রস্তুত হইলে, উপযুক্ত ক্রেতার অভাবে তাহা বিক্রীত হয় না। বৎসরাধিক রাখিয়া বিক্রয় করিলেও আসল টাকার সুদ পোষাইয়া উঠা দুষ্কর হইয়া উঠে। এক বৎসর কয়েকখানা বিক্রয় হইলে পর বৎসরেই দেখিতে দেখিতে তদনুকরণে বিলাতী বস্ত্রাবাস হইতে সহস্রখণ্ড সুলভ মূল্যের বস্ত্র বাহির হইয়া পড়ে। এদিকে দেশী বস্ত্র, ব্যবসায়ীর গৃহেই কীটদষ্ট হইয়া লয় পাইয়া যায়।

ঢাকার সেই চরমোৎকর্ষের সময়ে, এক দিকে চীন অন্য দিকে তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া এবং পারস্যের সহিত তাহার বিপুল বাণিজ্যের সম্বন্ধ সংস্থাপিত ছিল। আজ যাহার লজ্জানিবারণ কল্পে ম্যানচেষ্টার সহস্র অগ্নিকুণ্ডে ধূম উদ্গীরণ করিয়া ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের বিশ্বজনিনতা প্রতিপাদনে ব্যতিব্যস্ত, সেই ভারত—সেই ভারতের একটী ক্ষুদ্র পল্লী, (ঢাকা তখনও নগরে পরিণত হয় নাই) তখন সমগ্র পৃথিবীর পরিচ্ছদ যোগাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ঢাকার মসলিন ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র তখন স্পেন, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতির রাজপরিবারে অত্যধিক সমাদরে গৃহীত হইত।

সম্রাট জাহাঙ্গীর, সাহজাহান, আওরঙ্গজেব প্রভৃতির সময়ে ঢাকার সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের আদর প্রভূত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখনও তাহা রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছদ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ঢাকাই মসলিনের আদর একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় নাই। সেই সময়ে, যখন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য পরিচালন বিষয়ে সুরাট প্রধানতম বন্দর বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে, ঢাকার উৎপন্ন বাণিজ্য তখনও সুরাটের পথে পরিচালিত হইত।

ইংলণ্ডীয় বণিক-সমিতি—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও অন্যান্য বণিকেরা

সেই সময়ে ঢাকাই মসলিনের জন্য বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা করিয়া দাদন দিয়া আসিতেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত সেইরূপই চলিতেছিল। কিন্তু ক্রমে ম্যান্‌চেষ্টারের সুলভ বস্ত্র ব্যবসায় যতই বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল ঢাকাই এবং অন্যান্য দেশীয় ব্যবসায় ততই নতশির হইয়া পড়িতে লাগিল।

ইহার পর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ২ লক্ষ টাকার বস্ত্র মাত্র ঢাকা হইতে রপ্তানী হয় এবং ৪ বৎসর পর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায় ও ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতী সূতার প্রচলন আরম্ভ হয়। তাহাতে দেশীয় সুতার ব্যবহার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে প্রথম বিলাতী কল স্থাপিত হইলে ঢাকার মসলিন ব্যবসায় বিলোপমুখে নীত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় কার্পাস বড়ই নিদ্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ১৮৭৭ সনের বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায় যে বাঙ্গালায় মাত্র ১৬২০০০ একর জমি কার্পাস চাষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৮৯৫।৯৬ সনের প্রাদেশিক এগ্রিকল্‌চারেল্ ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ রিটার্ণে ১৮৯০০০ একর জমি কার্পাস চাষে দেখান হইয়াছে। বাঙ্গালার চাষী জমির তুলনায় ইহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে।

চট্টগ্রাম, (Hill Tracts) কটক, দ্বারভাঙ্গা, মেদিনীপুর, মানভূম, লোহারডগা, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে এখনও প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন করান যায় বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেই কেবল ব্যবসায়ের জন্য কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে।

১৮৯১ সনের আদমসুমারী রিপোর্ট দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে বাঙ্গালায় ১০৯২৫৭৭ লোকের জীবনোপায় কার্পাস ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই তালিকা দৃষ্টি করিলে বাঙ্গালার কার্পাস ব্যবসায়ের দুরবস্থা ভাবিয়া অবসন্ন হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ বাঙ্গালার মোট লোক সংখ্যার ১/৩০ অংশের অধিক লোক যদি

কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে তবে সে ব্যবসায়কে অধঃপতিত ব্যবসায় মনে করা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালায় যুগী, জোলা, তাঁতী, ধুনীয়া, প্রভৃতির মোট সংখ্যা সমস্ত অধিবাসীর ১/৩০ অংশ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ কেমন করিয়া হইতে পারে? এতৎ নিদর্শন কল্পে আমাদিগের বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক রিপোর্ট সমূহের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বঙ্গে ৪৫টী জিলা। নিম্নে প্রত্যেক জেলার কার্পাস ব্যবসায়ের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল।

বর্দ্ধমান—সদর রাণীগঞ্জ কিম্বা কালনায় কোন কারবার নাই। কাটোয়ার তাঁতীরা কার্পাসের ব্যবসায় করিয়া থাকে। য়ুরোপীয় সুলভ বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় তাহাদের ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে। বহু-সংখ্যক তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ২।১টী পরিবারে মাত্র তাঁতের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়।

বীরভূম—কতকদিন পূর্ব্বে যে কার্পাস ব্যবসায়ে বীরভূম প্রচুর আদর লাভ করিয়াছিল তাহা ক্রমে২ লয় পাইয়া যাইতেছে।

বাঁকুড়া—এই জেলায় ৮৪০ পরিবার কার্পাস ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে।

মেদিনীপুর—দেশীয় কার্পাসের উন্নতির দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার সম্পূর্ণ অধঃপতন অবস্থা।

হুগলী—কার্পাস ব্যবসায়ীর সংখ্যা পূর্ব্ব সংখ্যার একতৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে।

হাবড়া—উলুবেড়িয়ায় কার্পাস ব্যবসায় অতি অল্প মাত্রায় চলিতেছে।

২৪ পরগণা—সদর ও বসিরহাটে অনুমান ৪০০০ লোক মাত্র কার্পাসের ব্যবসায় করে। তাঁতীদের অধিকাংশই পৈতৃক ব্যবসায়

ছাড়িয়া কৃষিকার্য্যে প্রবেশ করিয়াছে।

নদীয়া—জেলায় অতি অল্প সংখ্যক তাঁতী ও জোলার বাস। তাহারা কেবল কৃষকদের ব্যবহার্য্য বস্ত্রই বয়ন করে। বিলাতী সুলভ বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহারাও দিন২ ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেছে।

মুর্শিদাবাদ—কার্পাস ব্যবসায়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

যশোহর—তাঁত ব্যবসায়ীরা নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক ব্যবসায়ী পৈতৃক বিষয় রক্ষা করিয়া আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কার্পাস ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয়।

খুলনা—যুগী, জোলা, তাঁতীর মোট সংখ্যা ৩২৭০৩। ইহাদের অতি অল্প লোকই ব্যবসায় রক্ষা করিতেছে।

রাজসাহী—তাঁতের অবস্থা শোচনীয়। অল্পকালের মধ্যেই ৩৩৪০টী তাঁতের স্থলে ১০১৩টী দৃষ্ট হইতেছে।

দিনাজপুর—শিতকরা ৫ জন ব্যবসায়ী পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে।

জলপাইগুড়ি—তাঁতীর সংখ্যা ৪০৬২ জন মাত্র।

দার্জ্জিলিং—শিলিগুড়িতে মাত্র ৩৭৩ জন তাঁতী আছে।

রঙ্গপুর—দেশীয় কার্পাসের অবস্থা ভাল নহে।

বগুড়া—তাঁতী ও জোলার সংখ্যা মোট ২৫৫৩, তন্মধ্যে মাত্র ২০০ লোক ব্যবসায় রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

পাবনা—১৮৭১ সনের তুলনায় ১৮৯১ সনের আদম সুমারীতে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বিস্তর ন্যূন দৃষ্ট হইয়াছে। অনেক ব্যবসায়ী য়ুরোপীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না ভাবিয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র এবং নূতন ব্যবসায় করিবার ও ইচ্ছা নাই তাহারাই কষ্টে সৃষ্টে পৈত্রিক ব্যবসায় রক্ষা করিয়া গামোছা ও নেংটী বিক্রয়দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেছে।

ঢাকা—১৮৭১ সনে ১৮০০০ লোকে ব্যবসায় করিতেছিল। ১৮৯১ সনে অনুমান ১৫০০০ লোকে ব্যবসায় চালাইয়াছে। *

ময়মনসিংহ—নগুয়া, কাটাখালী এবং সতাল প্রভৃতি স্থানে অনুমান ৫০ ঘর ও বাজিৎপুর অনুমান ৪০ ঘর যুগী, জোলা, তাঁতীতে ব্যবসায় চালাইতেছে। †

ফরিদপুর—কার্পাস ব্যবসায় ভালরূপ চলিতেছে না। সদরে মাত্র ৭। ৮ টী মুসলমান পরিবার কর্ত্তৃক ব্যবসায় রক্ষিত হইয়াছে।

দ্বারবঙ্গ—কার্পাস ব্যবসায়ে কত লোক লিপ্ত আছে তাহা অনুমান করা যায় না। মতিয়া বস্ত্রের ব্যবসায় এ জেলায় ভাল চলিতেছে। খাকৃতি বস্ত্র উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবে ভাল চলিতেছে না।

মুঙ্গের—বিগত আদমসুমারীতে প্রদর্শিত সংখ্যার একতৃতীয়াংশ লোকও প্রকৃত ব্যবসায় করে কিনা সন্দেহ। দিন দিনই সংখ্যা কমিতেছে।

ভাগলপুর—ব্যবসায়ীর সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে।

পূর্ণিয়া—জোলা, তাঁতী ও পলিয়ার সংখ্যা ১২০০শতের বেশী নহে।

মালদহ—দেশীয় কার্পাসের এখানে বিশেষ আদর নাই। বৈদেশিক শিল্পের অভ্যুদয়ই ইহার একমাত্র কারণ।

সাঁওতাল পরগণা—তাঁতী, জোলা প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবসায়ীরা অন্যান্য লাভ জনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কটক, বালেশ্বর ও পুরী—বিগত আদমসুমারী রিপোর্টে বিশ হাজারেরও উপরে তাঁতীর সংখ্যা দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা অবগত হওয়া যায় নাই।

খন্দমল—অনুমান ৫০০ পণ জাতীয় ব্যবসায়ী বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত আছে।

* মদনগঞ্জ সবডিবিসনের বহু তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া পান বিক্রয়ও ধরিয়াছে।

† বাজিৎপুরের অনেক বসাককে ভৃত্যের কার্য্য করিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

অঙ্গুল—সমস্ত লোক সংখ্যার হিসাবে তাঁতী শতকরা দুই জনের অধিক নহে। প্রকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিরূপিত হয় নাই।

হাজারীবাগ—এ জেলায় একতৃতীয়াংশ কৃষক কার্পাসের চাষ করে। তুলা পিঁজিয়াও বহু স্ত্রীলোক জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু প্রকৃত তাঁত ব্যবসায়ী জোলারা তাঁত ছাড়িয়া 'কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

পালামো—গত আদমসুমারী রিপোর্টে প্রদর্শিত সংখ্যার অর্দ্ধাংশ লোকও নিজ ব্যবসায় লিপ্ত নহে। অধিকাংশই কৃষিকার্য্য গ্রহণ করিয়াছে।

মানভূম—প্রকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নির্ণয় হয় নাই।

সিংহভূম—২৫৪৯০ সংখ্যক যুগী ও তাঁতীর মধ্যে, মাত্র ৩২৬৯ জন নিজ ব্যবসায় করে।

বর্ত্তমান এই উন্নতির যুগেও যাহারা নিতান্তই Conservative, পৈত্রিক ব্যবসা রক্ষা করিয়া 'মাকু' বা তাঁতটীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহারা সমাজের চক্ষে কিছু অবহেলিত হইয়াই আছে। যাহারা একটী ক্ষুদ্র মুদীদোকান বসাইয়া ২ সের ৪ সের চাউল, দাইলও অন্ততঃ বিক্রয় করিতেছে তাহারাও তাহাকে হেয় কুলপাংশুল বলিয়া সমাজবিতাড়িত করিতে চেষ্টার ত্রুটী করিতেছে না। আর যাহারা পায়ের উপর পা তুলিয়া পৈত্রিক ধনের সুদ খাইতেছে বা দু চারিটী পাস দিয়া রাজদরবারে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদেরত কথাই নাই। এইরূপে স্বজাতির সহানুভূতি-শূন্যতা পরন্তু নিগ্রহআশঙ্কা ও দেশী বস্ত্রব্যবসায় লোপ করিবার একটী কারণ দাঁড়াইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

গুজরাটের পুরাতত্ত্ব।

—০—

দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে সিন্ধুনদ অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্জাব আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত নামে জনৈক মগধ-বাসী যুবক এই সময়ে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া, দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মগধসাম্রাজ্য তখন নন্দবংশের পদানত ছিল। পঞ্জাবে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াসী হইয়া, চন্দ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাটের সহিত মিলিত হন। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে গ্রীকসম্রাট অত্যন্ত বিরক্ত হন। তজ্জন্য চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকসম্রাটের শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাগমনের কয়েক বৎসরের মধ্যে, চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক মগধ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। অনুমান ৩২০ খৃঃ পূঃ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে পঞ্জাব হইতে মগধ পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুগঙ্গপ্রদেশ চন্দ্রগুপ্তের করতল-গত হয়। সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী চাণক্যের মন্ত্রণাবলে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, অনুমান খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধে আধিপত্য লাভ করেন। শূদ্রজাতীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মগধে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া, পাটলীপুত্র নগরে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার একাধিপত্য সংস্থাপিত হয়। পশ্চিমে কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্তও তাঁহার শাসনদণ্ডের অধীন হইয়াছিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক (প্রিয়দর্শী) খৃঃ পূঃ ২৬৩—২২৩ পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন। পূর্ব্বে কলিঙ্গ হইতে পশ্চিমে কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত দেশসমূহ তাঁহার পদানত ছিল। কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী গির্ণারের পর্ব্বতশিখরে প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুপারা পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিম উপকূল তাঁহার পদানত ছিল। সুপারায় অশোকের অষ্টম শিলালিপি সুপণ্ডিত

ভগবান লাল ইন্দ্রাজীর গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের মতে মৌর্য্যবংশীয় দশ জন নরপতি ১৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। মৌর্য্যবংশীয় দশম নরপতি বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া, মগধ সম্রাটের সেনাপতি পুষ্য (পুষ্প) মিত্র, সুঙ্গ (শুমিত্র) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সুঙ্গ (মিত্র) বংশীয় দশ জন নৃপতি ১১২ বৎসর রাজত্ব করেন। অনন্তর সুঙ্গভৃত্য কাণ্বংশ মগধে অভ্যুদিত হয়। কাণ্ববংশীয় চারিজন নরপতি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। সুঙ্গ-বংশীয় নরপতিগণ ক্ষত্রিয় এবং কাণ্ববংশ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বংশের ন্যায় ব্রাহ্মণজাতীয় কাণ্ববংশ সুঙ্গবংশকে পদচ্যুত করিয়া তাহাদের নামে রাজত্ব করিতে থাকে। তৎপর অন্ধ্রভৃত্যবংশ আধিপত্য লাভ করেন। বায়ু, বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের মতে অন্ধ্রভৃত্য বংশীয় ৩০ জন নরপতি ৪১১ এবং ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎস্য পুরাণের মতে অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় ২৯ জন রাজা ৪৬০ বৎসরকাল শাসনদণ্ড পরিচালন করেন।

ডাক্তর কারণের মতে ৩২২খৃঃ পূঃ অব্দে মৌর্য্যবংশের আধিপত্য মগধে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তর ভাণ্ডারকর এই মতে আস্থাবান হইয়া, ১৮৫ খৃঃ পূঃ অব্দে সুঙ্গ (মিত্র) বংশের এবং ৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দে অন্ধ্রভৃত্য বংশের প্রতিষ্ঠাকাল অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুঙ্গ ও কাণ্ববংশ একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিয়া অন্ধ্রভৃত্যবংশের দ্বারা পর্য্যুদস্ত হয়। *

"চত্বারিঃ সুঙ্গভৃত্যা স্তে নৃপাঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।
কাণ্বায়নং ততো ভৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্য তম্॥
শুঙ্গাণাং চৈব যচ্ছেষং ক্ষাপয়িত্বা বলং তদা।
সিন্ধুকো হ্যন্ধ্রজাতীয়; প্রাপ্স্যতীমাং বসুন্ধরাং॥" (বায়ুপুরাণ)

* Dr R. G. Bhandarkar's "Early History of Deccan" (Bombay, 1884) P. 24.

মৌর্য্যবংশের অধঃপতনের পর সুঙ্গ (মিত্র) সত্রপ (সাহ) বংশ ও কাণ্ববংশের আধিপত্য সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। পুরাণে যাঁহারা অন্ধ্রভৃত্য নামে পরিচিত, দক্ষিণাপথের বিবিধ শিলালিপিতে তাঁহারা "শাতবাহন" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। নাসিকের এক পর্ব্বতগহ্বরে ঊষাবদাতের নামাঙ্কিত এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঊষাবদাতের পিতার নাম দীনীক ও পত্নীর নাম দখমিত্রা। এই ঊষাবদাত ক্ষরাট নহপানের জামাতা ছিলেন। ঊষাবদাতের অধিকার সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সময়ে প্রভাস (সোমনাথ পত্তন) ও ভরুকচ্ছ (ভরোচ) প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। ঊষাবদাত নিজব্যয়ে প্রভাসের ৮ জন ব্রাহ্মণের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি নিজ ব্যয়ে ভরুকচ্ছে গৃহ, বিশ্রামাগার ও অঙ্গন নির্ম্মিত করান।

নাসিকের অপর একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে শাতবাহনবংশীয় গৌতমীপুত্র শতকর্ণির আধিপত্য সুরাষ্ট্র পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি শক, যবন, পহ্লব ও খগারাট (ক্ষরাট?) বংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিয়া, দাক্ষিণাপথে শাতবাহনবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ‡

"ক্ষত্রপ" বংশের বহুতর মুদ্রা কাঠিয়াবাড়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের নামাঙ্কিত কতিপয় শাসনলিপি কাঠিয়াবাড়ে পাওয়া গিয়াছে। ২৫০, ৩০০ ও ৩০৪ শকাব্দের (৩২৮, ৩৭৮, ৩৮২ খৃষ্টাব্দের) সত্রপ মুদ্রা কাঠিয়াবাড়ে আবিষ্কৃত হয়। এই ক্ষত্রপ বা সত্রপ নরপতিগণ ৩০০ বৎসরেরও অধিক কাল কাঠিয়াবাড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ E. Thomas সাহেব "সুরাষ্ট্রের শাহ-বংশীয় নরপতিগণ" সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে তিনি শাহবংশীয় নৃপতিদিগের সময় গুপ্তবংশের পূর্ব্বতন ও শ্রীহর্ষের

† Bhandarkar's E. H. of D. P. 13. ‡ Do P. 14.

অধস্তন বলিয়া অনুমান করেন। উক্ত প্রবন্ধে * তিনি ৪৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দ শ্রীহর্ষের প্রতিষ্ঠিত অব্দের আরম্ভকাল বলিয়া অনুমান করেন। ১৮৬২ খৃঃ Newton সাহেব এই সম্বন্ধে আপনার গবেষণা বিষয়ক ফল প্রকাশ করেন। † তাঁহার মতে সংবতাব্দ হইতে শাহ নরপতিদিগের অব্দগণনা আরম্ভ হয় এবং ১৯ জন শাহ্ববংশীয় রাজা ৩০—২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুরাষ্ট্রে রাজত্ব করেন। ১৮৮১ খৃঃ পূর্ব্বোক্ত টমাস সাহেব নিউটন সাহেবের সিদ্ধান্ত প্রামাণিক বোধে গ্রহণ করেন এবং নিউটন সাহেবের সংগৃহীত ২৫ জন সাহ নরপতির তালিকা ও সময় প্রকাশ করেন। ‡ সাহ নরপতিদিগের রাজত্বকাল শকাব্দে গণিত হয় বলিয়া ডাক্তর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্বরচিত "দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতিহাসে" নির্দ্দেশ করেন। এই মতই আমাদের নিকট সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। নিম্নে টমাস ও নিউটন সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পার্শ্বে আমাদের অনুমিত সময় তুলনার জন্য প্রদত্ত হইল। সাহনরপতিদিগের নামাঙ্কিত মুদ্রা হইতে অধিকাংশ সময় গৃহীত হইল।

১। ক্ষরাট নহপান (৩।১৩) খৃঃ পূঃ ৬০ বা ৭০ = (৮১।৯১খৃঃ)
২। অজ্ঞাতনামা।
৩। চষ্টন (স্যমোতিকের পুত্র) (৬৯।৭৭) = খৃঃ পূঃ ১০।২০ = (১৪৫। ১৫৫খৃঃ)
৪। জয়দামন (চষ্টনের পুত্র)
৫। রুদ্রদামন (জয়দামনের পুত্র) (১০২—১০৪) = ৪৫—৪৭খৃঃ = (১৮০—১৮২খৃঃ)
৬। জীবদামন (জয়দামনের পুত্র) (৯৫) = ৩৮খৃঃ = (১৭৩খৃঃ)

* Journal of Royal A. Society, XII [Old series] p. 1
† Journal of Bombay branch of R. A. S. IX. 30
‡ Journal of R. A. S. XIII [new series] p. 525.

৭। রুদ্রসিংহ (রুদ্রদামনের পুত্র)
৮। রুদ্রসাহ (রুদ্রসিংহের পুত্র)
৯। স্ত্রীসাহ (রুদ্রসাহের পুত্র)
১০। সঙ্ঘদাম (রুদ্রসাহের পুত্র)
১১। দামসাহ (রুদ্রসিংহের পুত্র)
১২। যশদাম (দামসাহের পুত্র)
১৩। দমজটশ্রী (রুদ্রসাহের পুত্র) (১৫৪) = ৯৭খৃঃ = (২৩২খৃঃ)
১৪। বীরদাম (দামসাহের পুত্র)
১৫। ঈশ্বর দত্ত।
১৬। বিজয়সাহ (দামসাহের পুত্র) (১৭২) = ১১৫খৃঃ = (২৫০খৃঃ)
১৭। দমজটশ্রী (ঐ)
১৮। রুদ্রসাহ (রুদ্রদামের পুত্র) (১৮৮।১৯৮) = ১৩১।১৭১খৃঃ = (২৬৬।২৭৬ খৃঃ)
১৯। বিশ্বসিংহ (রুদ্রসাহের পুত্র) (২০০) = ১৩৩খৃঃ = (২৭৮খৃঃ)
২০। অত্রিদাম (ঐ) (২১০।২১৪) = ১৫৩।১৫৭খৃঃ = (২৮৮।২৯২খৃঃ)
২১। বিশ্বসাহ (অত্রিদামের পুত্র) (২১৭।২২৫) = ১৬০।১৬৮খৃঃ = (২৯৫।৩০৩খৃঃ)
২২। রুদ্রসিংহ (স্বামী জীবদামের পুত্র) ($\frac{২৩০}{২৭০}$) = $\frac{১৭৩}{২৩৩}$খৃঃ = ($\frac{৩০৮}{৩৪৮}$খৃঃ)
২৩। আশাদাম (রুদ্রসাহের পুত্র)
২৪। স্বামী রুদ্রসাহ (স্বামী রুদ্রদামের পুত্র) ২৮০, ২৯২ = ২২৩। ২৩৫খৃঃ = (৩৫৮।৩৭০খৃঃ)
২৫। স্বামী রুদ্রসাহ (স্বামী সত্যসাহের পুত্র)

পূর্ব্বোদ্ধৃত সাহনরপতিগণের তালিকা হইতে ৮১ হইতে ৩৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্বকালের সময় পাওয়া যাইতেছে। এবিষয়ে টমাস ও নিউটন সাহেবের মত যে একান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

১৬৩খৃঃ গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির মৃত্যু হয়। ১৫১ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি স্বরচিত ভূগোল লিপিবদ্ধ করেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি উজ্জয়িনীপতি শকরাজ চষ্টনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শক, যবন ও পল্লবাদি বৈদেশিক জাতি পশ্চিম ভারত আক্রমণ পূর্ব্বক তথায় উপনিবিষ্ট হয়। সিন্ধু, রাজপুতানা, সুরাষ্ট্র ও মালব খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁহাদের পদানত হয়। খৃঃ পূঃ ৭৩ অব্দে শিমুক অন্ধ্রভৃত্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণের অন্ধ্রভৃত্যবংশ শাসনলিপিতে "শাতবাহন" নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই অন্ধ্রভৃত্য (শাতবাহন) বংশের প্রাচীনতর শাখা তৈলঙ্গে ও নবীনতর শাখা মহারাষ্ট্র প্রদেশে রাজত্ব করিতে থাকে। প্রাচীনশাখার রাজধানী ধনকটক (ধরণীকোট) বর্ত্তমান গণ্টুর জিলায় অবস্থিত। নবীনশাখার রাজধানী গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী প্রতিষ্ঠান (পৈঠান) নগরে সংস্থাপিত হয়।

গ্রীক নাবিকগণের মুখে অবগত হইয়া, টলেমি স্বরচিত ভূগোলে উজ্জয়িনীপতি শকরাজ চষ্টনও প্রতিষ্ঠানের অধীশ্বর পুলোমায়ীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। টলেমির সময়ে (১৩৩—১৬৩খৃঃ) চষ্টন ও পুলোমায়ী বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া ইহা হইতে স্পষ্টাক্ষরে অনুমিত হয়। খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৭৩ অব্দ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৯১ বর্ষকাল শাতবাহন (অন্ধ্রভৃত্য) বংশ দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তন্মধ্যে ৫৩ বৎসরকাল শাতবাহন বংশের আধিপত্য উন্মূলিত করিয়া, শকবংশীয় ক্ষরাট্ নহপান ও তাঁহার জামাতা ঊষাবদাত দক্ষিণাপথে রাজত্ব করেন। বাৎস্য গোত্রজ ব্রাহ্মণজাতীয় "অয়ম" নহপানের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নহপান জুন্নার (জীর্ণনগর) নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালের আরম্ভ হইতে শকাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। তাঁহার পূর্ব্বতন কোনও শকনরপতির নাম সুরাষ্ট্র কি দক্ষিণাপথে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

শাতবাহন বংশ।

শিমুক শাতবাহন (খৃঃ পূঃ ৭৩—৫০খৃঃ পূঃ = ২৩ বৎসর)
কৃষ্ণরাজ (খৃঃ পূঃ ৫০—৩০ খৃঃ পূঃ = ২০ বৎসর)
শতকর্ণি (খৃঃ পূঃ ৩০—১৬খৃঃ = ৪৬ বৎসর)। পত্নী নয়ানিকা।
হারিতীপুত্র শতকর্ণি (খৃঃ ১৬—৭৬খৃঃ = ৬০বৎসর) (I. A. ~~১৩৩~~)

(শক বংশ।)

ক্ষরাট্ নহপান (৭৮—১২৪ খৃঃ = ৪৬ বৎসর)
ঊষাবদাত (১২৪—১৩৩ খৃঃ = ৭ বৎসর)

(শাতবাহন বংশ।)

গোতমীপুত্র শতকর্ণি (১৩৩—১৫৪ খৃঃ) = ২২ বৎসর। পত্নী বাশিষ্ঠী।

(ক) পৈঠন।	(খ) ধনকটক।
পুলুমায়ী (১৩০—১৫৪ খৃঃ)	পুলুমায়ী (১৫৪—১৫৮ খৃঃ)
যজ্ঞশ্রী শতকর্ণি (১৫৪—১৭২খৃঃ)	শিবশ্রী (১৫৮—১৬৫ খৃঃ)
মধরিপুত্র শকসেন (১৭২—১৮০ খৃঃ)	শিবস্কন্দ (১৬৫—১৭২ খৃঃ)
	যজ্ঞশ্রী (১৭২—২০২ খৃঃ)
	বিজয় (২০২—২০৮ খৃঃ)
	চন্দ্রশ্রী (২০৮—২১১ খৃঃ)
	পুলুমায়ী ২ (২১১—২১৮ খৃঃ)

গোতমীপুত্র শতকর্ণির পূর্ব্বে শক ও অন্যান্য বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হয়। এই শতকর্ণি শাক, যবন ও পল্লবাদি বৈদেশিক জাতিকে পরাজিত করেন বলিয়া, তাঁহার নামাঙ্কিত নাসিকের শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে। তিনি খগারাট (ক্ষরাট্) নহপানের উত্তরাধিকারী ও জামাতা ঊষাবদাতকে পরাস্ত করিয়া, শাতবাহন বংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। শকাব্দ প্রবর্ত্তনের ৫৩ বৎসর পরে শক বংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথ

হইতে উন্মূলিত হয়। শতকর্ণির অধিকার আর্শিক, অশ্মক, মূলক, সুরাষ্ট্র, (দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়) কুকুর, (রাজপুতনার অংশ) অপরান্ত, (উত্তর কঙ্কণ) বিদর্ভ অনুপ (রাজধানী মাহিষ্মতী) এবং অকারবন্তী (পূর্ব্ব মালব) পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। চষ্টনের পুত্র জয়দামন শতকর্ণির ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারে ভীত হইয়া দক্ষিণাপথ আক্রমণ করে। কিন্তু শতকর্ণি দ্বারা পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়।

যে সময়ে শতকর্ণি প্রবল পরাক্রমের সহিত ধনকটক (ধরণীকোট) নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র পুলোমায়ী পশ্চিম ভারতের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নবনরে (নবীননগরে) তাঁহার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। তদবধি নহপানের রাজধানী জুন্নর (জীর্ণনগর) ও পুলোমায়ীর রাজধানী নবনর (প্রতিষ্ঠান) নামে পরিচিত হইতে থাকে। পুলোমায়ীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকিবে। টলেমি এই প্রতিষ্ঠান নগরের নরপতি পুলোমায়ীর উল্লেখ করিয়াছেন।

জয়দামনের পুত্র রুদ্রদামন অনুমান ১৪৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার শতকর্ণিকে পরাজিত করিয়া, শকবংশের আধিপত্য সবিশেষ প্রসারিত করেন। তদবধি তিনি মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার আধিপত্য দক্ষিণাপথের অপরান্ত (উত্তর কঙ্কণ) পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের পুত্র রুদ্রসিংহের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা কাঠিয়াবাড়ে পাওয়া গিয়াছে। (I. A. 1885, J. A. S. B. 1838)

শাতবাহনবংশের অধঃপতনের পর শকবংশীয় সত্রপগণ পুনরায় প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহাদের দুইজনের নামাঙ্কিত দুইটী মুদ্রা ফরহাড়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সত্রপবংশ তাঁহাদের মুদ্রায় শকাব্দের ব্যবহার করিতেন। তন্মধ্যে একটী মুদ্রা ১৪৪ শকাব্দের (২২২খৃঃ) ও অপরটী ২২৪ শকাব্দে (৩০২খৃঃ) নির্ম্মিত হয়। ৩০৪ শকাব্দের মুদ্রায় সত্রপ বংশের নাম দেখা যায়। ইহাই সত্রপবংশের শেষ মুদ্রা। ইহার

পরবর্ত্তী সত্রপবংশীয় কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে অতঃপর সত্রপবংশের আধিপত্য সুরাষ্ট্র হইতে বিলুপ্ত হয়। ৩৮২ খৃষ্টাব্দে সত্রপবংশীয় শেষ নরপতি গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পদানত হয়। সত্রপবংশকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিজিত সত্রপনরপতিদিগের রৌপ্যমুদ্রার অনুকরণে স্বনামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত করেন। ৯৩ গুপ্তাব্দে (৪১২খৃঃ) নির্ম্মিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত সত্রপবংশ মহাপরাক্রমের সহিত সুরাষ্ট্র ও উত্তরভারতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে থাকেন। সুরাষ্ট্র ও উজ্জয়িনীর সত্রপনরপতিগণ অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বদ্ধ ছিলেন। সত্রপ নৃপতিগণ শকজাতীয় ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তাহারা কালক্রমে ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন অধিবাসী আর্য্যদিগের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া যায়। কালক্রমে ভারতবাসীদিগের সহিত তাহাদের সর্ব্ববিধ পার্থক্য তিরোহিত হয় এবং তাহারা ভারতবর্ষের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত হয়।

খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে দক্ষিণাপথে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শকরাজের দ্বারা শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র প্রাচীনকাল হইতেই এই শকাব্দ প্রচলিত হয়। দক্ষিণাপথের শতাধিক প্রাচীন শাসনপত্র ও শিলালিপিতে পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তর বার্জেস্ ও ফ্লীট শকাব্দের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে সংবতাব্দ, গুপ্তাব্দ, বুলচুরী অব্দ, হর্ষাব্দ ও লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত থাকার বিবিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের কোনও প্রাচীনতম শাসনলিপিতে শকাব্দের উল্লেখ দেখা যায় নাই। দক্ষিণাপথ হইতে মালব ও সুরাষ্ট্রে শকাব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। মালব ও সুরাষ্ট্রের পরাক্রান্ত সত্রপবংশীয় সম্রাটগণ আপনাদের সাম্রাজ্যে

এই শকাব্দের ব্যবহার করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত সত্রপবংশ মহাপরাক্রমের সহিত মালব ও গুজরাটে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে থাকেন। ৩০৪ শকাব্দের পরবর্ত্তী কোনও সত্রপবংশীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। * গুপ্তবংশীয় তৃতীয় নরপতি ও প্রথম সম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সত্রপদিগকে পরাজিত করিয়া গুজরাটে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সময়ে পশ্চিমে নেপাল হইতে পূর্ব্বে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে মালব পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সত্রপগণের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার অনুকরণে নিজনামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত করেন।

খৃঃ পূঃ ৭৩ অব্দে শিমুক শাতবাহন দক্ষিণাপথে অন্ধ্রভৃত্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হারিতীপুত্র শতকর্ণি এই শাতবাহনবংশের চতুর্থতম নরপতি। শকবংশীয় ক্ষরাট্ নহপান তাঁহার সময়ে অন্ধ্রভৃত্য সাম্রাজ্যে উত্তরদিক হইতে আপতিত হন। হারিতীপুত্র শতকর্ণি বা তাঁহার পুত্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, দক্ষিণাপথে শকবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মহাপরাক্রান্ত নহপান জুন্নারনগরে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সময় হইতে দক্ষিণাপথে শকাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। ৭৮—১২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর কাল তিনি জুনাড়ে রাজত্ব করেন। বাৎস্য গোত্রজ অয়ম নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দীনীকের পুত্র ঊষাবদাত সম্রাট নহপানের তনয়া দখমিত্রাকে বিবাহ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর ঊষাবদাত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ১২৪—১৩৩খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসর কাল শাসন করেন। ঊষাবদাতের নামাঙ্কিত চারি খানি

* Indian Antiquary (VI. 57) and Cunningham's Archæological Survey Reports (IX. 127.)

শিলালিপি নাসিকের সন্নিহিত পর্ব্বতগহ্বরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে ঊষাবদাত বৌদ্ধ ছিলেন। ইহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অনুমিত হয় যে শকবংশীয় সম্রাট নহপানও বৌদ্ধ ছিলেন।

নহপানের পূর্ব্বতন কোনও শকনরপতির বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তিনিই শকজাতীয় প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নৃপতি। মহাপরাক্রান্ত শাতবাহনবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার শতবর্ষের মধ্যে যিনি তাঁহাদের সাম্রাজ্য পর্য্যুদস্ত করেন, তিনি অবশ্যই অসামান্য পুরুষ ছিলেন। যিনি শাতবাহনবংশের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল দক্ষিণাপথে শকসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তিনি অবশ্যই মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ ছিলেন। এই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ নহপানের রাজ্যারম্ভকাল হইতে দক্ষিণাপথে শকাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথের বহুতর তাম্রশাসনে এই অব্দ "শককাল" বা "শকনৃপকাল" বলিয়া বর্ণিত হইতে থাকে। কালক্রমে "শকনৃপকাল" সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ পূর্ব্বক "শক" বা "শাক" শব্দে পরিণত হয়। লোকে "শক" শব্দের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হয়। শালিবাহন নামে রাজা এই "শকাব্দের" প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ভ্রান্ত জনপ্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়।

"শালিবাহন" শব্দ "শাতবাহন" পদেরই অপভ্রংশ। হেমচন্দ্র সূরির "প্রাকৃত ব্যাকরণে" এই উভয় শব্দ একার্থক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথের বহুতর প্রাচীন শিলালিপিতে "শাতবাহন" বংশের উল্লেখ দেখা যায়। "শালিবাহন শক" পদদ্বারা শাতবাহন ও শক নামে দুই বিভিন্ন ও প্রাচীন সমসাময়িক রাজবংশ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব এই পদ নিরর্থক।

দক্ষিণাপথে শকাব্দ সম্বন্ধে প্রাচীন জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি শালিবাহন উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যকে

পরাঙ্কিত করিয়া, তাঁহার জয়লাভের স্মারকচিহ্নরূপে স্বরাজ্যে শকাব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। দক্ষিণাপথ হইতে কালক্রমে উত্তরভারত ও আর্য্যাবর্ত্তে প্রবিষ্ট হয়। "বৃহৎসংহিতার" টীকাকার ভট্ট উৎপল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যকে শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু "বৃহৎসংহিতা" ও "বৃহজ্জাতক" প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যোতিষগ্রন্থের লেখক বরাহমিহির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'শকাব্দ'কে 'শকভূপকাল' বা 'শকেন্দ্রকাল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য স্বরচিত "গোলাধ্যায়ে" শকাব্দকে "শকনৃপসময়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্যের "করণকুতুহল" গ্রন্থের টীকাকার সোধল লিখিয়াছেন যে শকনামক ম্লেচ্ছদিগকে পরাজিত করিয়া বিক্রমাদিত্য শকাব্দ প্রচলিত করেন।

পূর্ব্বোক্ত জনপ্রবাদ নিতান্ত অমূলক নহে। শালিবাহন বা বিক্রমাদিত্য নামে কোনও ব্যক্তি শকাব্দের প্রবর্ত্তক নহেন। শকবংশীয় বৌদ্ধ সম্রাট নহপানের দ্বারা শকাব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। শাতবাহনবংশীয় গোতমীপুত্র শতকর্ণি ও তাহার পুত্র পুলোমায়ী শকবংশীয় ঊষাবদাতকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়া শাতবাহনবংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। উজ্জয়িনীর শকনৃপতি চষ্টন ও তাঁহার পুত্র জয়দামন শকসাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রতিষ্ঠান (নবনর) নগরের অধিপতি পুলোমায়ীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। পুলোমায়ীর ভুজবীর্য্যে শকজাতি দক্ষিণাপথ হইতে দূরীভূত হয়। শকজাতির যাবতীয় ক্ষমতা মালব ও সুরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত হয়। উজ্জয়িনী হইতে তাঁহারা পশ্চিমভারত শাসন করিতে থাকেন। চষ্টনের পুত্র জয়দামন এই সময়ে উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। শাতবাহনবংশের আধিপত্য বিস্তারে ভীত হইয়া, শকাধিপতি জয়দামন দক্ষিণাপথ আক্রমণ করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানরাজ পুলোমায়ীরদ্বারা পরাজিত হন।

অবশেষে পুলোমায়ীর ভুজবীর্য্যে জয়দামন রাজ্যচ্যুত হন। শকজাতির আধিপত্য অবন্তী, (উজ্জয়িনী) অকারবন্তী, (পূর্ব্বমালব) অনুপ, (মাহিষ্মতী) ও সুরাষ্ট্র (কাঠিয়াবাড়) হইতে কিয়ৎকালের জন্য বিলুপ্ত হয়। শাতবাহনবংশীয় পুলোমায়ীর অধিকার তথায় প্রসারিত হয়। এই ঘটনাই জনপ্রবাদে শালিবাহন কর্ত্তৃক উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের পরাজয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উজ্জয়িনী হইতে জুনাগড়ে শকবংশীয় সত্রপ সম্রাটদিগের রাজধানী নীত হয়। এই জুনাগড়ে রুদ্রদামনের নামাঙ্কিত এক শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। * এই রুদ্রদামন চষ্টনের পৌত্র ও জয়দামনের পুত্র। তিনি শতকর্ণি ও পুলোমায়ীর সমসাময়িক। এই শাসনলিপিতে শাতবাহনবংশীয় গোতমীপুত্র শতকর্ণি "দক্ষিণাপথের অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই শাসনলিপি ৭২ শকাব্দে (১৫০খৃষ্টাব্দে) লিখিত হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে রুদ্রদামন দুইবার দক্ষিণাপথের অধীশ্বর শতকর্ণিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, শকসাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। রুদ্রদামন শকসাম্রাজ্য মালব ও সুরাষ্ট্রে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া "মহাক্ষত্রপ" উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সুরাষ্ট্র ও আনর্ত্ত প্রদেশের শাসনকার্য্যে পল্লবজাতীয় সুবিশাখকে নিযুক্ত করেন। সুবিশাখের পিতার নাম কুলৈপ বলিয়া শাসনলিপি হইতে জানা যায়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

---

* Indian Antiquary (VII. 260.) and Journal of Bombay Branch of R. A. S. (VII. 20)

জ্যোতিষ ও কালবিধান।

—o—

" বেদাহি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ কালানুপূর্ব্ব্যা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।
তস্মাদিদং কালবিধান শাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞান্॥ "

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ।

বিজ্ঞানমধ্যে জ্যোতিষ অতি প্রাচীন। ইহা কালবিধান শাস্ত্র। কালের বিধান উপলক্ষে মানববুদ্ধির প্রথম বিকাশ হইতেই জ্যোতিষের অভ্যুদয়। আদি মানব ঊষাসমাগমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জবাকুসুম-সকাশ দিবাকরকে অভিবাদন করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রথম জয় উদীরণ করিলেন। দিবাকর সমস্ত আকাশ পর্য্যটনান্তে অস্তাচল অবলম্বন করিলেন, মানব গুহাশয্যায় আশ্রয় লইলেন এবং পুনঃ ঊষা-সমাগমে গাত্রোত্থান করিলেন। এইরূপে দিবারাত্রির প্রভেদ মানবহৃদয়ে প্রবেশলাভ করিল।

সূর্য্য অস্তমিত হইলে শশধরের বিমল জ্যোতি মানবের চিত্ত বিমোহিত করিল। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আগ্রহের সহিত নিশানাথকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন শশধর প্রতিদিন একরূপ দৃষ্ট হয় না, দিন২ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পুনঃ ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও ত্রিংশৎ দিনে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। উপর্য্যুপরি পশ্চিম গগণে চন্দ্রকলার দুইবার প্রথম দর্শনের মধ্যবর্ত্তী সময়কে 'মাস' নামে অভিহিত করিয়া মানব ৩০ দিনে একমাস নিরূপণ করিলেন। চন্দ্রকলা বৃদ্ধিকালে রজনী শুক্লবসন পরিহিতা হইয়া পদার্পণ করে, এইজন্য ঐ কালের নাম 'শুক্লপক্ষ' আর চন্দ্রকলা হ্রাস সময়ে কৃষ্ণবসনে রজনীর বদন আবৃত থাকে বলিয়া ঐ কালের নাম 'কৃষ্ণপক্ষ' হইল।

মানব দিন২ সন্ধ্যার পর চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণকালে দেখিলেন চন্দ্রের সঙ্গে২ অগণ্য তারকারাজি নৈশাকাশে পরিশোভিত করে। তারকাগণের মৃদু কিরণ, লজ্জাশীলা কুলবধূর ন্যায় তাহারা

এক একবার চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিত করে, সুতরাং তাহারা চন্দ্রের মহিষী কল্পিতা হইল। চন্দ্র বড় চতুর নায়ক, প্রতিনিশি এক মহিষীর ঘর করে না, আজি নিশি যে তারকার পাশে দৃষ্ট হয় কল্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে অন্য তারকার অঞ্চল গ্রহণ করে। এইরূপে পূর্ব্বমুখে সমস্ত আকাশ পর্য্যটন পূর্ব্বক ২৭ দিনে ২৭টি তারকার পরিতোষান্তে পুনরায় আকাশমণ্ডলে পূর্ব্বস্থানে আগমন করে। এই প্রকারে আকাশে চন্দ্রপথ ও তাহাতে অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্র স্থিরীকৃত হইল।

মানবের কার্য্যক্ষেত্র যতই সম্প্রসারিত হইতে লাগিল, কালের সীমা বিস্তার করা ততই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। দিন এবং মাসে এখন আর কুলাইয়া উঠে না। নববর্ষের সমাগম ও ঋতুর পরিবর্ত্তন এখন তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল। আর কত দিনে প্রকৃতি পুনঃ পূর্ব্ব-বেশে দেখা দিবে, বসন্তের মুকুল, বর্ষার বারিদ, শরতের চন্দ্রমা, শীতের তুষার, কবে পুনরাগমন করিবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের জ্যোতির্ম্ময় দেবতাগণ পুনরভ্যুদিত হইবেন, প্রভঞ্জন স্থাবরজঙ্গম কম্পিত করিয়া, বরুণদেব দেশময় প্লাবিত করিয়া, সুরপতি গগণ বিদারিত করিয়া, ইন্দিরা বসুন্ধরাকে শ্যামল শস্যে সুশোভিত করিয়া, এবং পিতৃগণ বংশধরগণের মুখাবলোকনে অভিলাষী হইয়া, মর্ত্ত্যে পদার্পণ করিবেন, কতদিনের পর তাঁহাদের পূজাহোম অর্চ্চনাদির পুনরায়োজন করিতে হইবে, এবং কবেই বা শীতাতপ নিবারণ, গৃহসংস্কার, ও কৃষি আদির উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ইহা অগ্রে জ্ঞাত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

ঋতুর কারণানুসন্ধিৎসু মানব দেখিল সূর্য্যরথ যখন সর্ব্বাধিক দক্ষিণাকাশপথে গমন করে এবং তদ্ধেতু দিনমান হ্রাস ও রবিকিরণ মৃদু হয়, তখনই 'শীতকাল'। আর সূর্য্যের সর্ব্বাধিক উত্তর পথে গমন বশতঃ যখন তাহার কিরণ প্রখর হয় ও দিনমান সমধিক বৃদ্ধিপায়

তখনই "গ্রীষ্মকাল"। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে যখন দিনরাত্রি সমান ও সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত হয় তখন "বসন্ত" ও "শরৎ"। গণিয়া দেখা গেল সর্ব্বাধিক দক্ষিণপথ হইতে সর্ব্বাধিক উত্তরপথে গমন করিতে সূর্য্যের স্থূলতঃ ৬ চান্দ্রমাস আবশ্যক করে, এই ৬ মাসকাল "উত্তরায়ণ" অভিহিত হইল। এইরূপ, সর্ব্বাধিক উত্তর হইতে দক্ষিণপথে গমনের ৬ মাস কাল "দক্ষিণায়ন" অভিহিত হইল; এবং ২ অয়ন বা ১২ মাসে অথবা ৩৬০ দিনে "বৎসর" নির্ণীত হইল। উত্তরায়ণের ঠিক মধ্যবর্ত্তী বসন্তপ্রারম্ভে প্রকৃতি নবমুকুলে সুশোভিত হইয়া নববেশ ধারণ করে, সুতরাং এই সময় বৎসরের প্রারম্ভ গণ্য হইল, আর সেই প্রারম্ভ মাসে পূর্ণচন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে দৃষ্ট হওয়াতে তদনুকরণে ঐ মাসের নাম "বৈশাখ" হইল। এইরূপে জ্যেষ্ঠা হইতে "জ্যৈষ্ঠ", আষাঢ়া হইতে "আষাঢ়", শ্রবণা হইতে "শ্রাবণ" ইত্যাদি ১২ মাসের নামকরণ হইল।

ক্রমে দেখা গেল যে ঠিক ১২ চান্দ্রমাসে বৎসর গণনা করিলে ঋতু সকলের উচিত সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। বাস্তবিক ৮ বর্ষ অন্তে নববর্ষ প্রবর্ত্তনকালে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় সহ বসন্তঋতুর আরম্ভ না হইয়া দক্ষিণায়নান্তস্থানে সূর্য্যোদয় ও শীতঋতু আরম্ভ হইতে দেখা গেল। ৩৬০ দিনে বর্ষ গণনা করিলেও ১৭ বৎসর অন্তে ঋতুর ঐরূপ বিলম্বে আগমন দৃষ্ট হয়। বর্ষ পরিমাণ সম্বন্ধে এই ভুল দেখিতে পাইয়া এবং সূর্য্যই বর্ষ প্রবর্ত্তনের কারণ জানিয়া সূর্য্যের গতি ও অবস্থান প্রতি প্রাচীন মানবের দৃষ্টি পড়িল। আকাশে নক্ষত্র ভিন্ন অবস্থান নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই, সুতরাং সূর্য্য কখন্ কোন্ নক্ষত্রের কি পরিমাণ অধোভাগে উদয় ও অস্ত হয় তাহা দেখিয়া বর্ষ ও ঋতু সকলের আদি অন্তে সূর্য্যের অবস্থিতিস্থান নির্ণয় ও তদনুসারে সূক্ষ্মরূপে বর্ষ পরিমাণ অবধারণ কর্ত্তব্য বোধ হইল। এই পর্য্যবেক্ষণকালে দেখা গেল সূর্য্য যে কেবল দক্ষিণ হইতে উত্তরের ও উত্তর হইতে দক্ষিণের নক্ষত্রে গমন করে

তাহা নহে, কিন্তু পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখেও গমন করিয়া থাকে, সুতরাং প্রত্যহ প্রভাতের একই সময় পূর্ব্বে ও সন্ধ্যার একই সময় পরে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে উদয়গামী সূর্য্যের অব্যবহিত ঊর্দ্ধস্থ নক্ষত্রগণ সূর্য্য হইতে দিন দিন পশ্চিমদিকে সরিয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, এবং অস্তগত সূর্য্যের ঊর্দ্ধস্থ নক্ষত্রগণ দিন দিন পশ্চিমদিকে সূর্য্যাভিমুখে সরিয়া অস্তমিত হইয়াছে, এবং বর্ষ প্রারম্ভে যে নক্ষত্র সূর্য্য হইতে যত ঊর্দ্ধে দৃষ্ট হইয়াছিল, বর্ষ অন্তে পুনঃ তত ঊর্দ্ধে দৃষ্ট হয়। দেখা গেল যে ৩৬৫ দিনে সূর্য্যের পূর্ব্বমুখে নক্ষত্রচক্র পরিভ্রমণ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণায়ন গমন এই উভয়বিধ গতিই শেষ হয়। সুতরাং ৩৬৫ দিনে বৎসর নির্ণীত হইয়া তাহা পূর্ব্ববৎ ১২ "সৌরমাসে" বিভক্ত হইল এবং আকাশে "রবিমার্গ" ও ১২ মাসের অনুসরণে ১২ 'রাশি'তে বিভক্ত "রাশিচক্র" চিহ্নিত হইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকৃত সূত্রপাত হইল।

শ্রীঃ——

একটী প্রাচীন কবিতা।

—o—

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ক্ষীরগ্রাম একখানি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ যোগাদ্যা দেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি এবং তাঁহার নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় লোকেরা সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে দেবীর শরণাপন্ন হইয়া থাকে। শুভসাধন বা অশুভ নিবারণ উদ্দেশে, দুরারোগ্য রোগের আরোগ্য কামনায় এবং বন্ধ্যা রমণীগণ সন্তান প্রার্থনায় দেবীর 'মানত' ও পূজা সম্পাদন করিয়া থাকে। দেবী স্থানীয় নরনারীর বিশ্বাসমতে "জাগ্রত দেবতা"। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহাসমারোহে দেবীর মন্দির পার্শ্বে মহামেলার সমাবেশ হইয়া থাকে। ঐ সময় বহুদূরসমাগত সহস্রাধিক যাত্রীগণের সহিত পণ্য ব্যবসায়ী

দোকানদার, কীর্ত্তনীয়া ও গায়ক সম্প্রদায় ক্ষীরগ্রামে আসিয়া মেলার উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। মন্দিরের অনতিদূরে 'ধামচ' নামক একটী পুষ্করিণী আছে। তাহার জলের পাবনীশক্তিও যাত্রীসকলের স্বীকৃত। সুতরাং স্নান পানের নিমিত্ত ঐ পুষ্করিণীর জল প্রীতি ও ভক্তি সহকারে সমাগত যাত্রীগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গের প্রাচীন কবি রামায়ণের প্রথম পদ্য বঙ্গানুবাদক কীর্ত্তিবাসের নাম বঙ্গবাসী পুরুষরমণীর নিকট সুপরিচিত। আপামর সাধারণ সকলেই রামায়ণের পবিত্র বৃত্তান্ত তাঁহারই কাব্যপ্রসাদে জানিয়াছে। অশেষ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয় হইতে সামান্য তৈল লবণ বিক্রয়ী মুদি, এমন কি বর্ণজ্ঞান শূন্য ইতরলোক, নিরক্ষর নারীগণপর্য্যন্ত সকলেই কীর্ত্তিবাসের রামায়ণের অমৃতময়ী লোক-পাবনী 'রামলীলা' পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। রামসীতার চরিত্র সর্ব্বজন মনোহর, সর্ব্বকালতোষক, সর্ব্বাবস্থায় শান্তিপ্রদ এবং সর্ব্ববাদীসম্মত হইলেও কবিবর কীর্ত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথমে সেই চরিত্র বঙ্গবাসীর নিকট প্রচার করিয়া দেন। অমর কবি বাল্মীকির সুধাস্যন্দিনী দেবভাষায় রামায়ণ আদৌ রচিত ও লিপিবদ্ধ থাকাতে সাধারণতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের তাঁহার অপূর্ব্বকাব্যের রসাস্বাদন করিবার কোন আশা বা সম্ভাবনা নাই। কথক মহাশয়দিগের বক্তৃতাদ্বারা রামায়ণ কথা সাধারণে শুনিতে পাইত। কিন্তু যেমন উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ভক্তকবি তুলসীদাস তেমনি বঙ্গপ্রদেশে প্রাচীনকবি কীর্ত্তিবাস রামায়ণ বর্ণিত ঘটনাবলী ও চরিত্রাবলী সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানগোচরে আনিয়াছেন। আমাদের প্রকাশিত প্রাচীন কবিতাটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি কীর্ত্তিবাসের লেখনী প্রসূত। হস্তলিখিত প্রাচীন রামায়ণের প্রথমে এই "যোগাদ্যা বন্দনা" কবিতাটী লিখিত থাকার বিষয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের প্রমুখাৎ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে মুদ্রিত রামায়ণে তাহার প্রচার দৃষ্টিগোচর হয় না।

আমরা জনৈক প্রাচীনা স্ত্রীলোকের প্রমুখাৎ কবিতাটী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ প্রকাশিত কবিতাটীতে কীর্ত্তিবাসের সহজ কবিত্ব, প্রগাঢ় ভক্তি ও সরল বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাইবেন এই বিশ্বাস ও ভরসাতেই আমরা কবিতাটী তাঁহাদিগকে উপহার দিলাম। "যোগাদ্যা সংগীত" বলিয়া এক প্রকার গানও বর্দ্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। যদি সময় সুযোগমত তাহা হস্তগত হয়, সময়ানুসারে তাহাও উপহার দিবার বাসনা রহিল।

যোগাদ্যা বন্দনা।

জয় জয় যোগাদ্যামাতা ক্ষীরগ্রাম বাসী।
অবনীতে সিদ্ধি পীঠ মার গুপ্ত বারাণসী॥
বামহস্তে খর্পর মার দক্ষিণহস্তে খাণ্ডা।
রাবণের ঘরে ছিলেন দেবী উগ্রচণ্ডা॥
দৈব দোষে বনবাসে গেলেন শ্রীহরি।
ঘোরকাননে রামের সীতা হৈল চুরি॥
জানকী হারায়ে রামের মনে হৈল শঙ্কা।
হনুমানে অন্বেষণে পাঠাইল লঙ্কা॥
হনুমানের হাতে লঙ্কা সমর্পণ করি
পাতালে মহীর ঘরে গেলেন মহেশ্বরী॥
রাবণ তনয় সেত মহীরাবণ নাম।
পাতালে হরিয়া নিল লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
রামের উদ্দেশে গেল বীর হনুমান্।
মহীমুণ্ড কেটে তথায় দিল বলিদান॥
সঙ্গে করি নিল তখন দেবী দশভুজা।
ক্ষীরগ্রামে গিয়া মাতা হবে তোমার পূজা॥
বিশ্বকর্ম্মায় আজ্ঞা দিল বীর হনুমান।

অক্ষয় বিশাল দেউল করহে নির্ম্মাণ ॥
মহামায়া স্থাপন করিছেন ততক্ষণ।
রাবণ বধিয়ে দেশে এলেন নারায়ণ ॥
হরিদত্ত নামে রাজা আছেন শুইয়ে।
স্বপ্নকথা কহেন মাতা শিয়রে বসিয়ে ॥
তোলরে তোলরে গা বাছা হওরে চেতনা।
কৈলাস ছাড়িয়ে এলাম হরের অঙ্গনা ॥
তোমারে প্রসন্ন হলেম আমি ভদ্রকালী।
নিত্য পূজা কর মোরে দিয়ে নরবলি ॥
শশব্যস্ত হয়ে রাজা তুলিছেন গা।
শিয়রে বসিয়ে আছেন জগতের মা।
প্রণাম করিয়া রাজা কহেন কৃতাঞ্জলি।
রাজা বলে নিত্য কোথা পাব নরবলি ॥
নিত্য ভগবতী তুমি কর প্রাণদান।
আপনারই মুণ্ড কেটে দিইহে বলিদান ॥
ঈষৎ হাসিয়া বলেন দেবী ভদ্রকালী।
শুনরে শুনরে বাছা পূজার নিয়ম বলি ॥
সমস্ত বৈশাখ মাসে হরিদ্রা নহি বাঁটি।
সমস্ত বৈশাখ মাসে অন্নে নাহি কাঠি ॥
উত্তর দুয়ারী ঘরে না করিবে বাস।
সন্ধ্যাকালে আরতি করিবে বারমাস ॥
সমস্ত বৈশাখ মাসে না বহিবে হাল।
সংক্রান্তির দিনে পূজিবেক চিরকাল ॥
গর্ভবতী নারী যার থাকিবেক ঘরে।
সমস্ত বৈশাখ সে রাখিবে স্থানান্তরে ॥
নিয়মে করিবে পূজা বিবিধ বিধানে।

সমস্ত বৈশাখ মাস রহিবে সাবধানে ॥
স্বপ্নকথা কহেন মাতা দেবী দশভুজা।
প্রভাতে উঠিয়ে রাজা করিলেন পূজা ॥
ধূপদীপ নৈবেদ্যভোগ নানা উপহার।
অনেক অজা মেষ দিল কি বলিব আর ॥
এইমতে পুজে রাজা বিবিধ প্রকার।
আপনার পুত্র কাটি দিল উপহার ॥
সাতদিন পুজে রাজা দিয়ে সাত বালা।
অবশেষে করে দিল ক্ষীরগ্রামে পালা ॥
সকল গ্রামের পালা নিবরিয়া গেল।
পূজারী ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হইল ॥
পূজারী ব্রাহ্মণ ভাবে কি হবে উপায়।
কেমনে এড়াব আমি এই মহাদায় ॥
এক পুত্র বই আমার দ্বিতীয় পুত্র নাই।
কি দিয়ে পুজিব আমি মহামায়ার ঠাঁই ॥
প্রাণরক্ষা না হয় আমার ক্ষীরগ্রামে রয়ে।
স্ত্রীপুত্র লইয়ে আমি যাই পলাইয়ে ॥
স্ত্রীপুত্র লইয়া দ্বিজ পলাইয়া যান।
গম্ভীরায় থাকিয়া দেবী দেখিবারে পান ॥
ব্রাহ্মণের মনোভাব মনেতে জানিয়ে।
ব্রাহ্মণীর বেশে পথ আগুলিলেন গিয়ে ॥
এত রাত্রে দ্বিজবর যাওহে তুমি কোথা।
বুঝি পলাইয়া যাও খেয়ে মোর মাথা ॥
ব্রাহ্মণ বলেন মাগো বলিতে ভয় বাসি।
যোগাদ্যা নামেতে রাজা এনেছে রাক্ষসী ॥
সাত দিন পুজে রাজা দিয়ে সাতবালা।

অবশেষে করে দিল ক্ষীরগ্রামে পালা ॥
প্রাণরক্ষা না হয় আমার ক্ষীরগ্রামে রয়ে।
স্ত্রীপুত্র লইয়ে আমি যাই পলাইয়ে ॥
ঈষৎ হাসিয়ে বলেন দেবী কাত্যায়নী।
যাঁর ভয়ে পলাও দ্বিজ সেই দেবী আমি ॥
ব্রাহ্মণ বলেন মাগো জানিব কেমনে।
তোমার অপার মায়া বুঝে কোন্ জনে ॥
আশ্বিনে অম্বিকামূর্ত্তি দেখিবারে পাই।
তবে ত প্রত্যয় হয় ফিরে ঘরে যাই ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে দেবী নারায়ণী।
ব্রাহ্মণের সম্মুখে দাঁড়ালেন মা মহিষমর্দ্দিনী ॥
বামদিকে কার্ত্তিক মায়ের দক্ষিণে গণপতি।
দুইদিকে শোভে মায়ের লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
সিংহ পৃষ্ঠে আরোহন দশভুজারূপে।
হাতে শূল করে মারেন অসুরের বুকে ॥
রূপ দেখি দ্বিজ বলে করিয়া প্রণাম।
স্বহস্তে আমার মুণ্ড লওহে বলিদান ॥
ঈষৎ হাসিয়া বলেন দেবী ভবরাণী।
শুন দ্বিজ ব্রহ্মহত্যা না করিয়ে আমি ॥
আজি থেকে নরবলি আসিবে দেশে দেশে।
রাত্রিকাল রেখে তারে কাটিবেক শেষে ॥
এতেক বলিয়ে মাতা বসিলেন গম্ভীরে।
স্ত্রীপুত্র লইয়ে দ্বিজ ঘরে এল ফিরে ॥
একদিন মহামায়া বটবৃক্ষতটে।
স্নানছলে বসেছেন ধামচের ঘাটে ॥
অঙ্গের মার্জ্জনা করেন দেবী মহেশ্বরী।

হেনকালে শঙ্খ লয়ে আইল শাঁকারী ॥
শাঁকারী দেখিয়া মাতা পুছেন সত্বর।
কিসের পসরা তোমার মাথার উপর ॥
শাঁকারী বলেন মাতা বলি তব ঠাঁই।
শঙ্খ বেচিবারে আমি ক্ষীরগ্রামে যাই ॥
শঙ্খ শুনি খুসী হলেন জগতের মা।
রামলক্ষ্মণ * দুই বাই পরাইয়ে যা ॥
শাঁকারী বলেন মাগো বসে আছ একা।
কেমনে পরাই শঙ্খ মনে হয় শঙ্কা ॥
পার্ব্বতী বলেন বাছা পরিচয় দি।
পূজারী ব্রাহ্মণ আছেন তারি আমি ঝি ॥
পাঁচ তঙ্কা আছে আমার কুলুঙ্গি উপরে।
পাঁচ তঙ্কা পাবে তুমি পিতা বরাবরে ॥
এতেক শুনিয়া শাঁকারী মনে খুসী হয়ে।
শঙ্খ পরাইতে বসে তেল হরিদ্রা লয়ে ॥
হাতে শঙ্খ করি বণিক্ একদৃষ্টে চায়।
হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম দেখিবারে পায় ॥
শাঁকারী বলেন মাগো দেহ পরিচয়।
কপট ছাড়িয়ে মাতা কহত নিশ্চয় ॥
শুনিয়া হাসিয়া বলেন দেবী ভগবতী।
বিপ্রবংশে জন্ম আমার নামরে পার্ব্বতী ॥
কি বলে পরিচয় আমি দিইরে তোমারে।
দরিদ্র স্বামী আমার অন্নদিতে নারে ॥
কিছু সুখ নাই মোর সতীনের ডরে।
দুইটী পুত্র লয়ে আমি থাকি বাপের ঘরে ॥

* শঙ্খের উপরে রামলক্ষ্মণের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত বলিয়া দুইটী বাই শঙ্খের নাম রামলক্ষ্মণ ॥

যাওরে যাওরে বণিক্ যাও শীঘ্রগতি।
শঙ্খ পরিলেন তোমার কন্যা ভগবতী॥
পাঁচ তঙ্কা আছে আমার কুলুঙ্গি উপরে।
পাঁচ তঙ্কা পাবে তুমি পিতা বরাবরে॥
শঙ্খ পরাইয়ে বণিক্ করিছেন প্রণাম।
ক্ষীরগ্রাম দিয়ে তবে করিল পয়াণ॥
দেবীর মন্দিরদ্বারে উত্তরিল গিয়ে।
পূজারী ব্রাহ্মণে দেখি কহে প্রণমিয়ে॥
কি কর কি কর দ্বিজ—ঘরেতে রহিয়ে।
তোমার কন্যা শঙ্খ পরেছেন ধামচে বসিয়ে॥
কি বল কি বল বণিক্ কি বলিস্‌রে বেণে।
এক পুত্র বই আমার দ্বিতীয় নাই'ক কন্যে॥
বলিতে বলিতে দ্বিজ ঘরে প্রবেশিল।
কুলুঙ্গি উপরে গিয়ে পাঁচ তঙ্কা পেল॥
টাকা পেয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে ভুমিতলে।
ব্যস্ত হয়ে বণিক্ তবে দ্বিজবরে তোলে॥
লওরে লওরে বণিক্ চল শীঘ্রগতি।
কোথারে দেখেছ আমার কন্যা ভগবতী॥
ব্রাহ্মণে বণিকে গেলেন বটবৃক্ষ তটে।
সেখানে না দেখেন মায়ে ধামচের ঘাটে॥
অঙ্গ আছাড়িয়া ব্রাহ্মণ করিছে রোদন।
কৃপাকরি ভগবতী দেহ দরশন॥
ব্রাহ্মণের বিলাপ শুনি মায়ের দয়া উপজিল।
জলে থেকে দুটি বাই শঙ্খ দেখাইল॥
ব্রাহ্মণ বলেন বণিক্ বড় ভাগ্য মানি।
নয়নে দেখেছ মাকে জগৎ জননী॥

শাঁকারী বলেন মাগো যাবৎ বাঁচিব।
মার তরে দুইবাই শঙ্খ আনি দিব॥
মায়ের অনন্ত মায়া কে বুঝিতে পারে।
যার মায়া ব্যাপ্ত আছে জগৎ সংসারে॥
সে মায়ায় বিমোহিত বণিক্ ব্রাহ্মণ।
উভয়েতে বন্ধুভাবে করে আলিঙ্গন॥
ব্রাহ্মণ বণিক্ গেল নিজ নিজ স্থানে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বাখানে॥

গোবিন্দ দাস।

যাঁহারা চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী ও প্রচারকার্য্যের সহায় ছিলেন, মহাত্মা গোবিন্দদাস কর্ম্মকার তন্মধ্যে একজন অতি প্রধান ব্যক্তি। বৈষ্ণবকবি ও ভক্তগণের মধ্যে অনেক গোবিন্দ দাসের নাম শুনা যায়, কিন্তু তন্মধ্যে এই গোবিন্দ দাসই সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু পূর্ব্ব হইতে দিবারাত্রি চৈতন্যের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন, এবং যে দিন যাহা ঘটিত তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। যে দিন চৈতন্যচন্দ্র জীবোদ্ধারের জন্য কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, গোবিন্দও সেইদিন কৌপিন পরিয়া প্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। নিরম্বু উপবাস, দুর্গম পথভ্রমণক্লেশ তুচ্ছ করিয়া তিনি বিবিধ তীর্থভ্রমণ ও প্রচারকালে চৈতন্যদেবের একমাত্র সঙ্গী ও পরিচারক ছিলেন। যে দিন যে ভাবে যাইত, যথায় বিশ্রাম বা সঙ্কীর্ত্তন হইত, যাহা আহার হইত, যে ভা যাহাকে উদ্ধার করা হইত, গোবিন্দ সেই সকল প্রাত্যহিক বি অতি সন্তর্পণে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার এই দিন-লিপি ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ দাসের কড়চা অতি প্রামা চৈতন্যদেবের জীবনী ও প্রচারকার্য্যের বিবরণ জানি

উৎকৃষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ আর কিছু নাই। কড়চার লিপিও অতি সরল। উহার কোথায়ও অতিরঞ্জন বা অবিশ্বাস্য ঘটনার ছায়া মাত্রও নাই। যে দিন যাহা ঘটিয়াছে অবিকল তাহাই বর্ণিত আছে। অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই। এমন কি, গোবিন্দ কোন্ দিন কয়খানি করলা ভাজা খাইয়াছেন, তাহা পর্য্যন্তও লিখিতে ছাড়েন নাই। চৈতন্যের স্বলিখিত কোন গ্রন্থ না থাকায় অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। * এ গ্রন্থে সে আক্ষেপ সম্পূর্ণ দূর না হইলেও ভক্ত-হৃদয় অনেক শান্ত হইতে পারিবে। চৈতন্যদেব যখন যে উপদেশ দিতেন, যাহার সহিত যে ধর্ম্মকথা কহিতেন গোবিন্দ যথাযথ তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। সে উপদেশ বড় সরল, বড় মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই শান্তিপ্রদ। উহাতে পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব নাই, ভাষার আড়ম্বর নাই, আছে কেবল সরল প্রাণের গভীর ব্যাকুলতা এবং জীবের জন্য অপার্থিব প্রেম আর অশ্রু। গোবিন্দের কড়চা সেই জগৎমাতান প্রেম আর অশ্রুর [illegible]।

কড়চায় গোবিন্দের জীবন অতি সরলভাবে বর্ণিত আছে। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাঞ্চননগরে গোবিন্দের বাসস্থান ছিল। গোবিন্দের পিতার নাম শ্যামাদাস কর্ম্মকার, মাতার নাম মাধবী, স্ত্রীর নাম শশিমুখী। গোবিন্দ দাস স্বজাতি-ব্যবসায়—অস্ত্র, হাতা, বেড়ি গড়িয়া দিন কাটাইতে ছিলেন; ইহার মধ্যে এক দিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে নির্গুণ, মুর্খ বলিয়া গালি দিলে তাঁহার মনে বড় ধিক্কার জন্মিল। অভিমান করিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। কাটোয়ায় আসিয়া চৈতন্যের নাম ও প্রেমভক্তির কথা শুনিতে পাইলেন। ১৪৩০ শকে গোবিন্দ দাস গৃহ ত্যাগ করেন। তখনও চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। নবদ্বীপে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস তখন পূর্ণ হইতে চলিয়াছে,

* পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ চৈতন্যের মত ও উপদেশ বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে চৈতন্যের উপদেশ সহ গ্রন্থকর্ত্তৃগণের বিদ্যাবুদ্ধিও যে প্রচুর মিশ্রিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। এজন্য তত্ত্বান্বেষীর সম্যক তৃপ্তি হয় না।

নবদ্বীপ লীলার প্রায় শেষ সময় আসিয়াছে। লোকমুখে চৈতন্যের প্রেমভক্তি ও অলৌকিক ভাবাবেশের কথা শুনিয়া গোবিন্দের চৈতন্য দর্শনের জন্য প্রবল অনুরাগ জন্মিল। সারাদিন হাটিয়া প্রাতে গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপে আসিলেন। শ্রীবাস অঙ্গনের নীচে গঙ্গার যে ঘাট ছিল, উহার নাম মিশ্রঘাট। শ্রীবাসের বাড়ীর নিকটেই রাজা বল্লাল সেনের ভাঙ্গাবাড়ী ও এক প্রকাণ্ড দীঘি ছিল। উহার নাম বল্লাল-সাগর। গোবিন্দ ঘাটে বসিয়া নানাকথা ভাবিতেছেন এমন সময় চৈতন্য কটিতে গামোছা বাঁধিয়া সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, দামোদর, সিদ্ধহরিদাস ও গদাধর। অদ্বৈত গোস্বামী সকলের শেষে আসিলেন। অদ্বৈত গোঁসাইর কথা গোবিন্দ লিখিয়াছেন—"এমন তেজস্বী মুহি কভু দেখি নাই।"

এই সময় অদ্বৈত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার কেশশ্মশ্রু পাকিয়া গিয়াছিল। তথাপি বিশ্বম্ভরাদি যুবকগণের সহিত চীৎকার সহ হরিধ্বনি করিয়া জলক্রীড়া করিতে ছাড়েন নাই। আধুনিক সভ্যতার পীড়নে অজাতশ্মশ্রু বালক যেরূপ, সর্ব্ববিধ ক্রীড়া কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে, সেকালে এমন জড়তার প্রাদুর্ভাব ছিল না। তখন বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই ক্রীড়াপর সতত প্রফুল্ল ও উৎসাহশীল ছিল।

গোবিন্দ, চৈতন্যের যে আকৃতি ও কার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে চৈতন্যের একখানি সুন্দর মূর্ত্তি মনোমধ্যে প্রতিভাত হয়। গোবিন্দ লিখিয়াছেন, চৈতন্যের কেশ, কুঞ্চিত ও সুদীর্ঘ ছিল। উহা পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িত। সে কালে এইরূপ দীর্ঘকেশ রাখার প্রথা ছিল। তাঁহার চক্ষু নীলপদ্মদলসদৃশ দীর্ঘ, কপোল সুন্দর, ললাট প্রশস্ত। তাঁহার স্বাভাবিক গমনও নৃত্য-প্রায়। ঊরু রামরম্ভা সদৃশ, ভুরু দুইটী যেন তুলি দিয়া আঁকা, পদতল লোহিত বর্ণ, শরীরটি যেন প্রেমে গড়া। চৈতন্য যাহাকে সম্মুখে পান তাহাকেই কোল দেন।

হরি বলিলে তাঁহার পিচকারীর ধারার মত অশ্রুপাত হয়।

চৈতন্যের রূপ ও জলক্রীড়া দর্শন করিয়া গোবিন্দের মনে চৈতন্যের প্রতি ঈশ্বরবোধ ও ভক্তির উদয় হইল। তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিয়া কম্প হইতে লাগিল। ঘর্ম্মে কাপড় ভিজিয়া গেল। গোবিন্দ কাঁদিয়া চৈতন্যের পদতলে পড়িবার জন্য অস্থির হইলেন। পূর্ব্বে লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে শচীর গৃহে ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। যে গৃহবিচ্ছেদ সূত্রে তাহার এই সৌভাগ্য ঘটিল, তাহা স্মরণ করিয়া গোবিন্দ হৃষ্ট হইলেন।

চৈতন্য স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। গোবিন্দকে ঘাটের নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া "আড়চক্ষে" তাহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। তার পর ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিলেন, যেই চৈতন্য নিকটে আসিলেন, অমনি গোবিন্দ তাহার চরণ ধরিয়া গড়াগড়িদিতে লাগিলেন। চৈতন্য গোবিন্দের হাত ধরিয়া বসাইলেন। গোবিন্দ যোড়হাতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চৈতন্য হাসিয়া হাসিয়া তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ কহিলেন, প্রভু এ অধমের নাম গোবিন্দ, পিতার নাম শ্যামাদাস, নিবাস বর্দ্ধমান কাঞ্চননগর। পূর্ব্বে গৃহস্থ ছিলাম। তোমাকে দেখিবার জন্য বিষয় ছাড়িয়াছি, এখন আমাকে—চরণে স্থান দেও। চৈতন্য কহিলেন—গোবিন্দ তুমি আজ অবধি আমার বাড়ী থাক, আমার গৃহে তোমার প্রতিপালন হইবে। তুমি কেবল সেবারকর্ম্ম করিবে আর প্রসাদ পাইবে। এই বলিয়া চৈতন্য গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া গৃহে আসিলেন। ১৪৩০ শাকের পৌষ মাসে গোবিন্দ চৈতন্যের গৃহে স্থান পাইলেন।

নগরের দক্ষিণ সীমায় গঙ্গার ঘাটের উপরে চৈতন্যের বাড়ী ছিল। বল্লালসাগর নামে প্রকাণ্ড দীঘি উহার নিকটে ছিল। বাড়ীতে পাঁচখানি বড় ঘর ছিল। পরিবারের মধ্যে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। শচী-

দেবী শান্তমূর্ত্তি ও খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বড় লজ্জাবতী ও বিনীতা ছিলেন। গোবিন্দ এই পরিবারের মধ্যে থাকিয়া বড় সুখী হইলেন। গোবিন্দ বড় পেটুক ছিলেন। প্রতিদিন চৈতন্যের ভোজন হইয়া গেলে, সেই পাতে শাক, সুপ, দধি, সুক্তা, মোদক, পায়স, বড়া ও লাড়ু দিয়া আকণ্ঠ ভোজন করিতেন। চৈতন্যের দাস বলিয়া নবদ্বীপবাসী সকলেই তাহাকে আদর করিত।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

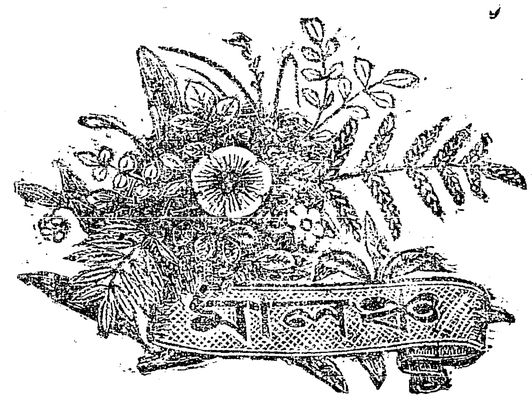

পূর্ব্বজন্ম-বাদ।

রূপায় ঝিনুক মুখে, মুক্তাহার গলে,
কেন আসে একজন অবনীমণ্ডলে!
অপরে বা কি কারণে অভাবের রাশি,
কোমল মস্তকে ব'য়ে ধীরে ধীরে আসি
দেখা দেয় ধরা মাঝে? জননীর স্তনে
নাহি ক্ষীর দারিদ্র্যের কঠোর দোহনে।
দিব্য পুষ্ট নবনীত অক্ষত শরীর
নিয়ে কেহ জন্মে; পুনঃ হেরি কোনটীর
জন্মমাত্র অন্ধনেত্র; তা দেখি জননী
কপালে হানিছে কর পরমাদ গণি।
এ জন্মের কর্ম্মফল হ'লে এ জনমে,
সদ্যোজাত শিশুপ্রতি খাটে তা কেমনে?
অতএব পূর্ব্বজন্ম সুকৃতি দুষ্কৃতি
ঘটাইছে এ জনমে সুখ দুঃখ নিতি।

হলো যেন সমস্যার আপাত-সুন্দর
মীমাংসাটী; তোমরা তো যে যাহার ঘর
চ'লে গেলে হাসি মুখে;— মস্তক হইতে
কত গুরুভার যেন নামিল ত্বরিতে।
আমি কিন্তু যে মুহূর্ত্তে গৃহে আপনার
প্রবেশিয়ে নিরখিনু,—ছেলেটী আমার
(তৃতীয়-বরষ শিশু—অবোধ সরল)
সাটীনের জামা লাগি কাঁদিয়ে বিকল,
মা তাহার বুঝাইছে—ভুলাইছে কত,
চাহিয়ে আমার পানে আঁখি অশ্রুনত;
দরিদ্র অক্ষম আমি, কহিনু সন্তাপে—
"আমারো কি বাছা ভোগে পূর্ব্বজন্ম-পাপে
দূর হোক্, মীমাংসায় নাহি মোর সাধ,
চুল্লীতে যাউক তব পূর্ব্বজন্ম-বাদ।"

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সার্থকতা।

আমি সদা ভাবি সেই কথা,
জীবনের কিসে সার্থকতা ?—
প্রফুল্ল কুসুম সম, সোনার শিশুটী মম
আননে মাখানো মরি করুণা মমতা !—
অই টুকু বুকে নিলে, চাঁদ মুখে চুমো দিলে,
স্বরগের সুখ মিলে,সে তো খাটি কথা,
এই ভবে পুণ্যধর্ম্ম, এই সার্থকতা ?

২

অথবা এ সংসার ছাড়িয়া,
বেড়াইব "সন্ন্যাসী" হইয়া,
ক্ষুদ্র গৃহ পরিহরি, জগতে "আমার" করি,
আপনা—মনের সাধে দিব বিলাইয়া ?
তা হলে কি ভগবান্, সার্থক হইবে প্রাণ ?
কি চাও আমাতে, তাই দাও বুঝাইয়া।

৩

বুঝি, ভ্রান্ত আমি গিয়াছি ভুলিয়া,
সুখে দিছি অসুখ মাখিয়া।
নিষ্ঠুর নির্ম্মম স্বার্থ, করিয়াছে অপদার্থ,
আরাম আনন্দ তাই গিয়াছে চলিয়া !
ভুলেছি কর্ত্তব্য পুণ্য, তাই হৃদি এত শূন্য,
সংসার সন্ন্যাস দোঁহে হাসিছে দেখিয়া !

৪

তবে কেন—প্রহেলিকা নয়,
প্রাণ যদি দেবতার হয়।
তবেই সকলি পুণ্য, সুখ শান্তি পরিপূর্ণ,
সংসার সন্ন্যাস তুল্য, সত্য সুধাময় !
খোকার সোণার মুখ, অথবা পরের সুখ,
আমার বাঞ্ছিত সবি, ছোট বড় নয় !
বাধা কিসে বিঘ্ন কিসে, কেন গো জলিব বিষে,
দেবের সন্তান আমি সে কথা নিশ্চয়
জীবনের সার্থকতা, তা হলেই হয়।

শ্রীকনকাঞ্জলি রচয়িত্রী।

প্রতীক্ষায়।

আমি প্রেমে অনুরাগে সাজায়ে হৃদয়
বসে আছি কুতুহলে।
এই পিককুহুরিত অলিমুখরিত
বিনোদ বকুলতলে।
আমি পত্রমর্ম্মরে চাহি চারিধার
ঝঙ্কারে চমকি বিপিনবীণার
বিগলিত হয়ে মরম আমার
উছলে নয়ন জলে।
আছি প্রেমে অনুরাগে সাজায়ে হৃদয়
উপহার দিব বলে।
আমি রচিয়াছি মালা নব মল্লিকার
মেখেছি কামনা দলে দলে তার
প্রীতিময়ী মম প্রেমপ্রতিমার
পদতলে দিব ঢেলে।

শ্রীমনোমোহন সেন।

নবজীবন-ভিক্ষা।

হে নাথ অন্তর্যামি তোমার নিকটে,
কোন দিন্ বলা কওয়া কিছুই না ঘটে !
সংসারের শত কাজে পাই অবসর—
কেবল তোমার নাম লইতে কাতর।
তুমিত অন্তরে নও অন্তরে নিবাস
প্রিয় সম্ভাষণে তব নাই হে প্রয়াস।
কে দিল এ ভুল মেখে নর উপাদানে ?
বুঝি এর প্রতিক্রিয়া মানুষে না জানে।
প্রাণের দেবতা তুমি না করিও রোষ,
রোগীর চিকিৎসা নাই, রোগের কি দোষ ?
কর নাথ উপদেশ হৃদিমাঝে থেকে
নূতন জীবন লভি নামসুধা মেখে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

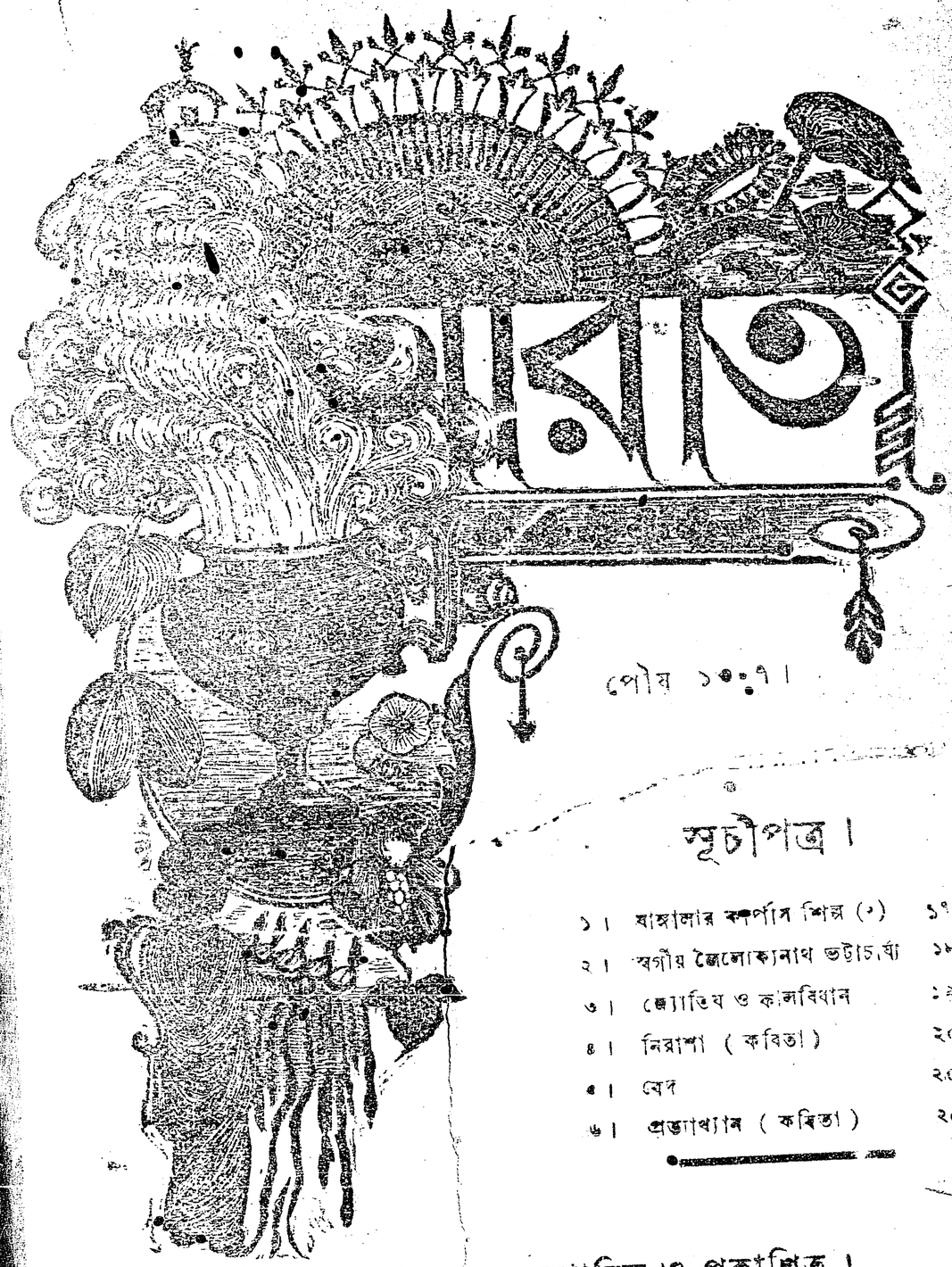

পৌষ ১৩০৭।

সূচীপত্র।

১।	বাঙ্গালার কর্পাস শিল্প (২)	১৭৭
২।	স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য	১৮৮
৩।	জ্যোতিষ ও কালবিধান	১৯৮
৪।	নিরাশা (কবিতা)	২০৪
৫।	বেদ	২০৫
৬।	প্রত্যাখ্যান (কবিতা)	২০৮

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ময়মনসিংহ বাসন্তী যন্ত্রে—শ্রীরামচন্দ্র অনন্তদ্বারা মুদ্রিত।
বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা ৵০ তিন আনা।

এই সংখ্যার লেখকগণ—

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ——বি, এ, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, ও শ্রীযুক্ত রণীমোহন ঘোষ বি, এল।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন—

যে সদাশয় গ্রাহক অনুগ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া এপর্য্যন্ত আরতির মূল্য প্রদান করিয়াছেন তাহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যাঁহারা আজও অনুগ্রহ করেন নাই, আশা করি তাঁহারা আমাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন।

অনেকে "আরতি" অর্দ্ধমূল্যে বা কম মূল্যে পাইবার জন্য লিখিয়াছেন, আরতি ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত আছি। ঈশ্বর ইচ্ছায় "আরতি" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতে পারিলে সর্ব্বসাধারণেই যাহাতে "আরতি" পাঠ করিতে পারেন এরূপ বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিব।

সুখে দিছি অসুখ মাখিয়া।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

৯০	A. C. Sen Esqr. D. Judge	১৷৷০	৪৮	বাবু সুশীলচন্দ্র চৌধুরী	১৷০
১২৫	বাবু প্রসন্নকুমার গুহ বি এল	১৷৷০	১৯৫	,, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৷৷০
৬১	,, কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক	১৷৷০	৩৮৫	,, জগৎচন্দ্র দত্ত	১৷০
৩৯২	,, কৈলাসচন্দ্র নাগ	১৷৷০	২৩৪	,, গিরিজাকান্ত সেন	১৷৷০
২৬০	,, বিধুভূষণ দাস	১৷৷০	২৬৬	,, তারকেশ্বর দাস গুপ্ত	১৷০
৩২২	,, ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী	১৷৷০	২৬১	,, জগৎনারায়ন পত্তনবিশ	১৷৷০
২৭৮	,, কেশবনাথ সাধু	১৷০	১৮৩	,, ভূতচন্দ্র বর্দ্ধন	১৷৷০
৪৫৫	,, নীরদচন্দ্র দত্ত	১৷৷০	৩৫২	,, নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	১৷
৩৩১	শ্রীমতী বসন্তকুমারী দত্ত	১৷৷০	৩০১	,, পূর্ণচন্দ্র রায়	১৷০
৪৬	বাবু মদনমোহন দত্ত বি এল	১৷৷০	২৭১	,, জয়সুন্দর দত্ত	১৷০
৩৭৩	,, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	১৷০	৪৯৭	,, দীনেশচন্দ্র চৌধুরী	১৷০
৪৮৫	,, ঈশানচন্দ্র পাল	১৷০	৪৮৬	,, কৈলাসচন্দ্র পাল	১৷৷০
৭৮	,, কৃষ্ণকান্ত দে	৸৷০			

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার কার্পাস শিল্প। [২]

য়ুরোপীয় কলজাত বস্ত্রের প্রচুর আমদানীতে দেশীয় বস্ত্রব্যবসায় বিলোপ হইতে বসিয়াছে, এবং সেই কারণে দেশীয় তন্তুবায়দিগের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। দেশীয় শিল্পের উন্নতিরদিনে দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীরা সকলেই যথেষ্ট উন্নত অবস্থায় ছিল। তখন সকলেরই কোঠাবাড়ী ছিল এবং সুখে সচ্ছন্দে বাস করিত। অনেককেই ৬ মাসের অধিককাল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত না। ৬মাস কার্য্য করিয়া যে উপার্জ্জন হইত তাহাতেই বৎসরের বাকী ৬মাস বসিয়া খাইয়াও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকিত। অনেক তন্তু ব্যবসায়ী দেশীয় ধনবান লোকের নিকট নির্দ্দিষ্ট বেতন বা দাদন লইয়াও কার্য্য করিত। কাজেই তাহাদের অর্থাভাবের সম্ভাবনা ছিল না। উড়িষ্যা প্রদেশের তন্তুবায়দিগের নির্দ্দিষ্ট জায়গীর ছিল। পছন্দমত বস্ত্র যোগাইয়া সময় সময় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে ভূমির পট্টা [illegible] করিয়াও লইত। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ দৃষ্টান্তের একেবারে অভাব না হইলেও উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

এখন অধিকাংশ ব্যবসায়ী পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। কেহবা পৈতৃক অর্থে দোকান পাট করিয়াও প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে। কেহবা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বিশিষ্ট রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা এখনও তাঁত ছাড়িতে পারে নাই তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এমন কি দ্বিতীয় অবলম্বন ব্যতীত তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের পথই সুগম নহে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে একটা তাঁতে রোজ ৵০ কি ।০ আনার অধিক উপার্জ্জন করা যায় না। তাহা এক ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষেও যথেষ্ট নহে। অনেক ধনী তাঁতীরা উপযুক্ত বেতনদ্বারা কার্য্যকারক রাখিয়া ব্যবসা চালাইতে ও স্বদেশের

উন্নতি করিতে সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেরূপ সহৃদয় লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

দেশীয় শিল্পের অবস্থা শোচনীয় হইলেও বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের কোন কোন জেলায় এখনও বস্ত্রবয়ন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যে সকল স্থানে এখনও কলিকাতা হইতে মাল রপ্তানী করা সহজসাধ্য নহে সে সকল স্থানে—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, হিলচট্টগ্রাম, ত্রিপুরা অঞ্চলে এখনও পূর্ব্ব রীতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। সে সকল কেবল নিজ পারিবারিক অভাব মোচন জন্য মাত্র। চট্টগ্রাম ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের মগ, গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতি ও উড়িষ্যা ছোটনাগপুরের অসভ্যজাতীয় অধিবাসীরা বিলাতী অপেক্ষা দেশী বস্ত্রেরই অধিক আদর করিয়া থাকে। তাহারাও ব্যবসায়ের জন্য বস্ত্রবয়ন করে না, নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বস্ত্রবয়ন করিয়া থাকে মাত্র।

বিলাতী কলজাত বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায় অনেক পরিমাণে বিলোপ প্রাপ্ত হইলেও বঙ্গে ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, শান্তিপুর, সাতক্ষীরা, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার বস্ত্রশিল্প এই অধঃপতিত অবস্থায়ও নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পরাঙ্মুখ নহে। এই সকল স্থানে উপযুক্তরূপে চাষ করিলে কার্পাসও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যাইতে পারে।

ঢাকার মস্‌লিন ব্যবসায়ের একেবারে ধ্বংসসাধন হইলেও ঢাকার নাম মস্‌লিন জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। Mr. E. W. Collins সাহেবের রিপোর্টে তিনি লিখিয়াছেন যাহারা বিলাতী সূতায় সাধারণ রকমের মস্‌লিন প্রস্তুত করিতে পারে ঢাকাতে এখনও এরূপ ৫০০ ঘর ব্যবসায়ী আছে। ২।১টী পরিবার আজও এমন আছে যে সুপ্রসিদ্ধ ঢাকাই মস্‌লিনই প্রস্তুত করিতে পারে। ঢাকার অনেক প্রাচীন তাঁতী পরিবারের নবীনবংশধরগণ তাঁত ছাড়িয়া সোণারূপার ব্যবসায় ধরিয়াছে। আর কিছুদিন পরে এই সব তাঁতীর স্বর্ণ ব্যবসায়ী পুত্রগণ "তাঁত", "মাকু" প্রভৃতি জাতীয় ব্যবসায়সূচক শব্দগুলি নেহাৎ 'Hebrew' শব্দ বলিয়া মনে করিবেন; এই আশঙ্কা পরিণামে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

শান্তিপুর এখন ডুরাই কাপড়ের জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত ১৮৯৮ সনে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার কাপড়ের মধ্যে কেবল ২৫০০০ টাকার কাপড় নিজ জেলায় কাটিয়াছিল এবং বাকী সমস্তই বিদেশে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক ইহাকেও কম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করা যাইতে পারে না।

ফরাসডাঙ্গা আজও বয়নশিল্পের স্থায়িত্ব বিষয়ে নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

পাবনা কার্পাস শিল্প বিষয়ে বাঙ্গালার একটী প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ছোটধূল ও দোগাছির তাঁতীরা পরিষ্কার ধুতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। Mr. Collins বলেন য়ুরোপীয় শিল্পের অভ্যুত্থান পাবনার শিল্প ব্যবসায়ে আঘাত দিতে পারে নাই। * পাবনা জেলায় সলঙ্গা, রাধানগর, তাঁতীবাঁধ প্রভৃতি গ্রামে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হয়। সদল্যাপুর, নিশ্চিন্তপুর, আমিনাপুর এবং শিবপুরের জোলারা সূতার ব্যবসায়ও করিয়া থাকে। "পাবনাইপাইর" কাপড় ইহাদেরই প্রস্তুত। এই সকল বস্ত্রের সূতা বোম্বাই বা য়ুরোপীয় নহে।

বঙ্গের আর একটী স্থান শ্রীরামপুর। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারী ফিচ এই নগরের কার্পাস শিল্পের উন্নতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। † ষোড়শ শতাব্দীর অত্যুন্নত স্থান বর্ত্তমান শতাব্দীতে অবনতির চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামপুরে কার্পাস তুলার ব্যবসায় একেবারেই নাই। রেসমের কারবারই

* Report on the existing Arts & Industries of Bengal 1890.

† Historical & Descriptive account of British India Vol 1.

অধিক। শ্রীরামপুরের রেসমী বস্ত্র বোম্বাই প্রদেশে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কার্পাসের ব্যবসায় এখন এক প্রকার বিনাশোন্মুখ। তথাপি সাতক্ষীরার ধূতি, চাদর, সাটী এবং চারখানার নাম আজও বিলুপ্ত হয় নাই। বাজারে ঐ সকল জিনিস পাওয়া গেলে প্রচুর সম্মান লাভ করে।

রঙ্গপুরের বাকরা এবং ভাগলপুরের গালিচা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বীরভূমে আজকালও রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কুমিল্লার "ময়নামতি" বর্ত্তমানসময়ে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। টীপারাদিগেরদ্বারা নির্ম্মিত পাহাড়িয়া তুলা ও কার্পাস সংযুক্ত ময়নামতির চারখানা বর্ত্তমান সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রেও প্রচুর প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়াছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত বাজিৎপুরের সুপ্রসিদ্ধ গোলাবতন সাটী এখন এক রকম অপ্রাপ্য। কিশোরগঞ্জের উড়নি ও তঞ্জাব বৈদেশিক আমদানীর তুলনায় অতুলনীয় হইলেও, সহানুভূতির অভাবে তাহা উপযুক্ত রকমে উৎপন্ন হইতেছে না। এখনও যে দুই এক খানা প্রস্তুত হয় তাহা এক টাকা হইতে দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এক সময়ে কিশোরগঞ্জ এবং বাজিৎপুরে দিনেমার এবং ইংরাজ কোম্পানীর কার্পাসের কুঠি ছিল। এখন তাহা জনপ্রবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বেহার প্রদেশে পাটনা, গয়া, সারণ এবং দ্বারভাঙ্গাই তৎপ্রদেশজাত শিল্প দ্রব্যের কেন্দ্রস্থল। ঐ সকল স্থানে মতিয়া নামে এক প্রকার মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা দরিদ্র কৃষকেরা শীতকালে ব্যবহার করিয়া থাকে। মতিয়া ব্যতীত ককৃতী নামে আর এক প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্রও প্রস্তুত হয়। দিনাজপুরের তোয়ালে, ঝাড়ুনি, মেজ-আচ্ছাদন ইত্যাদি

মুরোপীয়দিগের নিকট সমাদরে গৃহীত হয়। পাটনার মস্‌লিন মন্দ নহে। বিহার প্রদেশের শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট।

উড়িষ্যার অন্তর্গত গুল নগরের মস্‌লিন তদ্দেশীয় ধনবান গৃহস্থের আদরের জিনিস, কটকে তাহা উচ্চদরে বিক্রীত হইয়া থাকে। ১৮৯০ সনে ৩০০০০ টাকার মস্‌লিন বিক্রয় হইয়াছিল। প্রতিখণ্ড আট আনা হইতে কুড়ি টাকা মূল্যে পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়।

ছোট নাগপুরের নানা স্থানে মজবুত দোসূতী প্রস্তুত হয়

বঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাসজাত বস্ত্রই মস্‌লিন। মস্‌লিন বাঙ্গালা শব্দ নহে। এই বস্ত্র এতদ্দেশে ইতিপূর্ব্বে কি নামে অভিহিত হইত তাহা অবগত নহি। মছলিপত্তন নামক স্থানে যে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা মস্‌লিন নামে অভিহিত হইত। তাহা হইতেই বোধ হয় এই মস্‌লিন নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের যাবতীয় মস্‌লিন অপেক্ষা ঢাকাই মসলিন উৎকৃষ্ট এবং আদরণীয়। ঢাকাই মস্‌লিনের শিল্পনৈপুণ্য এত সূক্ষ্ম যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ১ গজ প্রশস্ত ২০ হস্ত লম্বা একখানা মস্‌লিন জড়াইয়া একটী অঙ্গুরীর ছিদ্রদ্বারা ফেলিয়া দেওয়া যায়। ভ্রমণকারী ঔরেঙ্গজেবের একটী পারিস্য দেশীয় দূতের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "ঐ দূত বঙ্গদেশ পরিত্যাগ কালে পারস্য সম্রাটকে উপহার দেওয়ার মানসে এক খানা ৬০ হস্ত দীর্ঘ মস্‌লিনের পাগড়ী একটী ক্ষুদ্র ডিম্বের ন্যায় আরিকেলের খোসার ভিতর করিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

৩০ হস্ত দীর্ঘ ২ হস্ত প্রশস্ত একখণ্ড মস্‌লিনের ওজন ৪।৫ তোলা হইত এবং তাহা ৪।৫ শত টাকা মূল্যে পর্য্যন্ত বিক্রয় হইত। ২ শত বৎসর পূর্ব্বে "দিল্লী-দরবারে" এইরূপ বিক্রয় হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও তাহার নির্ম্মাণ একেবারে বন্ধ ছিল না। ডাঃ টেলর লিখিয়াছেন ১৮৪০ সনেও একখানা ষোল শত গ্রেণ (৯ তোলা) ওজনের মস্‌লিন ১০ পাউণ্ড (১০০৲ টাকা) পর্য্যন্ত বিক্রীত

হইয়াছে। * এখন এরূপ সূক্ষ্ম শিল্পের আদর কে করিবে? করিলেও এরূপ শিল্পী বোধ হয় ঢাকাতেও আজ কাল বিরল।

ঢাকাতে আরও নানা রকমের মস্‌লিন প্রস্তুত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গতি, সবরতি, ঝুনা, আবরুয়া, সরকার, সবনম্, আলী প্রভৃতি বস্ত্র ঢাকার সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শন। ঐ সকল নামের বিশেষ কোন অর্থ নাই। আবরুয়া জলে ফেলিলে জলের সহিত মিশিয়া থাকে; জল হইতে না তুলিলে তাহা কাপড় বলিয়া জানা সুকঠিন। সবনম্ বস্ত্রও শিশির পাতের সময় ঘাসের উপর রাখিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘাসের সহিত মিশিয়া যায়। এবং ঘাস বলিয়া ভ্রম হয়। সবনম্ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ পরীক্ষা করিতে একখানা সবনম্ বস্ত্র ধুইয়া ঘাসের উপর রাখিয়া ছিলেন। একটী গরু নাকি ঘাস খাইতে খাইতে ঐ বস্ত্র খানাও উদরস্থ করিয়াছিল। গল্প কথা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও বস্তু বা ব্যক্তিগত গুণ গৌরব অনুসারেই গল্পাদি রচিত হইয়া থাকে, ইহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে বোধ হয় কোন আপত্তি নাই।

ঢাকার বুটা তোলা মস্‌লিন কাসিদা নামে পরিচিত। কাসিদা এক সময়ে আরব দেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক পারস্য, মিসর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে নীত হইত। এবং তদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষের পাগড়ীর জন্য সাদরে গৃহীত হইত। ডাঃ টেলরের সময় ঢাকায় বৎসর প্রায় ২০০০০ বিশ হাজার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কাসিদা বহু প্রকারের নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। এবং গুণানুসারে ঐ সকল বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। প্রতি খণ্ড ১০৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। কাসিদা রেশম মিশ্রিত। কেবল সুতাদ্বারা যে কাসিদা প্রস্তুত হয় তাহা চিকন্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত মস্‌লিনের নাম জামদানী। ঢাকাতে

* Dr. Taylor's Topography of Dacca,

নানাপ্রকারের জামদানী প্রস্তুত হইত। যথা—করেলা, তোড়াদার, বুটিদার, তেরছা, জলবায়, পান্নাহাজরা, ছাওয়াল, দুবলিজাল, মেল ইত্যাদি। ঢাকাই জামদানী বিহারে অনুকৃত হইয়াছে। মস্‌লিনের যে সকল ছিট প্রস্তুত হইত তাহা নন্দনসাহী, আনারদানা, কবুতারখোপ সাকুতা, পাছাদার, কুণ্ডিদার প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত।

ঢাকাই মস্‌লিনের উপাদান—সূতা উক্ত জেলার অন্তর্গত ধামরাই নামক স্থানে প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরাই তুলা পিঁজিয়া ঐ সুতা কাটিত। সূতা কাটার কল আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে আর সেরূপ শ্রম স্বীকার কেহ করিতেছে না।

ঢাকাই বস্ত্র ব্যতীত আর যাহা লোকলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরে, সিমলাই ও পাবনাই বস্ত্র।

ফরাসডাঙ্গার ধূতি, সাটী, উড়নী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিলাতী সুতায় প্রস্তুত। শান্তিপুরের কাপড় নদীয়া জেলার অনেকস্থানে প্রস্তুত হয়। এই কাপড় খুব পাতলা এবং সুন্দরবুটা ও ফুলের জন্য পরিচিত। পাবনাই কাপড় বেশ শক্ত এবং মসৃণ। সিমলাই বস্ত্রের মসৃণতা ব্যতীত অন্য কোন গুণ নাই।

সাধারণ লোকের পরিধান জন্য ভারি কাপড় মতিয়া এবং গজী বেহারে উৎপন্ন হয়। তাহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। এই সকল বস্ত্র খুব গরম এবং শক্ত, ইহাদ্বারা লেপ, র‍্যাপার, জ্যাকেট, সায়মানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পরিধানের বস্ত্ররূপেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মতিয়ার থানে ১০ গজ হইতে ৪০ গজ পর্য্যন্ত কাপড় থাকে। মতিয়ার সূতা তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণই প্রস্তুত করিয়া থাকে। ২০ হাত লম্বা একখানা কাপড়ে ২½ সের তুলাই যথেষ্ট। মতিয়া বস্ত্রের গজ সাধারণতঃ ৶০ আনা ।০ আনা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

বাঙ্গালোরের অনুষ্ঠান বাঙ্গলায় অনুকৃত হইতে পারে না কি ?

মিঃ টেলারির বক্তৃতা সম্বন্ধে সংবাদপত্র পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন। মিঃ টেলারি দেশীয় শিল্প রক্ষার্থে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "আমার মতে ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের পথ দুইটী (১) দেশীয় জনসাধারণের ঐকান্তিক চেষ্টা (২) দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও বৈদেশিক শিল্পের পরিহার।" মিঃ টেলারি শেষোক্ত মতটীকেই সমধিক ফলদায়ক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মত সর্ব্বথা সমীচীন। কিন্তু তিনি আমাদিগের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। আমাদের দেশীয় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা তাঁহার শেষোক্ত মত রক্ষা করিবার পক্ষে নিতান্তই প্রতিকূল। এতদ্বিষয়ে দেশীয় ধনকুবেরগণের সহানুভূতিকেই আমরা একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করি। অন্যথায় দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার-সাধন সুদূর পরাহত হইবে।

হাতের তাঁতে কলের তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষা করিয়া চলা কখনও সম্ভবপর নহে। হাতের তাঁতের ব্যবহার না হইলে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগেরও অন্নসংস্থান হইবে না। এমন স্থলে যাহাতে "তাঁতীকুল বৈষ্ণবকুল" উভয়কুল রক্ষা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। কাজেই এস্থলে প্রচুর ধনশালী ব্যতিরেকে কেবল জনসাধারণের ঐকান্তিক চেষ্টাদ্বারা একার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না। হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে হঠাৎ একটা কলকারখানা সংস্থাপনটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বা কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ এরূপ করিবার অভ্যাসটাও বাঙ্গালীরপক্ষে নিতান্ত অপরিচিত নহে। খেয়ালবিভোর প্রাণের বৃথা আড়ম্বর হইতে একটা কিছু করিয়া পশ্চাৎ অকৃতকার্য্য হইয়া টিট্‌কারীর ভাগী হওয়া অপেক্ষা এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অগ্রসর না হওয়াই শ্রেয়ঃ। অর্থ এবং সম্মান এ উভয় বিষয়ে যাহারা শ্রেষ্ঠ, টিট্‌কারি এবং অর্থক্ষয়ে যাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই সেই অশেষ

সম্মানভাজন ধনবানদিগের দ্বারা যদি দেশীয় শিল্পশালার দ্বার উন্মুক্ত না হয়, শিল্পাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর পূজা না হয়, তাহাহইলে যৌথ কারবারে কিম্বা দেশীয় জনসাধারণের চেষ্টায় দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার অসম্ভব।

শিল্প-বিজ্ঞানে বোম্বাই চিরকাল ভারতের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় রাও বাহাদুর রণ্ছোরলাল ছোটালালের স্বদেশ হিতৈষণার প্রথম উদ্যমে ভারতবর্ষে প্রবল হাস্য কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রণ্ছোরলাল আহামেদাবাদে ১০০ তাঁত ও ৫০০০ হাজার চরকার একটী ক্ষুদ্র কল সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পান। লোকের হাস্য পরিহাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই ধনকুবের তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা বলবতী রাখিতে চেষ্টা করেন এবং দশ বৎসরের চেষ্টায় তাহাতে সফলকাম হইতে সমর্থ হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সেই পুরুষসিংহের চেষ্টায় আহামেদাবাদে "স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানীর" কল স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ এই কল ৫০টী তাঁত ও ২৫০ চরকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে তাহাতে ৩২০০০ চরকা ও ৬৮৮টী তাঁত চলিতেছে। এইরূপে ছোটালালের "স্পিনিং এণ্ড উইভিং" কোম্পানীতে এখন দুইটী কল চলিতেছে ঐ দুইটী কলে বর্ত্তমানে ৭৪০০০ চরকা ও ১৫৬৩টী তাঁত চলিতেছে এবং উক্ত কোম্পানীর অনুকরণে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেখানে আরও ২৮টী কল, ৩৫৩৭ তাঁত ও ৩২৬০০০ চরকা লইয়া পরিচালিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা অর্জ্জিত ও পরিবার প্রতিপালিত হইতেছে।

আহামেদাবাদের কলের কাপড় এখন সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বাঙ্গালী বাক্যবাগীশদের মুখে সভা সমিতিতে তাহার প্রচুর প্রশংসা গীতিও শুনিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা ছোটালাল আজ জীবিত নাই কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি "আহামেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং" আজ ভারতের গৌরবস্বরূপ হইয়া য়ুরোপীয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালায় কি এমন সহৃদয়

মহাত্মা কেহ নাই যিনি বাঙ্গালার এই পতনোন্মুখ শিল্পের প্রাণরক্ষা করিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন এবং বুভুক্ষু স্বদেশবাসীর অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে অগ্রসর হন? এমন কি কেহ নাই যিনি কবির এই—

"আজ যদি এরাজ্য ছাড়ে ভুজঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ"

সর্ব্বজন পরিচিত উক্তি নিষ্ফল করিয়া এতদ্দেশীয়দিগের দিগম্বরত্ব দূর করিতে অগ্রসর হইতে পারেন?

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

—০—

সহোদরপ্রতিম প্রিয়বন্ধু ত্রৈলোক্যনাথ আর ইহজগতে নাই। বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে নিরাশ্রয় করিয়া আজ তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অনাথ পরিবার আজ শোকে উন্মত্ত; প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব বিষাদে ম্রিয়মাণ। বিগত ১লা অগ্রহায়ণ উৎকট প্লেগরোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সাহিত্যে তাঁহার সুনাম ও যশঃ বঙ্গীয় পাঠকের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। তিনি যেমনি পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার চরিত্রবলও সেইরূপ প্রশংসনীয় ছিল। যিনি তাঁহার সহিত একদিন আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চরিত্র-গৌরব, অকৃত্রিম অমায়িকতা, গভীর সখ্যভাব ভুলিতে পারেন নাই। আমরা আজ তাঁহার সেই পবিত্র জীবনের দুই একটী কথা আলোচনা করিয়া আমাদিগের শোকসন্তপ্ত

হৃদয়কে উপশমিত করিব। যদিও আমার ন্যায় লেখকের পক্ষে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ ধৃষ্টতার বিষয় তথাপি আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহমমতা, ঐকান্তিক আত্মভাব এবং সর্ব্বশেষ তাঁহার দেবোপম চরিত্র স্মরণ করিয়া নিজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও তাহা হইতে কোন মতেই বিরত হইতে পারিলাম না।

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতি মহেশ্বরদি পরগণার অধীন পাঁচদোনা গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ত্রৈলোক্যনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রৈলোক্যনাথের পিতা ৺ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য দরিদ্র হইলেও অতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কথিত আছে, মুসলমান রাজত্ব সময়ে মগের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া নবদ্বীপ হইতে ৺হরিদেব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দুইটী পুত্র সমভিব্যাহারে ঢাকা জিলার অন্তঃপাতি মহেশ্বরদি পরগণায় পাঁচদোনা গ্রামে উপস্থিত হন। সে সময় হইতেই এ পরগণা বৈদ্যপ্রধান। পাঁচদোনা গ্রামে 'হাওলার' বাড়ীই সমৃদ্ধিশালী ছিল। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে পরম যত্নে স্থানপ্রদান করেন এবং পরে সকলেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ পরিবারও তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হন। ৺হরিদেব বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ই আমাদের ত্রৈলোক্যনাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। অদ্যাপি এই পরিবার দেশের ব্রাহ্মণমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

১৭৮২ শকের ২১শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে ত্রৈলোকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হইতেই ইনি অতিশয় সুবোধ ও সচ্চরিত্র ছিলেন। ৭ বৎসর বয়সে ত্রৈলোক্যনাথ পিতৃহীন হন। এই সময়ে তিনি নিজ গ্রামের মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রেরিত হন এবং ১১ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তিলাভ করিয়া

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। আজকাল যেমন ঢাকার ছাত্রগণ 'মেসে' প্রবেশ করিয়া সাড়ে ষোল আনা বাবুগিরি ফলাইয়া পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করেন তখনকারদিনে ওরূপ ছিল না। তাঁহাকে রীতিমত পালা অনুসারে রন্ধন করিতে হইত। আমার অনুজ শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠেশ্বর দাসগুপ্ত ত্রৈলোক্যনাথের সমবয়স্ক ও সমপাঠী ছিলেন। ইনিও পাঁচদোনা স্কুল হইতে চারি টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। পাঁচদোনায় থাকিতে তাঁহারা দুইজনে একত্র পাঠ ও ত্রৈলোক্যনাথের বাটীতে একত্রে শয়ন করিতেন। ঢাকা আসিয়াও উভয়ে এক বাসায় থাকিয়া একত্রে পাঠাভ্যাস ও একত্রে শয়ন করিতেন। আমি যখন ঢাকা আসিতাম তখন তাঁহাদের সহিতই অবস্থান করিতাম। এখানেই ত্রৈলোক্যনাথের সহিত আমার প্রথম ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথকে আমি অনুজের ন্যায় ভাল বাসিতাম।

ত্রৈলোক্যনাথের পড়া শুনার প্রতি কিরূপ অনুরাগ ছিল তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটীদ্বারাই সম্যক উপলব্ধি হইবে। ত্রৈলোক্যনাথ যখন এনট্রান্স স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন একদিনকার বৃত্তান্ত আমার ভ্রাতা এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়ে একত্রে পড়িতে বসিয়াছেন, রাত্রি ১১টা হইয়াছে, এমন সময় আমার ভ্রাতা বলিলেন "আমার ঘুম পাইয়াছে, আমাকে দুটার সময় জাগাইয়া দিও।" ত্রৈলোক্যনাথ পড়িতেছেন। অতঃপর আমার ভ্রাতা নিজ হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বাজিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন 'বোধ হয় দুটাই হইয়া থাকিবে।' ভ্রাতা বাহিরে গিয়া দেখেন যে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। বাহির হইতে আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথকে বলিলেন যে, রাত্রি প্রভাত। ইনি বিশ্বাস না করিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলেন ঠিক তাহাই। তখন পরীক্ষার সময়ও ছিল না। বৎসরের মধ্যভাগ। এ অবস্থায় কয়টী ছেলে পড়িতে বসিয়া অলক্ষ্যে রাত্রি প্রভাত করিতে পারেন? ধন্য অনুরাগ! ধন্য সরস্বতী দেবীর

সাধনা! এরূপ সাধনা না করিলে কি কখনও সিদ্ধি লাভ হয়? কত অনুরাগের আবশ্যক, তাহা পাঠক একবার অনুমান করিবেন।

ত্রৈলোক্যনাথ যখন উপক্রমণিকা অবলম্বনে প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন, তখনই তিনি কলাপ ব্যাকরণের চতুষ্টয় বৃত্তি হইতে শব্দরূপগুলি শিক্ষা করিতেন। প্রথম হইতেই সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। আমার ভ্রাতাও এইরূপে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতেন। তাঁহাদের এই অভিনব অনুশীলন শিশুকাল হইতেই আমি সযত্নে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

ত্রৈলোক্যনাথ এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ বৃত্তি পাইয়া ঢাকা কলেজেই এফ্ এ পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়, মেধা, পরিশ্রম আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি এফ্ এ পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন। আজিও আমার বেশ স্মরণ আছে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে গুণানুসারে পঞ্চত্রিংশৎ দেখিয়াছিলাম। ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। এবার বি-এ, পরীক্ষার পালা। বি-এ পড়িতে লাগিলেন বটে কিন্তু ইহা প্রচুর মনে না করিয়া গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষার জন্য গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পরীক্ষাও দিলেন। সর্ব্ব প্রকারে কৃতকার্য্য হইয়াও সংস্কৃতের কাগজ খানা দেবনাগর অক্ষরে না লিখিয়া বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়াছিলেন বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য হওয়ায় বিফল মনোরথ হইলেন। ইহাতে তাঁহার ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। এদিকে বি-এ পরীক্ষায় অযত্ন ও অপ্রস্তুত বশতঃ ফেইল হইয়া বিষম বিভ্রাটে পতিত হইলেন। বাটী হইতে খরচ আনিয়া পড়িবার শক্তি ছিল না, পরন্তু এখন তাঁহার বাটীর সাহায্য করিবারও সময় উপস্থিত। এ বিষম সঙ্কটেও তিনি আত্মহারা হইলেন না। ভগবান্ স্বয়ং এ সকল লোকের সহায় হইয়া থাকেন। বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি কুমিল্লা

মহারাজা স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আবেদন পত্রে লিখিয়া ছিলেন, তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় ১৫৲ ও এফ্‌-এ পরীক্ষায় ২০৲ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বি-এ পরীক্ষা দিয়াছেন, ফল বাহির হয় নাই। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ফল বাহির হইবার অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। এই স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া তিনি একবার বি-এ দিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার এই প্রথম প্রবেশ। তিনি কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন তাহার একটী মাত্র উদাহরণ দিতেছি। গ্রীষ্মের বন্ধের পর তিনি নৌকাপথে কুমিল্লা চলিয়াছেন। যে দিন স্কুল খুলিবে সেদিন প্রভাতে তিনি দুর্গাপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। নৌকাপথে যাইতে আরও একদিনের প্রয়োজন; কিন্তু পদব্রজে গেলে ৫। ৬ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। তিনি নৌকা পরিত্যাগ করিয়া সেখান হইতে দুর্গম ভয়সঙ্কুল পর্ব্বতাকীর্ণ পথ চলিয়া ১১টার সময় স্কুলে উপস্থিত হইয়া দৈনিককার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অপরাহ্ণে বাসায় ফিরিয়া আহারাদি সমাপন করেন। একথাটা আমি তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি। তৎপর তিনি ময়মনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গ দুর্গাপুর স্কুলে আসেন। এসময় ময়মনসিংহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত। তিনি সর্ব্বদা কহিতেন "ভাই, বি-এ পাশ না করিয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা।" বাস্তবিক তাঁহার এত উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে তিনি জীবন ধারণ ভারবহ বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আমার অনেক দীর্ঘ পত্রাদি লেখা চলিত, তাহাতে তাঁহার অধ্যবসায়ের এমনই পরিচয় প্রাপ্ত হই যে আমার অবশিষ্ট জীবনে তাহা ভুলিব না। পূর্ব্বে আমার অনুজকে এবং এখন আমার পুত্রকে ত্রৈলোক্য নাথের এই অমিত অধ্যবসায়ের অনুকরণ জন্য বারম্বার উত্তেজিত করিয়াছি। ইহাঁরাও বিশেষ প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। আমার নিজের ত কথাই নাই।

অতঃপর তিনি ঢাকা রূপরঘু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি বলিতেন ছোট চাকরী করিব না, শিক্ষকতা

করিতে হইলে প্রধান শিক্ষকতাই করিব। এখানে ত্রৈলোক্যনাথের দৃঢ়তার পরিচয় পাইবেন। তাঁহার অত্যন্ত অর্থাভাব ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা, তাহা একটা হইলেই হইল এমন ছিল না। তিনি তাঁহার বংশের ও পিতৃ-পৈতামহিক সম্মান সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ছিলেন। এ গুলি তাঁহার মজ্জাগত ছিল। এসময়ও তিনি একবার বি-এ দেন। ভগবান এবার তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরীক্ষক ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের লিখিত কাগজ পরীক্ষা করিয়া তিনি মোহিত হইলেন। তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে নিজ হইতেই লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তাঁহার সংস্কৃতে এম-এ দিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে এবং উক্ত কলেজ হইতে একটী বিশেষ বৃত্তিও দেওয়া যাইবে। ত্রৈলোক্যনাথ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। এদিকে তাঁহার জনৈক শিষ্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পুস্তকাদি ক্রয় জন্য একশত টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ১৮৮৫ সালে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশাল ব্রজমোহনস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই কলেজে আইন পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। অতঃপর ঢাকাতে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ পসার হইতেছিল না বলিয়া সুবিধামত চাকরী পাইলে চাকরী করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ওকালতীতে পসার করিবার জন্য ত্রৈলোক্যনাথ দোয়াতকলম, হুকাবৈঠক নিয়া বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না, অথবা দিবারাত্রি পসার বৃদ্ধির ভাবনা চিন্তাতে নিমগ্ন থাকিতেন না। এখন তাঁহার স্বচ্ছন্দ অবসর ছিল। তিনি সময়ের অপব্যবহার করিতেন না। শিক্ষকতা করিবার সময় হইতেই তিনি রীতিমত প্রবন্ধ লিখিতেন। "নব্যভারতে" তখন হইতেই তাঁহার

প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইত। সে সময় কলিকাতা হইতে "মর্ণিং পোষ্ট" নামক কোন সাহেব-সম্পাদিত একখানি দৈনিক ইংরেজী কাগজ বাহির হইতেছিল। ত্রৈলোক্যনাথ তাহার একজন নির্দ্দিষ্ট লেখক ছিলেন। এই সময়ই তিনি "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" খানা লিখেন ও ঢাকাতেই তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের প্রণয়ন সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়া ছিলাম। ময়মনসিংহের তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ত্রৈলোক্যনাথের পক্ষে আমিই উহার একখণ্ড উপহার দিয়াছিলাম। তিনি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং অনেক সুখ্যাতি করিয়া মন্তব্য সহ তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠান।

১৮৮৯ সালে তাঁহার নাম কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের ওমেদার রেজিষ্টরী ভুক্ত হয় এবং তদানীন্তন জুনিয়ার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের অনুগ্রহে তিনি একশত টাকা বেতনে আবকারীর সব্‌ডিপুটী পদে নিযুক্ত হইয়া ছাপরা প্রেরিত হন। এই চাকরীতে যাওয়ার সময় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁহার এ চাকরীটী বড় ভাল হয় নাই বলিয়া আমি মন্তব্য প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "তুমি বুঝিতেছ না, এইই বেশ হইয়াছে, নির্জ্জনগৃহে বসিয়া থাকিব, আর আমার ইচ্ছামত লেখা পড়া করিব।" তিনি জ্ঞানানুশীলন সর্ব্বদা ভাল বাসিতেন বলিয়াই তাঁহার মুখ হইতে ওরূপ বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনি ক্ষমতা প্রিয় ছিলেন না। আমি ক্ষমতাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে ওরূপ বলিয়াছিলাম তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ইহাই তাঁহার প্রথম গবর্ণমেণ্টের চাকরী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। কর্ত্তব্যকাজে তাঁহার অমনোযোগ ছিল না। তিনি অল্পকালের ভিতরই কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আবকারী হইতে সাধারণ বিভাগে

পরিবর্ত্তিত হইয়া গয়া জিলায় নোয়াদা সবডিভিসনে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি ফৌজদারী বিচার করিতেন। বিচারকার্য্যে তিনি প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অতি ত্বরায় তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। নোয়াদা থাকা কালীন একবার বাটী আসিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় নারায়ণগঞ্জে কয়েক মিনিটের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি তাঁহাকে বিহার পরিত্যাগ করিয়া এদিকে আসিতে অনুরোধ করি। আরও কিছুকাল পরে আসিবেন বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় হন।

অতঃপর নোয়াদা হইতে তিনি গয়া সদর ষ্টেশনে পরিবর্ত্তিত হন এবং ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। এখন হইতে ফৌজদারী কাজের সহিত বাঁটোয়ারা কার্য্যভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। উভয় কাজেই তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। অনেক প্রবীণ কর্ম্মচারীকে পশ্চাৎ ফেলিয়া তিনি সরাসরী বিচার ক্ষমতা ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের অন্যান্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গের ছোটলাটের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। যখন যাঁহার অধীনে তিনি কাজ করিয়াছেন, তাঁহাকেই কাজকর্ম্মে ও বাক্যদ্বারা মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। ইহাও একটা গুণ মধ্যে পরিগণিত। আমার ভ্রাতা লিখিয়াছেন তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থায় ঢাকার প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমী মিছিলে তাঁতীবাজার পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথকে রাজা সাজাইবার জন্য মিছিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ (ইহাঁদের মধ্যে অনেক বিএ, এম-এ এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারীও আছেন) অনেক আগ্রহ করেন। তাঁহারা তাঁহাকে কোনমতে হাত করিতে না পারিয়া অবশেষে অর্থদ্বারা বশীভূত করিবারও চেষ্টা করেন, তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ "নব্যভারতে" বহুপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "সাহিত্যে" ও সময় সময় লিখিতেন। প্রত্নতত্ত্বই তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল।

গবর্ণমেণ্টও এসংবাদ অবগত ছিলেন। ইদানীং তিনি "আরতি"তেও রীতিমত লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিতও হইয়াছিল। তিনি "আরতিতে" সোনারগাঁয়ের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়াও আমাকে লিখিয়াছিলেন। "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ" প্রণয়ন জন্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতের বঙ্গস্থানের ইতিহাসও সংগ্রহ করেন। বাঙ্গালার একখানা ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়া বহু নোট সংগ্রহ করেন। আমার ভ্রাতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আসামের ইতিহাস লিখিবার জন্য তিনি তাঁহাকে কয়েকখানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ ইংরাজী ভাষায় উহা লিখিতে ছিলেন। তিনি চাকরী গ্রহণ করিয়া আরও দুইখানি বহি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। (১) "বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবি", (২) "ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা প্রথমভাগ"। এই উভয় পুস্তকই সুপাঠ্য বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। ত্রৈলোক্যনাথ শিশুকাল হইতেই নানাবিধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে ছিলেন। পুস্তকক্রয় করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। এই লাইব্রেরী ব্যতিত তিনি আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ত্রৈলোক্যনাথের ন্যায় অনুরাগী সাহিত্যসেবক বাঙ্গালায় দুর্ল্লভ। বাঙ্গালা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের স্থান কোথায় তৎসম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে যাইতেছি না কিন্তু বাঙ্গালাসাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী ও তাঁহার অভাব বহুদিন অনুভব করিবে ইহা সুনিশ্চয়। তাঁহার পুরাতত্ত্বালোচনা ভারতের ইতিহাস হীনতাকলঙ্কের অপনোদনে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাঁহার অভাবে তাহা অবশ্যই অনুভূত হইবে।

ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া মাতাকর্ত্তৃকই লালিত পালিত হন। মাতার প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। "সংস্কৃত সাহিত্যের" ইতিহাস খানা লিখিয়া তিনি তাঁহার স্বর্গীয় জনক ও স্নেহময়ী জননীর শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া পিতৃ

মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তিনি বিগত শারদীয় পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ণিয়া পরিবর্ত্তিত হন। পূজার পরই সেখানে যাইবার বন্দোবস্ত করেন। পরে গবর্ণমেণ্ট উক্ত আদেশ রহিত করিয়া তাঁহাকে মোজফরপুর পরিবর্ত্তিত করেন। গয়াতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে আমরা তাঁহার জন্য অত্যন্ত উৎকুণ্ঠিত ছিলাম তাঁহার পত্রেও প্লেগের বৃত্তান্ত অবগত হইতেছিলাম ইতিমধ্যে শুনিলাম তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধলা এনট্রান্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমান্ করুণানাথ ভট্টাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া গয়া চলিয়া গিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ অসুস্থ একথা শুনিয়া অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তদবধি কোনও সংবাদ না পাইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত দিনের পর দিন যাপন করিয়া আসিতেছিলাম। অতঃপর একদিন জনৈক বন্ধুকর্ত্তৃক শ্রুত হইলাম তিনি প্লেগরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং "প্রতিবাসী" পত্রে এসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাখানা পাঠ করিয়া যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম তাহা বর্ণনাতীত। অতঃপর জানিতে পারিলাম তিনি গয়া পরিত্যাগ করিয়া ৩০শে কার্ত্তিক প্রাতে মোজফরপুর পৌঁছেন। সেদিনই সন্ধ্যার সময় জ্বর হয়। অতি সত্বরে জ্বর প্লেগে পরিণত হইয়া উঠিল। অসহ্য যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তৎপরদিন রাত্রি ১টার পর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ৪০ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। তিনি চারি পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। টাকা পয়সা বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিনীও সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূতা। আশা করি, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ পিতৃপৈতামহিক মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। ভগবান এই সদ্য শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি প্রদান করুন, এই প্রার্থনা।

জ্যোতিষ ও কালবিধান।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

—০—

নৈশাকাশ পর্য্যবেক্ষণকালে প্রাচীন পণ্ডিতগণ দেখিলেন উত্তরাকাশে একটি নক্ষত্র সর্ব্বদা নিশ্চল থাকে ও অন্যান্য নক্ষত্র তাহা হইতে সর্ব্বদা সমদূরে থাকিয়া পশ্চিমমুখে দিবসে একবার আকাশমণ্ডল পরিভ্রমণ করে। তাঁহারা ঐ নক্ষত্রের নাম 'ধ্রুব' (North Polestar) রাখিলেন এবং অবধারণ করিলেন প্রবহ নামক প্রবল বায়ুকর্ত্তৃক সনক্ষত্র আকাশমণ্ডল 'মেরু' নামক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হয়। 'ধ্রুব' মেরুপর্ব্বতের ঠিক শৃঙ্গোপরি অবস্থিত বলিয়া নিশ্চল থাকে। কোন নক্ষত্রের পরিভ্রমণ বৃত্ত যে দুই বিন্দুতে ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করে তাহাদিগকে 'উদয়' ও 'অস্ত' বিন্দু বলে, এবং তাহার উপর্য্যুপরি দুইবার উদয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ের নাম 'নাক্ষত্রিক অহোরাত্র' (Sidereal day)। এক অহোরাত্রে ৬০ ঘটিকা, (বা দণ্ড) ১ ঘটিকায় ৬০ পল।

প্রবহবায়ুকর্ত্তৃক সূর্য্যও পশ্চিমমুখে ঘূর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ পশ্চিমগমন করিতে করিতে সূর্য্য বার্ষিকগতিতে পূর্ব্বমুখে নক্ষত্রগণকে অতিক্রম করিয়া প্রতিদিন প্রায় ১০ পলের পথ অগ্রসর হয়। সুতরাং মেরু প্রদক্ষিণ করিতে সূর্য্যের নক্ষত্র অহোরাত্রি অপেক্ষা প্রায় ১০ পল অধিক সময় আবশ্যক করে। সূর্য্যের এই প্রদক্ষিণ কাল অর্থাৎ উপর্য্যুপরি দুইবার সূর্য্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তীকাল 'সাবনদিন' বা 'ভৌমদিন' কথিত হয়। ৩০ সাবনদিনে ১ সাবনমাস, ১২ সাবনমাসে বা ৩৬০ সাবনদিনে ১ সাবন বৎসর।

বার্ষিকগতিতে সূর্য্য রাশিচক্রের ও তন্মধ্যস্থ স্বীয় ভ্রমণ পথের বা 'রবিমার্গের' (ecleptic) যে অংশ প্রতিদিন গমন করে তাহার নাম 'অংশ' (degree) রাখিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ সাবন বৎসরাদির অনুসরণে সম্পূর্ণ রাশিচক্রকে ১২ রাশি বা ৩৬০ অংশে, প্রত্যেক রাশি

৩০ অংশে, প্রত্যেক অংশ ৬০ কলায়, ও প্রত্যেক কলা ৬০ বিকলায় বিভাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ সূর্য্য এক বৎসরে রাশিচক্র, ১ মাসে ১ রাশি, ১ দিনে এক অংশ, ১ দণ্ডে ১ কলা, ও ১ পলে ১ বিকলা পথ ভ্রমণ করে। রাশিচক্রের অনুসরণে বৃত্তমাত্রই ৩৬০ অংশে বিভাগ করা হইয়া থাকে।

সূর্য্যের সম্পূর্ণ রাশিচক্র পরিভ্রমণ কাল ৩৬৫.২৫৮ দিনে ১ 'সৌর বৎসর' হয়। তাহার ১ রাশিভ্রমণ কালকে 'সৌরমাস' বলে। সূর্য্যের গতি সর্ব্বদা সমান নহে বলিয়া সৌরমাস সকল পরস্পর সমান নহে। সাবনমাস ও বর্ষের পরিমাণ স্থূল, রাশি ও রাশিচক্রের সহিত তাহাদের প্রকৃতপক্ষে ঐক্য নাই। সৌরমাস ও বর্ষের পরিমাণ সূক্ষ্ম।

এক সৌর বৎসরে সূর্য্য দৈনিকগতির বিপরীতমুখে সম্পূর্ণ নক্ষত্রচক্র অর্থাৎ ১ দিনের পথ সরিয়া যায়, সুতরাং নক্ষত্রগণ ঐ এক বৎসরে সূর্য্যাপেক্ষা একবার অধিক উদয় হয়, অর্থাৎ সাবনদিনাপেক্ষা একাধিক নাক্ষত্রদিনে বা ৩৬৬.২৫৮ নাক্ষত্রদিনে এক সৌরবৎসর হয়।

প্রথমতঃ সূর্য্য যে সময়ে মেষরাশির প্রারম্ভ বিন্দুতে অর্থাৎ মেষ ক্রান্তিতে প্রবেশ করিত সেই সময় দিনরাত্রি সমান হওয়াতে পূর্ণ বসন্ত কাল অর্থাৎ বসন্তঋতুর মধ্যকাল ও এবং বৎসরের প্রারম্ভ গণনা হইত। বহুবর্ষ পরে দেখা গেল যে সূর্য্য মেষক্রান্তি প্রবেশের পূর্ব্বেই দিনরাত্রি সমান হইয়া থাকে—যথা ২০০ বৎসর পর ৩ দিবস পূর্ব্বে দিনরাত্রি সমান দৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান সময়ে ৯ই চৈত্র দিনরাত্রি সমান। সুতরাং পূর্ব্বে চৈত্র বৈশাখে বসন্ত হওয়া স্থলে, বর্ত্তমানকালে প্রায় ফাল্গুন চৈত্রে বসন্ত হইতেছে।

বসন্তে রবিমার্গের যে বিন্দুতে সূর্য্য প্রবেশকালে দিনরাত্রি সমান হয়, তাহার নাম 'মহাবিষুবক্রান্তি' (First Point of Aries or Vernal

* বিগত অগ্রহায়ণের " আরতিতে " আমরা ভ্রমে সমদিন রাত্রির দিবসে বসন্তের "মধ্য" না লিখিয়া "প্রারম্ভ" লিখিয়াছি।

Equinox)। মেষক্রান্তি হইতে ঐ বিন্দু যতদূর সরিয়া যায় সেই দূরত্বকে 'অয়নাংশ' (Precession of the Equinoxes) বলে। মহাবিষুবক্রান্তিতে সূর্য্যের উপর্য্যুপরি দুইবার আগমনের মধ্যবর্ত্তী সময়কে প্রাচীন পণ্ডিতগণ 'সায়নবৎসর' (Sidereal year) নাম দিয়া, মেষক্রান্তিতে ঐরূপ আগমন মধ্যবর্ত্তী সময়ের 'নিরয়ণ বৎসর' (Tropical year) নাম রাখিলেন। সায়ন বৎসর প্রকৃত ঋতু অনুগামী হইলেও নিরয়ন বৎসরই প্রচলিত। প্রাচীনদিগের মতে বার্ষিক অয়নাংশের পরিমাণ ৫৪ বিকলা, সুতরাং নিরয়ণাপেক্ষা সায়ন বৎসরের পরিমাণ ৫৪ পল কম।

প্রাচীনগণ চন্দ্রের রাশিচক্র পরিভ্রমণ কালদ্বারা চান্দ্রমাস গণনা করেন নাই। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্টে তাঁহারা ঐ মাস গণনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনতিকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন সূর্য্য হইতে চন্দ্রের দূরত্বানুসারে পৃথিবীমুখী চন্দ্রপৃষ্ঠে ন্যূনাধিকরূপে সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়াতেই চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। রাশিচক্রে চন্দ্র সূর্য্যের একত্রাবস্থান কালে চন্দ্রের ঐ পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, তৎপর ক্রমে আলোকিত ও প্রকাশিত হয়। অতএব চন্দ্রসূর্য্যের উপর্য্যুপরি দুইবার একত্র হওয়ার মধ্যবর্ত্তীকালকে 'চান্দ্রমাস' স্থির করিয়া তাহাকে শুক্লপ্রতিপদাদি ৩০ তিথিতে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রাচীন সিদ্ধান্তমতে চন্দ্র ২৭.৩২ দিনে সম্পূর্ণ রাশিচক্র এবং একদিনে ১৩.১৮ অংশ পূর্ব্বমুখে গমন করে। সূর্য্য প্রতিদিন ঐমুখে রাশিচক্রের প্রায় ১ (.৯৮৬) অংশ গমন করিয়া থাকে। সুতরাং চন্দ্র প্রতিদিন সূর্য্য হইতে ১২.১৯৪ অংশ পূর্ব্বমুখে সরিয়া গিয়া ২৯.৫৩ সাবন দিন পর পুনঃ সূর্য্যের সম্মুখীন হয়। অতএব চান্দ্রমাসের প্রকৃত পরিমাণ ২৯.৫৩ সাবনদিন। ৩০ তিথির স্থূল পরিমাণ ৩০ সাবনদিন হইতে সূক্ষ্ম পরিমাণ ২৯.৫৩ সাবন দিন বিয়োগ করিলে বিয়োগফলকে 'তিথিক্ষয়' বলে।

সৌর ১২ মাস চান্দ্র ১২ মাসাপেক্ষা প্রায় ১১ দিন দীর্ঘতর,

সুতরাং সৌর ৩২ মাসে প্রায় চান্দ্র ৩৩ মাস হয়, অর্থাৎ চান্দ্রমাস এক মাস অগ্রে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে চান্দ্রকালানুযায়ী দৈব ও পৈতৃক কার্য্য সকল যথাঋতুতে সম্পাদনের অসুবিধা দেখিয়া আর্য্যঋষিগণ ঐ অতিরিক্ত চান্দ্রমাসকে 'অধিমাস' বা 'মলমাস' নাম দিয়া গণনা হইতে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। কোন সৌরমাসে যে চান্দ্রমাস শেষ হয় তৎপূর্ব্ব সৌরমাসানুসারে ঐ চান্দ্রমাসের নামকরণ হয়, যথা সৌর বৈশাখমাসে শেষপ্রাপ্ত চান্দ্রমাসকে চান্দ্রচৈত্রমাস বলে। উক্ত সৌর বৈশাখে যদি পুনঃ আর একটী চান্দ্রমাস শেষ হয় তবে তাহাকে অধিমাস গণ্য করিতে হইবে।

সূর্য্য হইতে চন্দ্রের প্রত্যেক ১২ অংশ পূর্ব্বদিকে গমন করিতে যে সময় লাগে তাহাকে ১ তিথি বলে। মেষক্রান্তি হইতে চন্দ্রের প্রত্যেক ১৩⅓ অংশ পূর্ব্বদিকে গমনকালকে ১ 'নক্ষত্র' বলে। মেষক্রান্তি হইতে চন্দ্রসূর্য্য উভয়ের যত অংশ দূরত্ব হয় তাহার সমষ্টিকে ১৩⅓ দ্বারা ভাগ করিলে ঐ ভাগফলের নাম ১ 'যোগ'। তিথির অর্দ্ধাংশের নাম 'করণ'। চন্দ্রসূর্য্যের গতি সর্ব্বদা সমান নহে বলিয়া তিথি, নক্ষত্র কিম্বা করণ সকল পরস্পর সমান নহে।

পুরাণানুসারে চৈত্ররথাদি দিব্য উপবন এবং দিক্‌পালগণের মনোহর আবাল ভূমিদ্বারা পরিবেষ্টিত মেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে ব্রহ্মাদি দেবত্রয় বাস করেন। সুতরাং দেবগণ উত্তর ভূগোলার্দ্ধের উপরিস্থ জ্যোতিষ্কগণকে সর্ব্বদাই দেখিতে পান দক্ষিণার্দ্ধের জ্যোতিষ্কগণকে তাঁহারা দেখিতে পান না। মহাবিষুবসংক্রান্তির পরবর্ত্তী ৬মাস সূর্য্য পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে অবস্থান করা হেতু দেবতাগণের দৃষ্টিবহির্ভূত হয় না, সুতরাং এই ৬ মাস তাঁহাদের দিন থাকে। তদ্বিপরীত কারণে বৎসরের অপরার্দ্ধ তাঁহাদের রাত্রি। এইরূপে ১ সৌর বৎসরে ১ দিব্য অহোরাত্র। ৩০ দিব্য অহোরাত্রে ১ দিব্য মাস, ১২ দিব্য মাসে ১ দিব্য বৎসর।

মেরুপর্ব্বতের মূলদেশ পৃথিবীর মধ্যভেদ করিয়া ধ্রুব নক্ষত্রের বিপরীত বিন্দুতে আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে। মেরুর সেই তলভাগে দেবভূমির বিপরীত পাতাল প্রদেশে বলিপ্রমুখ অসুরগণের নিবাস। সুতরাং অসুরগণের দিনরাত্রি দেবতাগণের ঠিক বিপরীত।

আমাদিগের দুইপ্রহর রাত্রির পর সূর্য্য দিবামুখী হইলেই যেমন ঘটিকায় দিবারম্ভ গণিত হয়, সেইরূপ উত্তরায়ণ প্রবর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্য উত্তরমুখী হইলেই দেবতাদিগের দিন গণিত হইয়া থাকে। ঐরূপ কারণে দক্ষিণায়ণ প্রবর্ত্তে তাঁহাদের নিশা আরম্ভ হয়।

চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় কয়েকটি তারকাও পূর্ব্বমুখে অন্যান্য তারকাকে অতিক্রম করিয়া রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়। চন্দ্রসূর্য্যসহ তাহাদিগকে প্রাচীনগণ 'গ্রহ' (Planet) আখ্যা দিয়াছেন এবং তাহাদিগের পরিভ্রমণকাল নির্ণয় করিয়া তাহার অনুপাতে পৃথিবী হইতে তাহাদের দূরত্ব স্থির করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাচীন মতে গ্রহগণ রাশিচক্রস্থিত স্বীয়২ পরিভ্রমণ পথে বা 'কক্ষায়' (Orbit) সমবেগে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা ক্রমে ঊর্দ্ধতর আকাশে অবস্থান করায় তাহাদের কক্ষার পরিধি ক্রমেই অধিক। সুতরাং কোন গ্রহের পরিভ্রমণকাল যত অধিক, পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব সেই অনুপাতে তত অধিক। ক্রম-দূরত্বানুসারে গ্রহদিগের নাম--(১) চন্দ্র, (২) বুধ, (৩) শুক্র, (৪) রবি, (৫) মঙ্গল, (৬) বৃহস্পতি, (৭) শনি। ইহাদিগের মধ্যে ক্রমে প্রত্যেক চতুর্থগ্রহ এক২ দিবসের অধিপতি কল্পিত হইয়াছে ও অধিপতিগ্রহের নামানুসারে সাতবারের নাম হইয়াছে।

অন্যান্য জ্যোতিষ্কের ন্যায় গ্রহগণ আকাশের দূরবর্ত্তী ভিন্নং ভাগে অবস্থান করেনা, সকলেই রাশিচক্র মধ্যে অবস্থিত। ক্রমে দেখা গেল তাহারা সর্ব্বদা সমদূরে থাকে না। তাহাদের পরম দূরবর্ত্তী স্থানকে 'মন্দোচ্চ' (Apogee) বলে। আর তাহাদের কক্ষা সকল পরস্পর সমান্তরাল না হইয়া ঈষৎ কোণে রবিমার্গকে কর্ত্তন করিয়াছে।

ঐ সকল কর্ত্তন বিন্দুকে 'পাত' (Node) কহে। চন্দ্র ও সূর্য্য কক্ষার পরস্পর কর্ত্তনবিন্দু বা পাতদ্বয়ের নাম 'রাহু' ও 'কেতু'। পুরাণকর্ত্তাগণ রাহু ও কেতুকে গ্রহশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। মন্দোচ্চ ও পাত সকল নিশ্চল নহে, মন্দোচ্চসকল পূর্ব্বমুখে ও পাতসকল বক্রগতিতে, অর্থাৎ পশ্চিমমুখে সুদীর্ঘকালে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে।

আর্য্যঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন সৃষ্টিপ্রারম্ভে গ্রহগণ স্বীয়২ মন্দোচ্চস্থ ও পাতস্থ হইয়া রাশিচক্রের একই অংশে সমসূত্রে অবস্থান করিতেছিল, এবং একই মুহূর্ত্তে যেমন নক্ষত্রচক্রের দৈনিকগতি আরম্ভ হইল, গ্রহ, মন্দোচ্চ এবং পাত সকলও কক্ষাবৃত্তে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের পরিভ্রমণকাল ন্যূনাধিক বশতঃ তাহারা পরস্পর হইতে অগ্রপশ্চাৎ হইয়া পড়িল। ঘুরিতে২ এক সময় তাহারা অবশ্যই একত্র হয়। মন্দোচ্চস্থ ও পাতস্থ না হইয়া কেবল মাত্র গ্রহগণ যে কালমধ্যে পরস্পর একত্র হয় তাহাকে প্রাচীনগণ 'মহাযুগ' বলিয়াছেন এবং মহাযুগকে ১০ ভাগ করিয়া ধর্ম্মের পাদানুপাতে ৪ ভাগে (১) কৃত বা সত্যযুগ, ৩ ভাগে (২) ত্রেতাযুগ, ২ ভাগে (৩) দ্বাপরযুগ, ও ১ ভাগে (৪) কলিযুগ, এই চতুর্যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। চতুর্যুগের পরিমাণ ১২০০০ দিব্যবৎসর, বা ৪৩২০০০০ সৌরবৎসর। প্রত্যেক যুগের প্রারম্ভে ও শেষে তাহার স্বীয় ষষ্ঠাংশকে ঐ যুগের 'সন্ধ্যা' ও 'সন্ধ্যাংশ' বলে। ৭১ মহাযুগে ১ 'মন্বন্তর' বা ১ মনুর রাজত্বকাল, তাহার শেষে তদতিরিক্ত কৃতযুগ পরিমিতকালকে ঐ মন্বন্তরের 'সন্ধি' বলে। প্রত্যেক মন্বন্তরান্তে পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিতা হয়, ধ্বংস হয় না।

পুরাণানুসারে সন্ধিসহ ১৪ মন্বন্তরে এক 'কল্প'। কল্পারম্ভে কৃত যুগ পরিমিত কালকে 'কল্পসন্ধি' বলে। কল্পান্তে গ্রহগণ পুনঃ স্বীয়২ মন্দোচ্চে ও পাতে অবস্থিত হইয়া রাশিচক্রের একাংশে সমবেত হয়, এবং তখন তাহাদের সমসূত্রতাজাত প্রবল আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বস্ত ও মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়। সন্ধিসহ কল্প পরিমাণ ১০০০

মহাযুগ। পুরাণমতে ইহা ব্রহ্মার দিবস, এবং এই পরিমিত কাল তাঁহার রাত্রি। ব্রাহ্ম অহোরাত্রমূলে বৎসর গণনা করিয়া তাহার ১০০ বর্ষ ব্রহ্মার আয়ু কল্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মার অর্দ্ধ বয়স গত হইয়া, দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম কল্পের সপ্তমমনুর অষ্টাবিংশতি মহাযুগান্তর্গত কলিযুগের ৫০০১ বৎসর গত হইয়াছে।

আর্য্যঋষির কল্পনাচক্ষু কালের কত দূরবর্ত্তী প্রান্তে প্রসারিত হইয়াছিল আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া দেখাইলাম। ইহার মধ্যে কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে পণ্ডিতগণ তাহার চিন্তা করিতে পারেন।

নিরাশা।

তোমার নির্দ্দয় প্রেমপাশ হ'তে মোরে
মুক্তকর, হে নিরাশা, আর কত সহে!
কেন আর বাঁধ নিত্য নব নব ডোরে
এই জীর্ণম্লান প্রাণে অশেষ আগ্রহে?
জীবনপ্রভাতে যবে রবিকরোজ্জ্বল
বিশ্বদৃশ্য উদ্ভাসিত নয়নে আমার,
তখনি ঘিরিয়া মোরে তোমার অঞ্চল
সহসা করিল সৃষ্টি অনন্ত আঁধার।
তারপর, তিলমাত্র নাই অবহেলা,
সযতনে নয়নে মোরে রেখেছ, রাক্ষসি,
এ ভাঙ্গা খেলেনা লয়ে নিত্য একি খেলা
নিষ্ঠুর কৌতুক ভরে খেলিতেছ বসি'!
অসহ্য যাতনা ভরে কাঁদিছে হৃদয়
কোথা সেই চিরন্তন শান্তির নিলয়?

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে দিব্যদর্শন লাভ হইলে জগতের কোন পদার্থই আর অদর্শনীয় থাকে না। আমরা পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের প্রণাম লক্ষ্য করিয়া শিষ্যের প্রার্থনায় তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। অধুনা যে গ্রন্থ সর্ব্বজন পরিচিত, নিত্যালোচিত ও নিত্যপঠিত হইতেছে, সেই সর্ব্বজ্ঞানপ্রয়োজিকা, সর্ব্বশান্তিময়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণিত দিব্যদর্শনের বিষয় পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে প্রস্তুত হইলাম। উক্ত গীতার দশম অধ্যায়ের নাম "বিভূতিযোগ"। এই অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভগবানের বিবিধ বিভূতির বিষয় বিশেষরূপে বিবরিত আছে, ঐ বিবরণ পাঠে জানা যায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। এই ব্রহ্মময় জগতে সেই ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু বিভূতি বিবরণ বলিয়া বিরত হইবার পূর্ব্বেই ব্যাপক বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"অথবা বহুনৈতেন কিংজ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! আর এইরূপে (বিভূতি বিস্তৃতি) বহুজ্ঞানের অধিক জানা শুনায় তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদয় জগৎকে একাংশদ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া সর্ব্বময়রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি, এই পরম তত্ত্বটী সবিশেষরূপে জানিয়া লও।"

ভগবানের মুখ হইতে এইরূপ গম্ভীর উচ্চভাবের তত্ত্বকথা শুনিয়াও একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জ্জুন যেন অবিশ্বাসী অজ্ঞানীর ভাণ করিয়া বলিলেন, অথবা সত্যসত্যই তাঁহার অপরূপ বিশ্বরূপ মূর্ত্তি পরিদর্শন করিবার বাসনায় উত্তেজিত হইয়াই যেন ধীরস্থিরভাবে প্রকাশ করিলেন—

"এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ং ॥

কি সুন্দর কথা। কি অপরূপ ভাব! অবিশ্বাসীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে সন্দেহ করিতে করিতেও অর্জ্জুন তাঁহার মায়ায় মোহিত এবং তাঁহার ঐশীশক্তির নিকট পরাভূত। অথবা প্রবল প্রতাপ শ্রীকৃষ্ণের গুণগরিমা, জ্ঞানগৌরব, ঐশ্বর্য্যমহিমা, বিভূতিবৈভব একবার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষে, মানবজন্মে দিব্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া জন্ম সাফল্যলাভ করিবার মানসে ভীত স্তম্ভিতভাবে দীনহীনের ন্যায় অশক্ত অসমর্থ সাপরাধ ব্যক্তির মত বলিলেন 'হে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর' তুমি নিজ বিভূতিবিস্তৃতি বিষয়ে যেরূপ বলিলে তাহা এইরূপই বটে। কিন্তু আমি তোমার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অপরূপ রূপ একবার দেখিতে বাসনা করি। (অতএব) হে যোগেশ্বর প্রভো! যদি মনে কর আমার ঐরূপ দেখিবার শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা আছে তবে কৃপা করিয়া আমাকে তোমার সেই অপূর্ব্ব অব্যয় আত্মরূপ দর্শন করাও।

পাঠক গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দুইটীর মধ্যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যে চারিটী পদে সম্বোধন করিয়াছেন তৎপ্রতি একবার লক্ষ্য করুন। পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম, প্রভো ও যোগেশ্বর। এই চারিটী শব্দদ্বারা অর্জ্জুনের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ বিশ্বরূপে বিভূতিবিকাশে শ্রীকৃষ্ণের অযোগ্যতা বা অক্ষমতা কিছুই নাই! কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ যোগেশ্বর এবং শক্তিপরিচালনপটু পরমেশ্বর। কিন্তু অর্জ্জুন স্বকীয় মানবীয় দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা হীনতা ও অপূর্ণতা সম্যক্‌প্রকারে অনুভব করিয়াই বলিলেন "প্রভো! যদি আমার দেখিবার শক্তি ও যোগ্যতা আছে এরূপ বোধ কর, তবেই তোমার অপরূপ আত্মরূপ দেখাও।" বাস্তবিক বিষয়ও তাই। শক্তি না থাকিলে কার্য্য হইবে কি প্রকারে? মাতৃক্রোড়স্থ শিশু কি ভীম পরাক্রম প্রকাশ করিতে বা ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র পরিচালন করিতে

সমর্থ হয়? কালে এই শিশু বয়োবৃদ্ধি সহকারে কান্তিপুষ্টিসমন্বিত শক্তিসংযুক্ত কলেবরে পরিবর্দ্ধিত হইলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তালাভ করিয়া বজ্রমুষ্টিতে অস্ত্রধারণ ও নিক্ষেপ করিতে পারিবে এবং বজ্রনির্ঘোষে ভূকম্পিত করিতেও সমর্থ হইবে। কিন্তু এখন তাহার কি অবস্থা! এখন সে নিজ অঙ্গ পরিচালনে এমন কি পার্শ্বপরিবর্ত্তনেও অপটু। কাল সহকারে যাহা ঘটিবে এখন তাহার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং শক্তিসঞ্চার এবং শক্তিসঞ্চয় ব্যতীত কোন কার্য্যই ক্ষীণশক্তি অপূর্ণদৃষ্টি মানবের দ্বারা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই, বুঝিয়াই অর্জ্জুন পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যদ্বারা নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনের মনের ভাব বুঝিয়া এবং মুখের কথা শুনিয়া বলিতেছেনঃ—

ন তুমাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

অর্থাৎ তুমি এই স্বকীয় চক্ষু (বাহ্যনয়ন) দ্বারা আমাকে দেখিতে পাইবে না, এইজন্য তোমাকে জ্ঞানময় দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার ঐশ্বরিক যোগ (রূপ) দর্শন কর।

বিশ্বরূপদর্শনাভিলাষী অর্জ্জুনের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার পর অর্জ্জুন ভগবৎকৃপায় দিব্যদর্শন লাভ করিলেন এবং দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্তিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নিজরথস্থিত কশাবল্গাধারী শ্রীকৃষ্ণের দেবদেহে অপরূপ রূপরাশি পরিদর্শন করিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে বলিয়া উঠিলেনঃ—

পশ্যামি দেবাং স্তব দেবদেহে সর্ব্বাং স্তথা ভূত বিশেষ সংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্। ইত্যাদি

অর্থাৎ হে দেব তোমার দিব্য দেবদেহে সমুদায় দেবগণ, ভূত সকল, দিব্যমূর্ত্তি ঋষিগণ সর্পসমূহ, কমলাসন ব্রহ্মা দেবেশ্বর প্রভৃতি সকলকেই সন্দর্শন করিলাম! ইত্যাদি ইত্যাদি

দিব্যদর্শনের প্রভাবে জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হইলে একই বস্তু কি ভাবে পরিষ্কৃত ও প্রতিভাত হয়, শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও বিশদ দৃষ্টান্ত॥ (ক্রমশঃ)

প্রত্যাখ্যান।

কে তুমি গো মাঝে মাঝে মরমের তারগুলি
নেড়ে দিয়ে যাও।
অতীতের স্মৃতি শত লুকায়ে রেখেছি যাহা
কেন বা জাগাও।
তোমায় আমায় সখি, ছিল যত জানা শুনা
সেত বহু দিন।
ভুলে গেছি পুরাতন, আজিকে আমার সখি
সকলি নবীন।
আজ তুমি আসিওনা কাছে, বলোনা তোমার
মরমের কথা।
কি জানি, তোমার ওই অশ্রুকণা হেরি যদি
বুকে পাই ব্যথা।
হৃদয়-কাননে আজ কত ফুটিয়াছে ফুল
কোকিল কুহরে।
ভ্রমর-ঝঙ্কার আর পাপীয়ার স্বরে সখি
কিবা সুধা ক্ষরে।
আজি এ চাঁদিনী রাতে বসন্তের মৃদু বায়
দেখ বয়ে যায়।
তুমি কেন নিয়ে এলে আঁধার এ মেঘ রাশি
ঘেরিতে আমায়।
ম্লানময়ি! সরে যাও দূরে, ঢাক আঁখি জল
তুল না ও আঁখি।
অধীর হইল হিয়া, ভেসে গেল সুখ শান্তি
তোর মুখ দেখি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র চৌধুরী।

১ম বর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৭। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীরাম প্রাণ গুপ্ত, শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীদুর্গাদাস রায়, শ্রীম—বি, এ, শ্রীকেদার নাথ মজুমদার, শ্রী—বি, এ, ও শ্রীমনোমোহন সেন।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। অটম্যান সাম্রাজ্যের উৎপত্তি	২০৯	৫। আগ্রায়	২৪৯
২। চিন্তা প্রক্রিয়া	২১৪	৬। ভারতেশ্বরীর ভারত রাজ্য	২৬২
৩। কুলীনের মান	১২১	৭। বসন্তে (কবিতা)	২৭০
৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত	২৩৮		

PRINTED BY N. K. MAZUMDAR.
MAZUMDAR PRESS,
20, Cornwallis Street.
CALCUTTA.

ময়মনসিংহ
আরতি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ ছয় আনা

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন—

আরতি নবম মাস অতিক্রম করিল। এ পর্য্যন্ত আমরা নিজ ব্যয়েই আরতির কার্য্য পরিচালন করিয়া আসিয়াছি। স্বদেশীয় সাহিত্যপ্রিয় মহোদয়গণের অনুগ্রহ ও সহানুভূতি ব্যতীত মফস্বল হইতে পত্র পত্রিকা পরিচালন করা অসম্ভব। আরতি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য করিয়া পরিচালিত হইতেছে না কিম্বা ইহা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিও নহে। আরতির একমাত্র উদ্দেশ্য সাহিত্যচর্চ্চা এবং ইহা ময়মনসিংহের সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণের সম্পত্তি। স্বদেশীয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ যদি এ সময় এ কার্য্যকে তাঁহাদিগের নিজ কার্য্য বলিয়া মনে না করেন তবে আরতি নিরুপায়। ইতি মধ্যে অনেক গ্রাহক আমাদিগের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন তাই আমরা বর্ত্তমান সংখ্যাদ্বয় কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করিয়া আনিতে সাহস করিয়াছি। এ সময় গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলে আরতির দ্বিতীয় বৎসরের জন্য আমরা প্রাণপণে খাটিতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পাইতাম। আশা করি সহৃদয় অনুগ্রাহকগণ আমাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন এবং আরতির মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা এ সময় প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিবেন। আগামী আষাঢ় মাসে আরতি দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে। বিশেষ বিবরণ আগামী সংখ্যার আরতিতে দ্রষ্টব্য।

স্থানান্তরে ছাপা হওয়ায় আমরা প্রুভ দেখিতে পারিলাম না কোন ভুল থাকিলে সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

স্থান অভাবে এবার মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করা হইল না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

(শ্রীম—কথিত)

ছাপা হইতেছে।

আরতি।

মাঘ ১৩০৭ | মাসিকপত্র, সমালোচনা। | ১ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা,

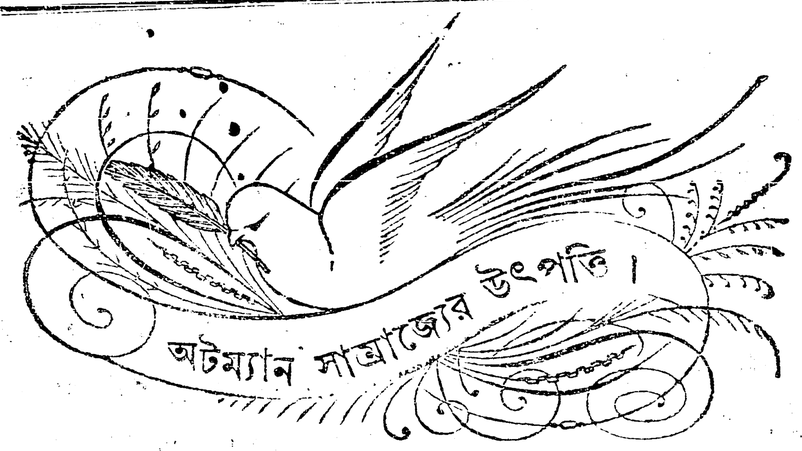

বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতি সমূহই শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি; তাঁহাদের গৌরবালোকে সমস্ত পৃথিবী সমুদ্ভাসিত, তাঁহাদের প্রবল পরাক্রমে এসিয়া ও আফ্রিকার রাজন্যবর্গ সন্ত্রাসিত, তাঁহাদের অঙ্গুলি সঞ্চালনে কখন কাহার মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। ফলতঃ বর্ত্তমান কালে খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী নরপতি গণই অমিত পরাক্রমে সসাগরা পৃথিবী শাসিত করিতেছেন; বৌদ্ধ ও মোসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মানুগত রাজন্যবর্গ হীনপ্রভ হইয়া পৃথিবীর এক কোণে মিটি মিটি জ্বলিতেছেন; খৃষ্টানজাতি সমূহ এক ফুৎকারে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে পারেন। সর্ব্বত্রই খৃষ্টান জাতির জয়; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে এরূপ শক্তিদৃপ্ত খৃষ্টানজাতি সমূহের গৃহপার্শ্বেই একজন মোসলমান নরপতি আপনার অস্তিত্ব অদ্য পর্য্যন্তও বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। এই নরপতি তুরস্কের সুলতান,

তাঁহার শাসিত রাজ্য অটম্যান সাম্রাজ্য নামে খ্যাত। তুরস্কের সুলতান তুর্কিবংশ সম্ভূত। এ বংশ ছয় শত বর্ষকাল রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত; এই দীর্ঘকাল মধ্যে কত রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু অটম্যান সাম্রাজ্য অদ্য পর্য্যন্তও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আমরা ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্যের উৎপত্তির বিচিত্র বিবরণ পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি।

কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে খারিজম নামক এক সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুলতান মহম্মদ এই সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সম সময়ে চেঙ্গিস্ খাঁ সমগ্র তুর্কিস্থান বিধ্বস্ত করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন এবং তাহার পরখিতা (উত্তর চীন) রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। চেঙ্গিস্ খাঁর অভ্যুদয় ও মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক খিতারাজ্য বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে সুলতান মহম্মদ প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য দূত প্রেরণ করেন। রাজদূত চঙ্গিস্ খাঁর দরবারে উপনীত হইলে তিনি সাদরে গৃহীত হন। উভয় রাজ্যে অব্যাধে বাণিজ্য চলিতে পারে এই মর্ম্মে চেঙ্গিস্ খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া স্বীয় দূতসহ বহু মূল্য পণ্য দ্রব্যে পূর্ণ পঞ্চশত উষ্ট্র বাণিজ্যার্থ খারিজম রাজ্যে প্রেরণ করেন। খারিজমাধিপতি সুলতান অর্থ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই বণিক দলকে সমূলে বিনষ্ট করেন। কেবলমাত্র একজন উষ্ট্র চালক দৈবাৎ শত্রু হস্ত হইতে পারিত্রাণ লাভ করিরা চেঙ্গিস্ খাঁকে এই দুষ্কার্য্যের সংবাদ প্রদান করে। এই শোচনীয় সংবাদে চেঙ্গিস খাঁর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং উহাতে সমগ্র খারিজম সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া যায়।

চেঙ্গিস্ খাঁর নির্ম্মম আক্রামনে সিন্ধু নদের সীমান্ত প্রদেশ হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সহস্র যোজন ব্যাপী ভূখণ্ড

মহাশ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছিল। মহাবল সম্পন্ন খারিজম সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হওয়াতে এসিয়ার ভাগ্যাকাশে ঘোর বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। খারিজম সাম্রাজ্যের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ ও সাহসিক খারিজম সেনা ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। বহু সংখ্যক পরিভ্রমণশীল তুর্কি সম্প্রদায় খারিজম সেনা ভুক্ত ছিল। এই সকল পরিভ্রমণশীল তুর্কি সম্প্রদায় নিরবলম্ব হইয়া পড়িলে সমধিক সাহসিক ও বলসম্পন্ন দলাধিপতিগণ সিরিয়া আক্রমণ করিয়া জেরুজিলামের পবিত্র সমাধি মন্দির কলঙ্কিত করিয়াছিল। দুর্ব্বল দলপতিগণ এসিয়া মাইনরের অধিপতি সুলতান আলাউদ্দিনের শরণাপন্ন হইয়াছিল। এই দলপতিগণের একজনই অটম্যান, তুর্কি বংশেরআদি পুরুষ। তাঁহার নাম সলিমন। সলিমন ইউপ্রেটীস নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় জলমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সলিমনের মৃত্যুর পর তদীয়পুত্র আর্ত্তুগ্রাল আলাউদ্দিনের সেনাপতি পদে বৃত হন। তিনি সনগর নদীর তীরবর্ত্তী সুগত নামক স্থান জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্ববংশ সম্ভূত চারিশত পরিবারে সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের উপর দ্বিবর্ষাধিক অর্দ্ধ শতাব্দীকাল আধিপত্য করেন। আর্ত্তুগ্রালের পুত্রের নাম ওস্‌ম্যান। তাঁহার সৈন্যগণ ওস্‌ম্যানী নামে পরিচিত ছিল। ওসম্যানালী শব্দের অপভ্রংশ হইতেই অটম্যান নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ওসম্যানকে একজন পশু চারক ও দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার নীচতা এবং পাপাশয়তার লেশমাত্র ছিল না ওসম্যান সৈনিক পুরুষোচিত নানা গুণের আধার ছিলেন; এমন কি কোন কোন গুণে তিনি সাধারণ সৈন্যাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তৎসাময়িক অবস্থা তাঁহার স্বাধীনতা ও সিদ্ধিলাভের পক্ষে অনুকূল ছিল। এসিয়া মাইনরের সেলজাক নরপতিগণের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল এবং চেঙ্গিস্

চিন্তা প্রক্রিয়া।

কিরূপে আমাদের চিন্তা কার্য্য সাধিত হয়, সে বিষয়ে বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ সম্প্রতি অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আলো উত্তাপ প্রভৃতির গতির কারণ ব্যাখ্যার বেলা যেরূপ হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ সেই অগতির গতি ঈশ্বরের সাহায্যে চিন্তাপ্রক্রিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে যখনি আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, তখনি আমাদের মস্তিষ্ক কোটরে কিঞ্চিৎ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সম্ভবতঃ সেই পরিবর্ত্তন বশতঃ ঈথর তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া তাহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে।

এই ঊর্ম্মিমালা সর্ব্বত্র সকল মস্তিষ্কেই গমন করে বটে, কিন্তু সকলে তাহা ভালরূপঅনুভব করিতে পারে না; একজন (Thought reader) তাহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারে, অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষিত মস্তিষ্ক কেবল তাহা গ্রহণ করিতে পারে; ঘুরাইয়া বলিতে গেলে। সেই কেবল সেই চিন্তাকারীর মনের কথা জানিতে পারে। সময়ে সময়ে অশিক্ষিত মস্তিষ্ক ও তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ধরিতে পারে, যেমন বিদেশগত সন্তানের বিপদ্‌বার্ত্তা অনেক সময়ে মাতা গৃহে থাকিয়া জানিতে পারেন। সেখানে বোধ হয়, তরঙ্গের জোর (অভিঘাত) খুব বেশী হয়, অথবা প্রবাসী সন্তানের বিপদ-আশ-

ঙ্কায় জননীর মস্তিষ্ক নিজের অজ্ঞাতসারে তৈয়ার (শিক্ষিত অর্থাৎ অনুকূল অবস্থাপন্ন) থাকে।

ফলতঃ যেমন আলোর ঈথর-তরঙ্গ চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়, এবং উত্তাপের ঈথর-তরঙ্গ ত্বক্ বা তাপমান যন্ত্রদ্বারা অনুভব করিতে হয়, সেইরূপ এই চিন্তার তরঙ্গ উপযুক্ত শিক্ষিত মস্তিষ্কই কেবল গ্রহণ করিতে পারে।

আমরা সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছি। সেইজন্য এই তরঙ্গও অবিশ্রান্ত ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত, প্রসারিতও প্রতিহত হইতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন জড় বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এই তরঙ্গের অস্তিত্ব-পরীক্ষার সুযোগ হয় নাই; ফটোগ্রাফীর প্লেটে ইহার কোন দাগ পড়ে না। আলো, উত্তাপ বা কোনরূপ বৈদ্যুতিক কার্য্যের উৎপত্তি ইহা হইতে হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু একজনের মস্তিষ্ক সঞ্জাত এই তরঙ্গ অপরের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়া, অনুকূল অবস্থা হইলে অর্থাৎ শেষোক্ত মস্তিষ্ক Hypuotised বা তদ্রূপ কোন অবস্থাপন্ন হইলে, প্রথমের চিন্তাদ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তি পরিচালিত হইতে পারে, তাহা ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্য দেশের ধর্ম্মাধিকরণে ও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে; ফলতঃ Hypuotism, Will-force প্রভৃতির খেলা তাহাই হইয়া থাকে। এই চিন্তা তরঙ্গের আর একটী ফল এই যে আমাদের সহচর বন্ধুগণ সচ্চিন্তা করিলে, আমরাও অল্পাধিক পরিমাণে সেই চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি। সেই জন্যই সৎসঙ্গে থাকিলে সৎ ও অসৎ-সঙ্গে থাকিলে অসৎ হওয়ার কথাটা ঠিক্।

কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ আশা করেন যে, কালে এমন কোন রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইবে যাহাকে শুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করা যাইবে। তাঁহারা বলেন যে, যখন একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্কে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়,

চিন্তা প্রক্রিয়া।

কিরূপে আমাদের চিন্তা কার্য্য সাধিত হয়, সে বিষয়ে বিজ্ঞান-বিদগণ সম্প্রতি অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আলো উত্তাপ প্রভৃতির গতির কারণ ব্যাখ্যার বেলা যেরূপ হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ সেই অগতির গতি ঈশ্বরের সাহায্যে চিন্তাপ্রক্রিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে যখনি আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, তখনি আমাদের মস্তিষ্ক কোটরে কিঞ্চিৎ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সম্ভবতঃ সেই পরিবর্ত্তন বশতঃ ঈথর তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া তাহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে।

এই ঊর্ম্মিমালা সর্ব্বত্র সকল মস্তিষ্কেই গমন করে বটে, কিন্তু সকলে তাহা ভালরূপঅনুভব করিতে পারে না; একজন (Thought reader) তাহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারে, অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষিত মস্তিষ্ক কেবল তাহা গ্রহণ করিতে পারে; ঘুরাইয়া বলিতে গেলে। সেই কেবল সেই চিন্তাকারীর মনের কথা জানিতে পারে। সময়ে সময়ে অশিক্ষিত মস্তিষ্ক ও তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ধরিতে পারে, যেমন বিদেশগত সন্তানের বিপদ্‌বার্ত্তা অনেক সময়ে মাতা গৃহে থাকিয়া জানিতে পারেন। সেখানে বোধ হয়, তরঙ্গের জোর (অভিঘাত) খুব বেশী হয়, অথবা প্রবাসী সন্তানের বিপদ-আশ-

ঙ্কায় জননীর মস্তিষ্ক নিজের অজ্ঞাতসারে তৈয়ার (শিক্ষিত অর্থাৎ অনুকূল অবস্থাপন্ন) থাকে।

ফলতঃ যেমন আলোর ঈথর-তরঙ্গ চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়, এবং উত্তাপের ঈথর-তরঙ্গ ত্বক্ বা তাপমান যন্ত্রদ্বারা অনুভব করিতে হয়, সেইরূপ এই চিন্তার তরঙ্গ উপযুক্ত শিক্ষিত মস্তিষ্কই কেবল গ্রহণ করিতে পারে।

আমরা সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছি। সেইজন্য এই তরঙ্গও অবিশ্রান্ত ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত, প্রসারিতও প্রতিহত হইতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন জড় বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এই তরঙ্গের অস্তিত্ব-পরীক্ষার সুযোগ হয় নাই; ফটোগ্রাফীর প্লেটে ইহার কোন দাগ পড়ে না। আলো, উত্তাপ বা কোনরূপ বৈদ্যুতিক কার্য্যের উৎপত্তি ইহা হইতে হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু একজনের মস্তিষ্ক সঞ্জাত এই তরঙ্গ অপরের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়া, অনুকূল অবস্থা হইলে অর্থাৎ শেষোক্ত মস্তিষ্ক Hypuotised বা তদ্রূপ কোন অবস্থাপন্ন হইলে, প্রথমের চিন্তাদ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তি পরিচালিত হইতে পারে, তাহা ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্য দেশের ধর্ম্মাধিকরণে ও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে; ফলতঃ Hypuotism, Will-force প্রভৃতির মূলে তাহাই হইয়া থাকে। এই চিন্তা তরঙ্গের আর একটী ফল এই যে আমাদের সহচর বন্ধুগণ সচ্চিন্তা করিলে, আমরাও অল্পাধিক পরিমাণে সেই চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি। সেই জন্যই সৎসঙ্গে থাকিলে সৎ ও অসৎ-সঙ্গে থাকিলে অসৎ হওয়ার কথাটা ঠিক।

কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ আশা করেন যে কালে এমন কোন রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইবে যাহাকে শুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করা যাইবে। তাঁহারা বলেন যে, যখন একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্কে রাসায়ণিক পরিবর্ত্তন হয়

তখন মস্তিষ্কের বাহিরে অনন্ত কোটী দ্রব্যের মধ্যে কোন একটী দ্রব্যের উপরে সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন যে হয় না, তাহা কে বলিল? মেরুজ্যোতিঃ (Aurora Borealis) বিকাশ পাইলে সহস্র মাইল দূরস্থিত দিক্‌শূন যন্ত্রের শলাকা বিচলিত হয়, এবং কোটী যোজন দূরস্থিত সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্ক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; ইহাও কি সামান্য বিস্ময়ের কথা? অথচ ইহা একটী পরীক্ষিত সত্য!

অন্য একজন বিজ্ঞানবিৎ বলেন যে, মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া বলা হইতেছে। তাহা বর্ত্তমান কোন লেবরেটরীতে প্রমাণি হয় নাই। সুতরাং এই তথা কথিত পরিবর্ত্তনটাকে হয় শুদ্ধ একটা কল্পিত ব্যাখ্যা (theory) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, না হয় 'রাসায়নিক পরিবর্ত্তন' শব্দের বর্ত্তমান অর্থের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উপাদানের মধ্যে প্রচলিত জড়বিজ্ঞানের অতিত কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, জীবন মরণ চিন্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা এখন পর্য্যন্ত কিছুই খাটীরূপে জানিনা; তবে এসব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইতেছে সকলই সুবিধামূলক কল্পিত ব্যাখ্যামাত্র। মানুষ কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলেও সে তাহা স্বীকার করিতে চায় না, বুঝি তাহার আত্ম-সম্মান জ্ঞান আহত হয়; তাই সে নানা রূপ ব্যাখ্যার (Theory) উদ্ভাবন করিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দেয়; কত অসংলগ্ন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া লয়; সংক্ষেপে সে আত্ম-প্রতারনা হইতে আত্ম-প্রসাদ আদায় করিয়া থাকে। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডকে সহসা অন্ধকারাবৃত হইতে দেখিয়া অজ্ঞলোকে থিওরী বাহির করে যে রাহু নামক এক নির্ম্মম দৈত্য প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে; বিজ্ঞলোকেরা এই ব্যাখ্যা শুনিয়া কতই না হাসিয়া থাকেন। কিন্তু সেই বিজ্ঞেরাই আবার আলোর

বিস্তার, উত্তাপের বিকীরণ প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে না পারিয়া শেষে দুর্ব্বোধ্য ঈথর তরঙ্গের সাহায্যে একটা গোজামিল-গোছের ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ এই ঈথর জিনিষটি কি, তাহা যৌগিক কি মৌলিক, তাহার প্রকার ভেদ আছে কি না, এসব বিষয়ে কেহই কিছু নিশ্চিত রূপে জানেন না, বা সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে এ পর্য্যন্ত ঈথরের কোন সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন সংজ্ঞাই মিলিতেছে না; নিত্য নূতন নূতন ঘটনা ইহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়াতে বেচারা কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না; কালে হয়ত সে গুরুতর ভারেপঙ্গু হইয়া অন্য কোন যোগ্যতর নূতন লোকের হাতে ভার দিয়া পেন্সন লইবে। ঠিক্ এইরূপ 'কেলরিক্' (Caloric) করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে বলিতেন যে 'কেলরিক' নামক এক অতি সূক্ষ্ম তরলাতিতরল পদার্থের প্রবেশ বশতঃই কোন জিনিষ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। অগ্নি, সূর্য্য কিরণ প্রভৃতিতে এই জিনিষ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে, সেই জন্য কোন জিনিষ ইহাদের সংশ্রবে বা সন্নিকটে আসিলে তাহাতে কেলরিক প্রবেশ করিয়া তাহাকে উত্তপ্ত করে। কিন্তু পরে যখন জড়বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সাহায্যে ধাতুর তার সংযোগে ব্যবধানস্থিত কোন জিনিষকে উত্তপ্ত করা গেল, অথচ মধ্যবর্ত্তী তার তপ্ত হইল না, তখন কেলরিক্‌কে অকর্ম্মণ্য বিবেচনায় পেন্সন দিয়া বিদায় দেওয়া হইল, এবং হাল্ আমলের আম্‌দানী স্পন্দন-বাদকে (vibration theory) তৎপদে মহাসমারোহে অভিষিক্ত করা হইল। ঈথর সম্বন্ধেও কালে সেরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ঈথরের সংজ্ঞা এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে তাহার সার মর্ম্ম এই—ইহা একটি অবাঙ্‌মনসোগোচর অতীন্দ্রিয় অতি শিথিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ।

ঈথর ও ম্যাটার এর (Matter) মত দুইটি পরস্পর বিসদৃশ

কর্ণাভিমুখ বিপরিত পদার্থ (?) কিরূপে 'মিশ্' খাইতে পারে, তাহাও বিবেচ্য। এমন কি এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া অনেকে ঈথরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে নারাজ্। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন্ এই আপত্তির একটি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, যদিও বায়ব্য ও তরল পদার্থের নিশ্চল অবস্থায় কোনরূপ সংহতত্ব (rigidity) নাই, তথাপি তাহাদিগকে দ্রুত বেগে চালিত করিতে পারিলে সংহত করা যাইতে পারে, ঘুর্ণিবায়ু ও জলাবর্ত্ত তাহার দৃষ্টান্ত। তিনি আরো বলেন যে ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থের উপাদান স্বরূপ যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরমাণু আছে, হয়ত সেই সব পরমাণুও এই ঈথরেরই ন্যূনাধিক বেগে ঘুর্ণন ফল মাত্র। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে জগতে কেবল একটি মাত্র মূল পদার্থ ঈথর—আছে, ইহা স্বীকার করিলেই চলিতে পারে, মিছামিছি প্রায় ছয় ডজন ভূতের বোঝা বহিয়া মরি কেন? ফলতঃ এই অভিনব মত প্রমাণ করিয়া উঠিতে পারিলে জগতে এসব তাপাদনের (generalisation) পরাকাষ্ঠা হইল বলিতে হইবে।

অন্য দিক্ হইতেও সম্প্রতি এইরূপ আর একটি মত বিজ্ঞানের ধর্ম্মাধিকরণে স্বত্বসাব্যস্তের দরখাস্ত দিয়া হাজির হইয়াছে। সেই পক্ষের উকীলেরা বলিতেছেন যে micratom নামক অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতেই যাবতীয় জড় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, অর্থাৎ আপাতঃ প্রতীত সমুদয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুই এই নব সূক্ষ্ম পরমাণুর বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র। অহো! কি সুন্দর ও আরামজনক সমানতাপাদন! ঠিক্ যেন শ্রমক্লিষ্ট ঘর্ম্মাক্ত পিপাসার্ত্ত বদনে বরফ সংযুক্ত লেমনেড্! ফলতঃ, আমরা এখন যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই যেন দেখিতে পাই:—Generalisation is the order of the day.

লর্ডকেল্‌ভিনের মীমাংসায় একটু খট্‌কা আছে। যদি শুদ্ধ

ঘুর্ণন গতির বেগ বৃদ্ধিদ্বারা ঈথরের মত অতি সূক্ষ্ম অতিলঘু ধরিতে ছুঁইতে নারি পদার্থকে কঠিণীভূত করা যায়। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে ঈথর নিশ্চয়ই চাপ-সহ (compressible); যদি চাপ-সহ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার অণু (molecule) আছে। ইহার পরের সিঁড়িতে নামিয়াই স্বীকার করিতে হয় যে ঐ অণুগুলি স্থিতি স্থাপক। এখন, যদি অণু স্থিতি স্থাপক বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তবে উহার ঐ স্থিতিস্থাপকতা গুণ বুঝাইবার জন্য দ্বিতীয় এক ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ যে সর্ষের সাহায্যে ভূত ছাড়ান অভিপ্রেত ছিল, সেই সর্ষেকেই ভূতে পাইয়া বসে।

কেহ কেহ ঈথরের সাহায্য ব্যতিরেকেও চিন্তা প্রক্রিয়া বুঝাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে আলো ও উত্তাপের বিকীরণ, বিনা তারে টেলিগ্রাফী, চিন্তা কার্য্য প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এই অজ্ঞাতকুলশীল ঈথরকে ডাকিয়া আনা হয় কেন? মানিলাম যেন ঐ অত্যুর্দ্ধ আকাশে যেখানে বায়ু নাই, বাষ্প নাই, মৃত্তিকা নাই কঠিন তরল বা বায়ব্য কোন পদার্থই নাই সেখানে চন্দ্র সূর্য্যাদির আলো ও উত্তাপের একটা ভূতল সংলগ্ন পথ আবিষ্কারের জন্য ঈথর বা তদ্রূপ কোন রহস্য-গর্ভ পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করা আবশ্যক; কিন্তু তাই বলিয়া জীবন মরণ চিন্তন প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতি কার্য্যের বেলাও যে তাহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে, এমন কি কথা? বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞান কি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নহে?

এই না সে দিন দেখা গেল যে আমাদের আজন্ম পরিচিত অষ্ট প্রহর মাখামাখি বিশিষ্ট বায়ু রাশির মধ্যেও এমন গুটী তিনেক ভূত লুকায়িত আছে যে এ পর্য্যন্ত কোন ওঝাই তাহাদিগকে ধরিতে

পারেন নাই *; এইরূপ নিত্য নূতন পদার্থ ও শক্তি (energy) জগতে কতই আবিষ্কার হইতেছে ও হইবে। কালে হয় ত এমন কোন পদার্থ বা শক্তির আবিষ্কার হইবে যাহার সাহায্যে জীবন মরণ ও চিন্তন ক্রিয়ার কারণ বিশদীকৃত হইতে পারে। অবশ্য সেই পদার্থ ও শক্তিকে জড়বিজ্ঞানের অধিকারে আনিতে জড় পদার্থের পরিসর ও বর্দ্ধিত করিতে হইবে। হইতে পারে আমরা যখন চিন্তা করি, তখন সেই পদার্থ এক অজ্ঞাত প্রণালীতে কার্য্য করিয়া অপরের মনেও সেই চিন্তা উদ্রেক (Induce) করিয়া থাকে। আমরা জানি যে একখণ্ড লৌহকে তামার তারের কুণ্ডলীর মধ্যে রাখিয়া সেই তারের দুইমুখ একটী ব্যাটারির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে লৌহ খণ্ডটীর মধ্যে এক নূতন শক্তি সঞ্জাত হইয়া উহাকে চুম্বক লৌহে পরিণত করে; গৃহের মধ্যে কোথাও একটী ব্যাটারী চালাইয়া দিলে গৃহস্থিত যাবতীয় চুম্বক শলাকা তাহা-দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে। সেইরূপ হইতে পারে যে আমাদের চিন্তন ক্রিয়া দ্বারা (মানব মস্তিষ্কে বা বায়ুমণ্ডলে কোন একটী অজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্ব বশতঃ) সেই চিন্তা অপরের মস্তিষ্কেও উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। সেই পদার্থ খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমান পরিচিত যাবতীয় জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ এক পৃথক রকমের? কিন্তু তাহাতে আসে যায় কি? (Hypnotism) ব্যাপারটাই তো সমুদয় প্রাকৃতিক ব্যাপারের (natural phenomena) বাহিরে। অথচ সেই দিন চলিয়া গিয়াছে যখন এই ব্যাপারে বিশ্বাস করা অশিক্ষা বা অপশিক্ষার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন শিক্ষিতদের মধ্যে প্রায় সকলেই উহাতে বিশ্বাস করেন,

* বায়ুমণ্ডলে Helium, argon ও Crypton নামক তিনটী নূতন মূলপদার্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। Etherium সম্বন্ধে এখনো সন্দেহ আছে, উহাকে লইলে চারিটী হয়।

এমন কি এখন এ সম্বন্ধে কিছু না জানা বা না বলাই শিক্ষাভাব বা সঙ্কীর্ণ মনের লক্ষণ। তবে ভাই, "চিরদিন সমান যায় না, যুবতীও এক দিন ধুমাবতী সাজে", এই কথা স্মরণ করিয়া জড় পদার্থও প্রাকৃতিক ঘটনার সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত কর, Either, Psychic force প্রভৃতি অভ্যাগত অতিথিকে, সময় বুঝিয়া সাদরে গৃহে লইয়া যাও; ইহাদিগকে আর অস্পৃশ্য ও হেয় মনে না করিয়া 'জল-চল' করিয়া লও।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুলীনের মান।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কুলীনের মান সমন্ধে দু'চারিটী কথা বলিব। দেশে এখন কুলীনের মান নাই বলিলেও চলে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সমাজে ইহাদের প্রভূত সম্মান ছিল সে সম্মান সে মর্য্যাদা আর কখনও ফিরিয়া আসিবে এমন আশা বা আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। ফিরিয়া না আসিলেই হয় ত সমাজের মঙ্গল। তবে মধ্যে যে কৌলিন্য একবারে যায় যায় হইয়া উঠিয়া-ছিল এখন যেন সে ভাবটাও গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে কুলীনের আবার মান কি? কৌলীন্য বর্থতার চিহ্ন এবং সমাজের উন্নতির এক ভীষণ অন্তরায় এ কথা বিদ্যালয়ের বালকের মুখেও ধ্বনিত হইত। রেইসএণ্ড রাইয়ত পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গগত সুপণ্ডিত নন্তু-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার লিখিয়াছিলেন আজকালি যে কেহ দু পাত ইংরাজী পুস্তক উল্টাইয়াছে তাহারই মুখে শুনিবে লাগাও

বল্লাল সেনের মাথায় পঁচিশজুতো। অধুনা এই কুলীন বিদ্বেষ স্রোতটা যেন কিছু মন্দ হইয়া আসিয়াছে। কৌলীন্যও অনেকটা মাথা নোয়াইয়াছে; আর দেশের লোকও তাহার প্রতি তেমন খড়্গহস্ত নহেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই মনে হয় পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবল বন্যা প্রথম প্রথম আসিয়া জাতিভেদ প্রভৃতি পুরাতন বাঁধের ন্যায় অপেক্ষা কৃত আধুনিক এবং অল্পবিস্তৃত কৌলীন্যের প্রতি যে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিল তাহাতে কিছু দিনের জন্য অনুমান হইয়াছিল, সামাজিক সকল বাধই ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু ক্রমে ইহারা যেন ধাক্কা সামলাইয়া উঠিল। এক একটা বাঁধ হইতে অল্প বা অধিক পরিমাণে মাটী খসিয়া গেল সত্য। কিন্তু বাঁধ একেবারে ধসিল না। কৌলীন্য যে রহিয়া গিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মফস্বলে এখনও দরিদ্র কুলীন কুলরক্ষার নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণেরঘরে এখনও অধিক বয়সের অনূঢ়া কন্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পাল্টি ঘরের বর না পাইলে কন্যার বিবাহ দিবেন না জনক জননীর ইহাই প্রতিজ্ঞা। তবেই আর কৌলীন্য গেল কোথায়? ফলতঃ ধাক্কা সামলাইয়া এখন যেন এই প্রথা আবার একটু মাথা তুলিয়া উঠিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের এক জন পূজনীয় প্রৌঢ় বয়সের ব্রাহ্মণসুহৃৎ তাঁহার পুত্রের বিবাহের সময়ে আক্ষেপ করিয়া কহিলেন—বাবু, কি অন্যায়ই করিয়াছি? আপনি জানেন না আমি ইচ্ছা করিয়া স্বকৃতভঙ্গ। মনে করিয়াছিলাম ইরাজি শিক্ষায় এসব কিছুই থাকিবে না। কৌলীন্য সমূলে উৎপাটিত হইবে। এখন দেখিতেছি আবার যেন নূতন করিয়া শিকড় গজাইতেছে। কি নির্ব্বোধের কাজই করিয়াছি? বস্তুতঃ বল্লালকে বিতাড়িত করা দূরের কথা, এখনও আমরা দেবীবরকে দূর করিতেই সমর্থ হই নাই। সম্প্রতি আমাদের একজন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় বি, এল, বন্ধু কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন মেল্ ভঙ্গ করিলে দু একটি ভাল ছেলে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে আমি সম্মত নহি। মেল্ ভঙ্গ না করিয়া ছেলে একটু খারাপ পাই তাহাতেও ক্ষতি নাই। তাই বলিতে ছিলাম কৌলিন্য যায় নাই, কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে মাত্র। আমরা আধুনিক সামাজিক ব্যঙ্গ নাট্যে দেখিতে পাই বটে যে কৌলিন্য এখন বিশ্ববিদ্যালয় ও অট্টালিকা আশ্রয় করিয়াছে কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে অনেক শিক্ষিত কুলীন সন্তানও সহসা কুল ভঙ্গ বা মেল্ ভঙ্গ করিতে সম্মত নহেন।

কৌলীন্য রহিয়াছে কিন্তু কুলীনের মান গিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কুলীনের যে সম্মান ছিল তাহা এখন গল্পের বিষয়ীভূত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজে কুলীনের মান আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এখন দুই একটী পুরাতন কথা নিঃসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। সে কালের সমাজে কুলীন এবং কুললক্ষ্মীর রীতিমত পূজা হইত। অকুলীন যে কেহ বড় মানুষ হইলে তাহার প্রথম কার্য্যই ছিল কুলক্রিয়া করা এবং স্বগ্রামে দুই একজন কুলীন স্থাপিত করা। অধিকাংশ কুলীনই তখন মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতেন। বড় মানুষ শ্বশুরের গৃহে অবস্থিতি কুলীন জামাতার পক্ষে দূষনীয় ছিল না। শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক বড় মানুষেরা কে কত কুলীনকে আশ্রয় দিয়াছেন এবিষয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। যাহার গৃহে যত অধিক কুলীন বান্ধা থাকিতেন তিনি আপনাকে ততই কৃতার্থ মনে করিতেন। এখনও বঙ্গের অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পরিবার সেকালের কুলীনের আশ্রয় স্থান বলিয়া সমাজে

সমধিক সমাদৃত *। দেশের অনেক কুলীন এখণও মাতামহের বা পিতার মাতামহের ভূসম্পত্তি পাইয়া জমিদার হইয়া বসিয়া আছেন। অনেকে আজিও পূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে সম্বন্ধে অকুলীন জমিদারের উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন কেহ কেহ রাজকরের ন্যায় বার্ষিক শস্য আদায় করেন। এ সম্বন্ধে বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত রায়ের কাটির দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ জমিদার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যশোহরের অনেক কুলীন এখনও রায়ের কাটি হইতে বৎসর বৎসর ধান্য আনিয়া থাকেন।

ফলতঃ তখন কুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার নিমিত্ত লোকের আগ্রহ অতিশয় অধিক ছিল। একটী বড়কুলীনকে জামাতা করিবার জন্য বা একটি বড় কুলীনের কন্যাকে পুত্র বধু রূপে পাইবার নিমিত্ত এক এক জন ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে অর্থরাশি ব্যয় করিতেন বর্ত্তমান সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলীন জামাতার ভাগ্যেও তত অর্থ প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে না। লেখকের পরিচিত কোন একটি মৌলিক কায়েস্থ পরিবারের একজন পূর্ব্ব পুরুষ ভাগ্য গুণে বিলক্ষণ বড় মানুষ হইয়াছিলেন সর্ব্ব প্রথমেই তিনি তাহার দুইটি কন্যাকে শ্রেষ্ঠ কুলীনে সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত বিপুল অর্থরাশি ব্যয় করিয়া ফেলেন। ইহাদের বিবাহ যথাক্রমে দক্ষিণ রাঢীয় কায়স্থ কুলীনের সর্ব্ব প্রধান ও জঙ্গলবাদাল গ্রামে হইয়াছিল। উপরোক্ত মৌলিক বড়লোক তাহার বাড়ীতে কোঠা দেন নাই কেহ তাঁহাকে কোঠার

* পূর্ববঙ্গের এক ঢাকা জিলাতেই বজ্রযোগীনীর পুষিলাল, রোয়াইলের কাশ্যপ ও তারপাশায় মহাশয় পরিবার কুলীন প্রতিপালনের নিনিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনুসন্ধান করিলে বঙ্গের অনেক জিলাতেই এমন দুই একটী পরিবার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কথা বলিলে বলিতেন আমি বাঘুটীয় ও জঙ্গলবাদালে দুই কোঠা দিয়া রাখিয়া গেলাম।

এতদ্ভিন্ন প্রায় বিবাহ মাত্রেই কুলীন বিদায় ছিল এক এক বিবাহে সর্ব্বশুদ্ধ যাহা ব্যয় হইত অনেক সময়ে তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক কুলীনেরাই পাইতেন। বিবাহ ব্যতীত পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতির সময়েও কুলীন বাড়ীতে আসিলে অকুলীন বড় মানুষকে তাহাদের মর্য্যাদা রক্ষার্থ কিছু কিছু অর্থ দিতে হইত। কেহ কেহ বিনা ব্যাপারেও কেবল কুলীনের সভা করিয়া তাহাদিগকে সম্মান করিতেন। শোভাবাজার রাজবংশের উজ্জ্বল রত্ন কায়স্থ কুলতিলক সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর একবার বঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীনগণের ঐরূপ এক সম্মিলন করিয়াছিলেন ইহাতে দেশস্থ ঐ শ্রেণীর সমস্ত কুলীনকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং সকলের সমাবেশ হইলে তাঁহারা স্ব স্ব মর্য্যাদা অনুসারে বিদায় পাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে রাজা বাহাদুরের প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়।

আজ কাল আহার সম্বন্ধে কুলীন অকুলীনে প্রভেদ নাই বলিলেই চলে; কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্বে একজন নিঃসম্পর্ক কুলীন বাড়ীতে আসিলে অকুলীন গৃহস্থের সাহস হইত না যে তাহাকে আপন পরিবার কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন আহার করিতে বলেন। কুলীন সন্তান অনুগ্রহ করিয়া মৌলিকের বাড়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহাকে তজ্জন্য দক্ষিণা দিতে হইত। সেদিন "প্রতিবাসী" পত্রে, পড়িলাম সদ্‌গোপ শ্রেণীর মধ্যে এখনও এই প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গের ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থ সমাজ হইতে ইহা প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে আমরা অবশ্যই এ প্রথার পক্ষপাতী নহি এবং ইহার তিরোধানে সমাজের মঙ্গল হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে

অতিশয় দৃঢ় নিয়ম ছিল। পল্লীগ্রামে দুই এক স্থানে এখনও ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীর এক জন অতি প্রধান কুলীন ময়মনসিংহের কোন জমিদারের সরকারে কর্ম্ম করিতেন। সেই জিলার অধিবাসী ময়মনসিংহ প্রবাসী এক জন কায়স্থ ভদ্র লোক একদিন অতিশয় সঙ্কোচের সহিত তাহাকে বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। কুলীন পুত্র উত্তর করিলেন, "মহাশয় ক্ষমা করিবেন, কর্ম্মকার কুম্ভকার সূত্রধারের বাড়ীতে আহার করিতে পারি, তথাপি নিঃসম্পর্ক কায়স্থের বাড়ীতে ভোজন করিতে সম্মত নহি। কায়েস্থের বাড়ীতে পাতা পাড়িলে, চারি পাঁচ শত টাকাই পাইতে পারি।

আমরা কুলীনের সম্মান সম্বন্ধে এখানে আর একটী কৌতুকাবহ আখ্যান বিবৃত করিব।

জিলা যশোহরের রাঘুটিয়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার সময়ে বঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা উপরে সার রাজা রাধাকান্তের অনুষ্ঠিত যে কুলীন সমাবেসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি কথিত আছে চণ্ডীচরণ ঐ সভায় সর্ব্ব প্রথমে মালা চন্দন পাইয়াছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই দেশের সর্ব্বত্র এই কথা প্রচারিত হইয়াছিল এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় কয়াস্থ মাত্রই চণ্ডীচরণের নাম জানিয়াছিলেন। যশোহর জিলার মধ্যে চণ্ডীচরনের সম্মান এতই অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে ঐ জিলার কায়স্থ মাত্রই তাহাকে পূজা করিতেন। এবং সামান্য লোকেও তাঁহাকে একজন অদ্বিতীয় সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া জানিত। দেশের অবস্থা অনুসারে চণ্ডীচরণ অনেক সময়ে এখানে ওখানে পদব্রজেই ভ্রমণ করিতেন। কোন নদীর কোন খেয়া ঘাটেই তাহাকে পার হইবার জন্য পয়সা দিতে হইত না। ইহার কারণ এই যে নদীর এক পারে বা অপর পারে নিকটে কোন

সঙ্গতিপন্ন কায়স্থের বাস থাকিবেই থাকিবে; আর ঘাটের পাটুনীর সহিত ঐরূপ গৃহস্থের বার্ষিক বন্দোবস্ত থাকিবারই কথা। চণ্ডীচরণ কায়স্থ মাত্রেরই পূজ্য। একবার চণ্ডীচরণ কোন এক খেয়া ঘাটে পার হইতেছিলেন সঙ্গে একটি মাত্র লোক ছিল। শীতকাল চণ্ডীচরণের গাত্রে এক খানি মূল্যবান গাত্রবস্ত্র ছিল। নৌকায় এক যুবক পাটুনী লোক পার করিতেছিল সে কখনও চণ্ডীচরণকে দেখে নাই অপরিচিত লোক দেখিয়া সে পয়সা চাহিল চণ্ডীচরণ একটু হাসিয়া কহিলেন আমিত কখন কোন খেয়া ঘাটে পয়সা দেই না। পাটুনী পুত্রের চণ্ডীচরণের নাম জানা ছিল সে সহসা কহিয়া উঠিল মহাশয় কি বাঘুটিয়ার চণ্ডীচরণ ঘোষ আসিয়াছেন যে কোন ঘাটেই পয়সা দেন না? চণ্ডীচরণ মনে মনে হাসিলেন, এবং প্রকাশ্যে কহিলেন পয়সা আমার আছে নাই; তুমি এই গায়ের কাপড় খানি রাখ। আমি যে স্থানে যাইতেছি সেখান হইতে পয়সা পাঠাইয়া দিয়া ইহা ফেরত লইয়া যাইব। বক্তা যে স্বয়ং চণ্ডীচরণ, পাটুনী ইহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে গাত্র বস্ত্র রাখিয়া দিল। চণ্ডীচরণ পার হইয়া তীরে নামিলেন। কিছু দূরেই এক জমিদারের কাছারী। তথায় নায়েব কায়স্থ। চণ্ডীচরণ তাহার নিকটই যাইতেছিলেন। কাছারীতে পৌছিবা মাত্র নায়েব দরবার ভাঙ্গিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং চণ্ডীচরণকে নমস্কার করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার গাত্র বস্ত্র নাই দেখিয়া নায়েব স্বয়ংই যেন অপ্রস্তুতের ন্যায় হইলেন চণ্ডীচরণ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন পয়সার জন্য আপনার ঘাটের পাটুনী আমার গায়ের কাপড় রাখিয়া দিয়াছে। নায়েব মহাশয় ক্রোধে অগ্নি শর্ম্মা হইলেন। পাটুনী পুত্রকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ যম কিঙ্কর সদৃশ দুই দ্বারবান প্রেরিত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই পাটুনী আসিয়া উপস্থিত। নায়েব

কেবল হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন এমন সময়ে চণ্ডীচরণ কহিলেন উহাকে কিছু বলিবেন না। আমি গায়ের কাপড় দান করিয়া আসিয়াছি ও আমাকে চিনে না কিন্তু আমার নামের মান জানে। বিদ্রূপ করিয়া আমাকে বাঘুটিয়ার চণ্ডীচরণ ঘোষের সহিতই তুলনা করিয়াছিল। আমি স্বয়ং চণ্ডীচরণ একথা জানিলে কখনও প্রশংসা চাহিত না। রণাবাহুল্য নায়েব মহাশয় কর্ত্তৃক সেই দিনই চণ্ডী চরণের জন্য যথাসম্ভব এক খানি নূতন গাত্রবস্ত্র সংগৃহীত হইল।

কুলীনের এ সম্ভ্রম এখন কোথায়? তখন কুলীনের অন্নবস্ত্র সংস্থানের ভারই যেন শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিকের উপর ছিল। তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেন আর কুলীন জামাতা কুলীন ভাগিনেয় অথবা কুলীন দৌহিত্র এবং এমন কি সময়ে সময়ে কুলীন বৈবাহিকও সপরিবারে বসিয়া বসিয়া খাইতেন। এখন সে দিন গিয়াছে কুলীন সন্তানকে মসি লেখনীর আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বঙ্গীয় বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামে কুলীন অকুলিনের একই দশা। ভবিষ্যতে আর কখনও কুলীন সেই সাবেক সম্মানের অধিকারী হইবেন ইহা একান্তই অসম্ভব। আমরা সেইরূপ সম্ভ্রমের সমর্থনও করি না আমাদের বক্তব্য এই যে কুলীনকে দেশের শ্রেষ্ঠ বংশ সম্ভূত বলিয়া সম্ভ্রম করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সম্ভ্রমের বড়ই অভাব হইয়া আসিয়াছে। আমাদের মনে হয় কুলীনের বংশ বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ। কৌলীন্য কেবল বল্লাল সেনের মস্তিষ্ক উদ্ভূত কোন অনিয়ম সম্ভূত প্রথা নহে। আমরা দেখাইব বর্ত্তমান বঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে এবং আপনাদের প্রতিভা উদ্যম ও অধ্যবসায়ের গুণে যাঁহারা আপন মস্তক উন্নত ও মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই কুলীন। নিম্নে ব্রাহ্মণ কায়স্থের কতকগুলি কুলীন বড়লোকের একটী তালিকা দিলাম।

বন্দ্যোপাধ্যায়।

পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর
জষ্টিস গুরুদাস
অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ
জষ্টিস প্রমদানাথ

রেভাঃ ডাঃ কৃষ্ণমোহন
বারিষ্টার প্রবর উমেশ চন্দ্র
বাগ্মীপ্রবর কালীচরণ
কবিবর হেমচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষাবিভাগের শিরোভূষণ ভূদেব
সম্পাদক হরিশচন্দ্র
সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র

জষ্টিস অনুকূল চন্দ্র
ডাক্তার আশুতোষ

চট্টোপাধ্যায়।

উপন্যাস গুরু বঙ্কিম চন্দ্র
সি, এস অতুল চন্দ্র
ডাঃ অঘোর নাথ

জষ্টিস প্রতুল চন্দ্র
জজ কিশোরী মোহন

লাহিড়ী।

ঋষি প্রতিম রাম তনু

অধ্যাপক প্রসন্ন কুমার

মিত্র।

ভাষাবিৎ রাজেন্দ্র লাল
জষ্টিস রমেশ চন্দ্র
রায় দীন বন্ধু

জষ্টিস দ্বারকা নাথ
রাজা দিগম্বর
গ্রন্থকার প্যারী চান্দ

বসু।

ঋষি প্রতিম রাজ নারায়ণ
র‍্যাংলার আনন্দ মোহন
রায় বিপিন কৃষ্ণ
দানশীল শ্রী গোপাল

অধ্যাপক প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী
বিজ্ঞানবিৎ জগদীশচন্দ্র
গ্রন্থকার চন্দ্র নাথ
ডাঃ জগবন্ধু

ঘোষ।

বাগ্মী রামগোপাল — জষ্টিস্ চন্দ্র মাধব
বারিষ্টার মনোমোহন — উকিল জঃ রাসবিহারী
ঐ লালমোহন — সম্পাদক শিশির কুমার
কাব্যবিৎ কালীপ্রসন্ন (রায়বাহাদুর) — সুলেখক নগেন্দ্র নাথ

এ তালিকায় আরও অনেক নাম সংযোগ করা যাইতে পারে। পাঠক দেখিবেন দেশের অধিকাংশ বড় লোকের নামই এই তালিকার অন্তর্ভূত। যেরূপ কজন বাঙ্গালী হাই কোর্টের জজ হইয়াছেন তাহারা সকলই কুলীন হাইকোর্টের বড় বারিষ্টার, বড় উকীল, কুলীন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় লেখক, সম্পাদক, বাগ্মী, ভাষাবিৎ, বিজ্ঞানবিৎ। প্রত্নত্ত্ববিৎ কবি ও গ্রন্থকার এবং ধর্ম্ম-জগতে সুপরিচিত অনেক বড় লোকও এই তালিকার মধ্যে আছেন। কায়স্থের মধ্যে দত্ত কুলীন নহেন কিন্তু তাহারাও কুলীনের সমকক্ষ। কিম্বদন্তি এই যে তাহারা ইচ্ছা করিলেই কুলীন হইতে পারিতেন এই জন্যই আমরা মধুসুদন দত্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত দেখিতে পাই। ইহার অর্থ কি? অর্থ কেবল এই সমস্ত উচ্চ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব। কার্য্য ক্ষেত্রের যে কোন বিভাগেই দৃষ্টিপাত করি না কেন আমরা এই কুলীনের শ্রেষ্ঠত্বই দেখিতে পাই। ইংলণ্ডের সিবিল সার্জ্জনে প্রতিযোগিতায় সর্ব্ব প্রথম অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চ্চায় জগতের প্রশংসা ভাজন শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু। কলিকাতা হাইকোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং পাঞ্জাব চিফ্ কোর্টে যে কয়েকজন বাঙ্গালি জজ বসিয়াছেন তাহারা সকলেই কুলীন। বাঙ্গালার সবজজদিগের মধ্যে একজন মাত্র হাইকোর্টে উঠিয়াছিলেন তিনিও কুলীন—স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ বসু। কায়স্থ ব্রাহ্মণ সব জজের মধ্যে যে কয়েকজন সহকারী জেলার জজ বা জেলায়

জজ নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ও কুলীন যথা অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় যোগেশ চন্দ্র মিত্র এবং দ্বারকানাথ মিত্র। ডিপুটি কালেক্টর দলের মধ্যে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী হইয়াছিলেন রাজেন্দ্র নাথ মিত্র। কলিকাতায় কালেক্টর আছেন রায় দুর্গাগতি বন্দোপাধ্যায়। সম্প্রতি রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের ইংস্পেক্টর জেনারেল জেলারমাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র। ডাক বিভাগে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালি উচ্চ কর্ম্মচারী দীনবন্ধু মিত্র। মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত শেষে প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমোক্ত এবং শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে ও সুপরিচিত। আর কত দেখাইব? বাঙ্গালার নাট্যশালার প্রতি দৃষ্টি করুন সর্ব্ব প্রথম প্রধান অভিনেতা কিশোরী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি গিরীশ চন্দ্র ঘোষ এবং অমৃতলাল বসু। আমাদের ধারণা দেশে কুলীন অপেক্ষা অকুলীনের সংখ্যা অল্প নহে তথাপি প্রত্যেক বিভাগেই কুলীনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিলে কি প্রতিপন্ন হয়? নিশ্চয়ই এই শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের উচ্চ রক্তের পরিচায়ক। প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পুরাতন পঞ্জিকায় দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম ইহাতে প্রেম চান্দ রায়চান্দ বৃত্তির সৃষ্টির পর হইতে বার বৎসরের বিবরণ নিবদ্ধ আছে দেখিলাম ঐ বার বৎসরের মধ্যে ৮ বৎসরই বৃত্তিটি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থের হস্তগত হইয়াছে ইহারা সকলেই কুলীন, নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উপরেই বলিয়াছি আমাদের প্রদত্ত তালিকায় আরও অনেক নাম সংযোগ করা যাইতে পারে। শোভাবাজারের আনন্দকৃষ্ণ বসু। বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্র। ডাক্তার ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র। রাধিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ)। প্রভৃতি অনেক নামই আমরা তালিকা ভুক্ত করি নাই; তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, রামগতি বন্দ্যো-

গাথায় [ন্যায় রত্ন] এমন কত নামই রহিয়া গিয়াছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত বৈদ্যদের কুলীন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিনাই। বৈদ্য সমাজের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক আছে। আর তাহাদের কৌলীন্য সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। তবে ব্রাহ্মণের বা কায়েস্থের কুলীন সম্বন্ধে আমরা সাধারণ ভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা বৈদ্য সমাজের প্রতিও প্রযুজ্য তাঁহাদের মধ্যেও অনেক কুলীনই অকুলীন মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত। আমরা শুনিয়াছি কয়েক বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের কোন সহরে একজন উচ্চপদস্থ বৈদ্যরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন। একজন সামান্য বেতনের কুলীন সন্তানের সমুচিত আদরের সহিত নিমন্ত্রণ হয় বলিয়া তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসম্মত হন। ইহাতে অন্য কোন বৈদ্যই আহার করিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কুলীনের মর্য্যাদা কম কেমন করিয়া বলিব? আমাদের বিশ্বাস কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, বিহারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি বৈদ্য সমাজের সর্ব্বজন পরিচিত বড় লোক সকলেই কুলীন।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত তুলনায় বৈদ্য সমাজ সংকীর্ণ। কলিকতা মিউনিসিপাল্ বিলের আন্দোলনের সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় ওলড্হাম মহোদয় বলিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বাঙ্গলায় যাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ?* গননীয়। সাহেব ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পদে বাঙ্গালার কায়স্থদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল ইহাদের নাম করিয়া তিনি কহিয়াছিলেন অন্য জাতিতে যে দুই একটী বড় লোক দেখিতে

* The Brahmins and the lesser Brahmins.

পাই তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেও এই সাধারণ উক্তিরই সমর্থন করে।

সাহেবের মুর্ত্তি ধরিয়া আমরাও বলি যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের মধ্যে অকুলীন কেহই বড় লোক হন নাই এমন নহে তবে তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প সুতরাং ইহাতে আমাদের উক্তিই সমর্থিত হয়। আর ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা যে ইহারা নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম নহেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে যে সমস্ত শ্রোত্রিয় বা মৌলিক সন্তান বড় লোক হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই উচ্চ কুলীনের সহিত সংশ্রব আছে। ইঁহারা প্রায়ই স্ব স্ব শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কুলীনের দৌহিত্র।

ফলতঃ কুলীনগণের বংশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণ ইহাদের সকল বংশেই বিদ্যমান ছিল এবং আমাদের বিশ্বাস এখনও আছে। মধ্যে কিছুদিনের জন্য যে কুলীনেরা অধিকাংশই মূর্খ হইয়াছিলেন, শ্রোত্রিয় মৌলিকের উপর যেন কিঞ্চিৎ অত্যাচারই করিতেছিলেন সে কেবল শেষোক্ত শ্রেণীর নিকট অত্যধিক আদর ও সম্মান পাইয়া ছিলেন বলিয়া। এখন সে ভাব চলিয়া গিয়াছে। কুলীনেরা আবার আপনাদের পূর্ব্ব গুণের বিকাশ দেখাইয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে কুলীনের নাম করিলেই মুর্খতা, নিশ্চেষ্টতা নিষ্ঠুরতা বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার একটা চিত্র মনে আসিত এখন আর সে অবস্থা নাই কুলীনেরাই তাঁহাদের নিজের দোষ নিজে উদ্‌ঘাটন ও নিজেরাই তাহা পরিহার করিয়াছেন। নদিয়ার চান্দের চিত্র এক কুলীন সন্তান কর্ত্তৃকই অঙ্কিত। সমাজে এমন চিত্র আর আমরা দেখিতে পাইব না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা বিক্রমপুরের বৃদ্ধ সমাজ সংস্কারক স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ইহার

বদন তখন দর্শন হীন। ব্রাহ্মণ এই অবস্থায় স্বরচিত দুই চারিটী গীত গাইয়া কৌলীন্যের কুপ্রথা মূলক যে এক একটী ভীষণ চিত্র আমাদের মানসপটে অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষণেকের নিমিত্ত সর্ব্বশরীরের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল অথচ স্বয়ং রাসবিহারী চতুর্দ্দশটী ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ নিজের কার্য্যে নিজে এতই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন যে আত্মগ্লানি ব্যক্ত করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু কোঠর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত। নিজে কুলীন বলিয়াই রাসবিহারী কৌলীন্যমূলক সামাজিক সমুদয় ব্যাধি সহজে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সামান্য বিস্ফোটকেও তিনি তাঁহার বিদ্রূপাস্ত্র প্রয়োগ করিতে ছাড়েন নাই। রাসবিহারী অতিশয় বিনয়ের সহিত আপনাকে বিদ্যাসাগরের সহকারী বলিয়া পরিচয় দিতেন। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহতী চেষ্টায় ন্যায় অন্যান্য অনেক কুলীন সন্তানের সমবেত চেষ্টাতেই কৌলীন্যমূলক কুপ্রথা সকল দেশ হইতে এত-শীঘ্র উঠিয়া গিয়াছে।

এখন আর বহু বিবাহ কোথায়? বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক হইলেও পাঠক হয় ত অনুমান করিয়াছেন যে তিনি কুলীন নহেন। তাঁহার মাতামহ একজন বড় কুলীন ছিলেন। এই কুলীন রাজের পরিচীতা ভার্য্যার সংখ্যা চতুর্দ্দশটী ছিল। লেখকের মাতুল পাঁচটী বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতুল পুত্রেরা সকলেই একপত্নীকা অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে বঙ্গের অনেক কুলীন পরিবারেই এখন বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ অবনতি বা উন্নতি হইয়াছে। অথচ বহু বিবাহের সপক্ষেও সময়ে সময়ে দু একজনে দু একটি কথা বলিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সিবিলিয়ান এক দিন প্রবন্ধ লেখককে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন "আপনার স্ত্রী কয়টি?

লেখক হাসিয়া "কেন, একটি" বলিয়া উত্তর করায় সাহেব কহিলেন তবে নিশ্চয়ই আপনি কুলীন নহেন। লেখক বুঝাইয়া দিলেন এখন কুলীনের মধ্যেও বহুবিবাহ নাই। সাহেব কহিলেন বহুবিবাহ যে কেবলই দোষের তাহা বলা যায় না। ইয়োরোপে এক পত্নী বিদ্যমান থাকিতে কেহই পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া তথায় অনেক দেশে অর্দ্ধেকের অধিক নারী চিরজীবন অবিবাহিত থাকে। যাহা হউক আমরা সাহেবের দোহাই দিয়া বহুবিবাহের সমর্থন করিতেছি না। তবে অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিন্য সমাজে যে পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে তাহা যেন সাবেক কৌলিন্যের অনেক কুপ্রথাকেও পরাস্ত করিয়াছে। বিবাহবিভ্রাট রচয়িতা বাবু অমৃতলাল বসু একদিন আমাদের সমক্ষে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন মহাশয়, প্রহসন লিখিব কি? যাহা লিখি সমাজ যেন তাহাও ছাড়াইয়া যায়। সুতরাং প্রহসনের প্রহসনত্ব আর থাকে না। "যাহা হউক এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না ঈশ্বরেচ্ছায় অমৃতলাল আর কিছু কাল বাঁচিয়া গেলে হয় ত তাঁহাকে বিবাহবিভ্রাটের বরপক্ষের বৈবাহিকের রং বদ্‌লাইয়া আরও কিছু গাঢ় করিতে হইবে।

আমাদের কথা এই যে এখন আর কুলীনকে আক্রমণ করিবার সময় নাই। প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি যে কৌলিন্য বাঁধের উপর যে সমস্ত আল্‌গা মাটি আসিয়া পড়িয়া ইহাকে কুৎসিৎ ও বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা প্রায়ই খসিয়া গিয়াছে। অধুনা কৌলিন্য যে ভাবে রহিয়াছে ইহা যে শীঘ্র উঠিয়া যাইবে এমন বোধ হয় না। উঠিয়া গেলেও যে সমাজের বিশেষ মঙ্গল হইবে তাহা আমরা মনে করি না। তবে দুই এক স্থানে ঐরূপ আল্‌গা মাটি কিছু থাকিলে তাহা যত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কুলীনেরাই অগ্রগণ্য হইবেন সন্দেহ নাই।

যদি কৌলীন্য রহিল তবে কুলীনের মান একেবারে যাইবে কেন? কুলীনেরা এখন সেরূপ কৌলিক সম্মানের প্রত্যাশী বা তজ্জন্য লালায়িত নহেন। আজ কাল এমন কুলীন অতি অল্পই আছেন যাহারা শ্রোত্রিয় মৌলিকের নিকট সেই সাবেক সম্মানের দাবি করেন। দাবি ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই কিন্তু শ্রোত্রিয় মৌলিকের কর্ত্তব্য যে তাহারা কুলীনের পূর্ব্ব সম্মান স্মরণ রাখেন আর তাহাদের বংশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে কখন কুণ্ঠিতও নহেন। কুলীনের কথা উঠিলেই যেন একটা অবজ্ঞার ভাব, সমস্ত কুলীনোচিত গুণের অভাব মনে আসিয়া না পড়ে। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি এখনকার কুলীন আর সেই মধ্য সময়ের অবজ্ঞার পাত্র নহেন। শ্রোত্রিয় মৌলিকের পূজা পাইয়াছিলেন বলিয়াই মধ্যে কিছু দিন তাহাদের বংশের গুণ প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র। যে দিন হইতে সে পূজার লোপ হইয়াছে সেই দিন হইতেই কুলীনেরা কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অবতীর্ণ হইয়া দেখিয়াছেন যে প্রতিভা ও অধ্যবসায়ে পরোপকার ও স্বদেশ সেবায় সাহিত্য চর্চ্চায় বা বিজ্ঞান অনুশীলনে সমাজ সংস্কারে বা ধর্ম্মালোচনায় তাঁহারা দেশের শীর্ষ স্থানীয় সুতরাং তাহাদিগকে সম্মান করিলে ক্ষতি নাই বরং না করিলে প্রত্যবায় আছে ইহাই আমাদের ধারণা।

উপরের তালিকায় আমরা যে সমস্ত মহাপুরুষের বা বড় লোকের নাম করিয়াছি তাঁহাদের পরিচয় কিছুই দিই নাই কেন না আমাদের বিশ্বাস যে তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত; আর তাঁহাদের মধ্যে পাঠকের অপরিচিত কেহই নাই। আমরা তাহাদের নামের পার্শ্বে যে একটি ক্ষুদ্র বিশেষণ সংযোগ করিয়াছি তাহাতে অনেকের গুণগ্রামের শতাংশের একাংশও সূচিত হয় নাই। বলা বাহুল্য ইহাদের কেহই কেবল পৈত্রিক

সম্পত্তি পাইয়া বড় লোক নহেন, প্রত্যুত সকলেই মেধা মস্তিষ্ক ও শ্রমশীলতার বলে সুনাম খ্যাত হইয়াছেন। এক একজন হৃদয়ের কোমল গুণের ও দানশীলতার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা অপরিসীম প্রংশসার বিষয় বটে। হয় ত ইহাদের কাহারও কাহারও পিতা পিতামহই আলস্য ও হৃদয় হীনতার জন্য এক সময়ে সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন। রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিলে এত শীঘ্র একই বংশে এমন পরিবর্ত্তন হয় কি? তাই বলিয়াছি এ শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে সম্মান করিব না কেন? ইহা বলিতেই প্রবন্ধের অবতারণা। এখন আর সম্মান করিবার নিমিত্ত রজৎখণ্ড বা বস্ত্রখণ্ড দক্ষিণা দিবার প্রয়োজন নাই। কুলীনের বংশ বস্তুতই শ্রেষ্ঠ অন্য বিষয়ে সমান অবস্থাপন্ন মৌলিক অপেক্ষা কুলীনের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ শ্লাঘ্য এইরূপ ভাব সমাজে পুন-প্রবিষ্ট হইলেই কুলীনকে সম্মান করা হইবে। আমাদের বিশ্বাস ইতি মধ্যেই সমাজে কুলীনের মান কিয়ৎ পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেশের কোন কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ আপনাদের দ্ব্যর্থক উপাধি পরিত্যাগ করিয়া কুলীন পদবী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বংশের পূর্ব্ব নাম পুনগ্রহণ করিতেছেন মাত্র। এ আগ্রহ কুলীনের মনের অনুকুলে সন্দেহ নাই।

বলা কর্ত্তব্য আমরা উপরে যে তালিকা দিয়াছি তাহাতে কুলীন এবং ভঙ্গকুলীন দুই আছেন। ভঙ্গকুলীনেরাও কুলীন বংশের সন্তান বটেন। রক্ত একই। বঙ্গে কায়স্থ ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভঙ্গকুলীন ও কুলহীনদিগের পৃথক পৃথক নাম আছে। যাহাদের কুলভঙ্গ হইয়াছে তাহারা কোন স্থলে বংশজ কোন স্থলে কাক্ কোথায় ও কুলজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কুলহীনদিগের আখ্যা কেবল দুইটি শ্রোত্রিয় অথবা

মৌলিক। আমাদের এই নামাবলি সম্পূর্ণ না হইতে পারে। কেন না আমরা বঙ্গের সকল স্থানের সংবাদ রাখিনা। এই কৈফিয়ত আরও পূর্ব্বে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু প্রবন্ধটি বড়ই ক্ষিপ্রহস্তে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সিঁতি ব্রাহ্ম সমাজ পুনর্ব্বার দর্শন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি উপদেশ ও তাঁহা-দের সহিত আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(সমাধি মন্দিরে।)

আবার ব্রাহ্মভক্তেরা সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন। ৺কালীপূজার পর দিন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ইংরাজি ১৯শে অক্টোবর ১৮৮৪ সাল। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটিতে আবার ব্রাহ্ম-সমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া

গিয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা চারিটা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া পহুছিলেন। তাঁহার গাড়ী আসিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত আসিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন। প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছিল। তাহারই সম্মুখে দালান। সেই দালানে পমরহংস দেব উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল্ ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদরওয়ালা (Sub-Judge)ও ছিলেন। সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। কোথাও নানাবর্ণের পতাকা, মধ্যে মধ্যে হর্ম্মোপরি বা বাতায়ন পথে নয়নরঞ্জন, সুন্দর পাদপ-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লবরাশি। সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছ সলিল, মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছিল। উদ্যানস্থিত রাঙ্গা রাঙ্গা পথ গুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ফল পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী আজ রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাইবেন যে ধ্বনি আর্য্য ঋষিদের মুখ হইতে বেদাকারে এক-কালে বহির্গত হইয়াছিল যে ধ্বনি আর একবার নররূপধারী পরম সন্ন্যাসী, ব্রহ্মগত প্রাণ, জীবের দুঃখে কাতর, ভক্তবৎসল, ভক্তা-বতার, ভগবৎপ্রেম বিহ্বল (Jesus) এর মুখ হইতে তাহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরক্ষর মৎস্যজীবিগণ শুনিয়াছিলেন যে ধ্বনি পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবৎ গীতাকারে এক কালে বহির্গত হইয়াছিল—যে মেঘ গম্ভীর ধ্বনির মধ্যে বিনয় নম্র ব্যাকুলতাপূর্ণ 'গুড়াবেশে কৌন্তেয়' শিষ্যের ভাবে সমর-ক্ষেত্রে সারথী বেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দ গুরু প্রমুখাৎ এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন।

"কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং
অনোরনীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারং অচিন্ত্যরূপং
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥১॥

প্রয়াণ-কালে মনসাচলেন
ভক্ত্যাযুক্তো যোগ বলেন চৈব
ভ্রুবোম'ধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
সতং পরং পুরুষং উপৈতি দিব্যম্ ॥

"যদক্ষরং ব্রহ্মবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগা
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তেপদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥৩॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়াই সমাজের সুন্দর রচিত বেদীপানে দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই ভক্তি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র, এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। আদালত গৃহ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ্ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরি কথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপনা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল গান গাহিতে ছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণ কহিলেন "হ্যাঁগা, ঐ গানটী তোমার বেশ, 'দেমা পাগল করে'. ঐটী গাওনা।" তিনি গাইলেন ;—

'আমায় দেমা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)
আর কাজনাই জ্ঞান বিচারে ॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা
ওমা ভক্তচিত্ত হরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।

তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে ;
ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় মা কবে হব মা ধন্য, ওমা মিশে তার ভিতরে ॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমান চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝ্তে পারে—
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমনি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে ॥"

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে সমাধিস্থ—

'উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বাতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনি আপনে'।

কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে। দেহমাত্র চিত্ত পুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান। এক দিন ভগবান পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতান্তরাত্মা পাণ্ডবগণ কাঁদিয়া ছিলেন। তখন আর্য্য-কুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকালে ভগবানের ধ্যাননিরত ছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহজেই কাঁদিবার দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধি-প্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মভক্তদের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব প্রথমে খুব ঘনীভূত, যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন বোধ হইল। ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল, অবশেষে পূর্ব্বের ঠিক সহজাবস্থা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মসমাজ।

("আমি সিদ্ধি খাব।")

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) মা! আমি কারণানন্দ চাই না। আমি সিদ্ধি খাব।

গীতা ও অষ্টসিদ্ধি।

"সিদ্ধি কিনা বস্তু লাভ। অষ্ট সিদ্ধি'র সিদ্ধি নয়। সে অনিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, 'ভাই, যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধি একটী সিদ্ধি কাহারও আছে, তাহ'লে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না'। কেন না সিদ্ধাই থাক্‌লেই অহংকার থাকবে, আর অহংকারের লেশ থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

ঈশ্বর লাভ কি?

"আর এক আছে প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে প্রবর্ত্তকের থাক্। যে সব লোক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। যে ব্যক্তি সাধক, সে আরও এগিয়ে গেছে। লোক দেখান ভাব কমে গিয়াছে। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক ভাবে তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে? যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়েছে যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব করছেন, যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন। 'সিদ্ধের সিদ্ধ'কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। শুধু দর্শন নয়, কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্য ভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুর ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে। 'কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস একরকম, আর কাঠ থেকে আগুন বার করে ভাত রেঁধে, খেয়ে, শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করা আর এক জিনিষ।

"ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া, তারা বাড়া, আছে।

ব্রাহ্মসমাজ ও নিরাকার বাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী, তা বেশ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে, নয় নিরাকারে। দৃঢ় হলে তবে ঈশ্বরলাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকার বাদীও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকার বাদীও ঈশ্বর লাভ করবে। মিছরির রুটী সিদে করে খাও আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে। (সকলের হাস্য)।

বিষয়ীর ঈশ্বর, ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ।

"কিন্তু দৃঢ় হইতে হইবে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক্‌তে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য। আর যেমন কোন ফিট্ বাবু পান চিবুতে চিবুতে হাতে ষ্টিক্ (stick) করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটী ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, ঈশ্বর কি Beautiful ফুল করেচেন। কিন্তু এই বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক; যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

তাই বল্‌ছি, একটার উপর দৃঢ় হতে হবে। ডুব দাও, ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতরের রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাস্‌লে পাওয়া যায় না। এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান সেই মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগিলেন। সকলের বোধ হইল, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।

গীত।

"ডুবু ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে সদা অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চ'লায় আবার সে
কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডুবদাও। ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? হে ঈশ্বর তুমি আকাশ করিয়াছ, বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক, নক্ষত্রলোক সব করেছ; এসব কথা আমাদের কাজ কি?

"সবলোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি; এই সব দেখেই অবাক্। কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে কজন? বাবুকে খোঁজে দুই এক জনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজ্‌লে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্চি। সত্যি বল্‌ছি। একথা কারেই বা বল্‌ছি, কেবা বিশ্বাস করে?

শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ (Revelation)?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র

পড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দিবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সব সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পাবে না। "শাস্ত্র বই, শুধু ও সব তাতে কি হবে! তাঁর কৃপা না হলে কিছু হবে না। যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তাঁর চেষ্টা ক'রো। তবে কৃপা হলে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য; ঈশ্বরের 'বৈষম্য দোষ'।

সদরওয়ালা। মহাশয়, তাঁর কৃপা কি এক জনের উপর বেশী আর একজনের উপর কম? তাহলে যে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয়।

শ্রীরাম কৃষ্ণ। সেকি! ঘোড়াটা ওটা আর সরাটা ওটা! তুমি যা বলছো, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা বলে ছিল। বলেছিল মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়াছেন, কারুকে কম শক্তি দিয়াছেন?

আমি বল্লাম; বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন আমার ভিতরও যেমনি, পীপড়েটির ভিতরও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখতে এসেছি! তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার এত নাম! দেখ না এমন লোক আছে যে, সে একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে, একজনার ভয়ে পলায়।

"যদি শক্তি বিশেষ না হয়, তা হলে লোকে কেশব সেনকে তত মানতো কেন?

"গীতায় আছে যাকে অনেকে গণে মানে তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক বা Lecture দেবার জন্যই বা আর কিছুর জন্যই হউক নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

একজন ব্রাহ্মভক্ত। (সদরওয়ালার প্রতি) মহাশয়, ইনি যা বলছেন, মেনে নেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ব্রাহ্মভক্তের প্রতি) তুমি কি রকম লোক! কথায় বিশ্বাস না করে শুধু মেনে লওয়া যে কপটতা। তুমি ঢং, তুমি কাচ দেখছি।

ব্রাহ্মভক্তটি অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মসমাজ, কেশব সেন ও নির্লিপ্ত সংসার; সংসার ত্যাগ।

সদরওয়ালা। মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমাদের ত্যাগ কেন করতে হবে? সংসারে থেকেই হতে পারে। তবে আগে দিনকতক নির্জ্জনে থাকতে হয়। নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়। এমন একটি বাড়ীর কাছে আড্ডা করতে হয়, যেখানে থেকে বাড়ীতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব বলেছিলো, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বল্লুম, জনকরাজা অমনি মুখে বল্লেই হওয়া যায় না। জনকরাজা হেটমুণ্ড হয়ে আগে নির্জ্জনে কত তপস্যা করেছিল। তোমরা কিছু কর, তবে ত জনকরাজা হবে। অমুক খুব তর্ তর্ করে ইংরাজি লিখতে পারে, তাকি একেবারেই লিখতে পেরেছিলো? সে গরিবের ছেলে, আগে একজনের বাড়ীতে থেকে তাদের রেঁধে দিতো; আর দুটি দুটি খেতো, অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছিলো, তাই এখন তর্ তর্ করে লিখতে পারে।

"কেশব সেনকে আরও বলেছিলুম, নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ সারবে কেমন করে? রোগটি হয়েছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার তেঁতুল এই দেখ, বলতে বলতে আমার মুখে জল এসেছে, (সকলের হাস্য)। সম্মুখে থাকলে কি হয়, সকলেই তো জান। মেয়ে মানুষ, পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল, মনে করলে জল সরে, কাছে যেতে হয় না। আবার ভোগ বাসনা জলের জালা। বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই, আর সেই বিষয় রোগীর ঘরে। এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁই নাড়া হয়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ করে সংসারে এসে থাকলে আর কামিনী কাঞ্চনে কিছু করতে পারে না। তখন জনকের মতন নির্লিপ্ত হতে পারবে।

"কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জ্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে, চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার হয় না, তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছুই করতে পারে না। যদি নির্জ্জনে সাধন করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে, বল বাড়িয়ে বাড়ী গিয়া সংসার কর, তাহলে কামিনী কাঞ্চনে তোমার কিছু করতে পারবে না।

"নির্জ্জনে দৈ পেতে মাখন তুলতে হয়। জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন যদি একবার মনরূপ দুধথেকে তোলা হয়, তা হলে সংসার রূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসার রূপ জলের উপর রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে পারবে না।

"ঈশ্বর লাভের পর সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তাঁর সেবা করবে।"

সদরওয়াল্লা। (আনন্দিত হইয়া) মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা! নির্জ্জনে সাধন চাই বই কি? কিন্তু ঐটি আমরা ভুলে যাই। মনে করি, বুঝি একেবারে জনক হয়ে পড়েছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের ও সকলের হাস্য)। সংসার ত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমার শান্তি ও আনন্দ হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতে হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। খিদে তৃষ্ণা এসবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে। এ যুদ্ধ সংসারে থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয় ত খেতেই পেলে না, তখন ঈশ্বর টীশ্বর সব ঘুরে যাবে।

"একজন তার মাগ্‌কে ব'লছিল, আমি সংসার ত্যাগ করে চল্লুম। মাগ্‌টি একটু জ্ঞানী ছিল। সে তাকে বল্লে, কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, তা হলে এক ঘরই ভাল।

"তোমরা ত্যাগ কেন করবে! বাড়ীতে আরও বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাবতে হবে না। রমণ স্ব দারায় তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করার লোক কাছে পাবে।

জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ এরা জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। এরা দুখান তরবার ঘুরাতেন, একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্ম্মের।

আগ্রায়।

ভরতপুর হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আগ্রায় পহুছি। আগ্রায় আসিয়া কোথায় থাকিতে হইবে পূর্ব্বে তাহার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। চিন্তাকুল মনে ষ্টেশনে অবতরণ ও অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আগ্রায় বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত একটী কালীবাড়ী আছে; সেখানে বাঙ্গালী ভ্রমণকারীদের অবারিত দ্বার। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া যাইয়া কালী মায়ের পাদপদ্মে শরণ লইলাম। আশ্রয় পাইবার পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম একটু আশ্রয় পাইলেই যথেষ্ট। কিন্তু "মানুষ যত পায় তত চায়" আশ্রয় পাইয়া বাসনানল ক্রমশঃ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। দুদিনের উপবাসী, দোকানী ভায়ার সজল তরকারী ও ডালরুটী ব্যতীত এ দুদিন পোড়া অদৃষ্টে আর কিছুই ঘটিয়া উঠে নাই। দেখিতে দেখিতে সে বাসনাও সফল হইতে চলিল। বৃদ্ধ সেবাইত মহাশয়ের অশেষ করুণায় ভেতো বাঙ্গালীর অমল-ধবল-সরস-কোমল অন্নরাশি স্বীয় সাথী সঙ্গতি পরিবেষ্টিত হইয়া আমার সংবর্দ্ধনার জন্য সশরীরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। আমি আহ্বানের প্রতীক্ষা না করিয়াই এক রকম উঠিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম এমন সময়ে পাচক ঠাকুরের মধুর সম্ভাষণটী আমার মনপ্রাণ শীতল করিয়াদিল। উঠিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। ভোজন ক্রিয়াটা খুব তৃপ্তির সহিতই সম্পাদিত হইল। এখন শয়নের বন্দোবস্ত—সেও অতি পরিপাটী রকমেই হইল। একা, এক প্রকোষ্ঠে, শয়ন মাত্রেই নিদ্রাদেবী আপন শান্তিময়

ক্রোড়ে স্থান দানে অবসন্ন প্রাণের সকল অবসাদ ঘুচাইয়া দিলেন।

আগ্রা বাদসাহী সহর—যমুনার পশ্চিম পারে অবস্থিত, ইহার প্রাচীন নাম অগ্রবন। ১৫৫৬ খৃঃ মোগল কুলতিলক আকবর সাহ এই নগরী নির্ম্মান করিয়া ইহাতে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। আকবর সাহের পূর্ব্বে লোদী রাজ বংশের রাজধানী এই আগ্রাতেই ছিল। তাহা যমুনার পূর্ব্ব পারে অবস্থিত। ১৫২৬ খৃঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি পরাজিত হইলে মোগল গৌরব বাবর এই স্থানেই আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিন গুলিও সেই স্থানেই কর্ত্তন করিয়া যান। বাবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র হুমায়ুন কর্ত্তৃক মোগল রাজধানী দিল্লীতে নীত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আকবর পুনরায় তাহা আগ্রায় আনয়ন করেন ও ইহার আকবরাবাদ নাম করণে পরিচিত করিতে চেষ্টা করেন। এর পর প্রায় শতাধিক বৎসর কাল এখানে মোগল রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকে।* এই নগরীর তৎকালক শোভা সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া ভ্রমনকারী ফিচ ইহাকে শ্বেতদ্বীপের রাজধানী লণ্ডন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই লোক বিশ্রুত তাজমহল দেখিতে চলিলাম। আগ্রার দক্ষিণ ভাগে যমুনার বাঁকে তাজমহল অবস্থিত। যমুনার উত্তাল তরঙ্গ মালা তাজমহলের পাদ প্রক্ষালন করিয়া চলিয়াছে। দূর হইতে দেখিতে বড়ই মনোহর। তাজমহলের নামানুসারে সেই স্থানের নাম তাজগঞ্জ রাখা হইয়াছে। আগ্রা হইতে তাজগঞ্জ প্রায় দেড় ক্রোশ পথ ব্যবধান!

* ইতিমধ্যে আকবর ফতেপুরে ও লাহোরে কতক কালের জন্য রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

আমি গাড়ীর অপেক্ষা না করিয়া পদব্রজেই তাজে আসিয়া পঁহুছিলাম। তাজ দেখিব বলিয়া মনে যে একটা কি অসীম ভাবের মৌন মহিমা জাগরণ করিতেছিল গেইট পার হইতে না হইতেই যেন সেই মৌনভার উদ্বেলিত হইয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ঐ সম্মুখবর্ত্তী নয়ন মনোভিরাম তাজ,—তাহাই অগ্রে দেখিতে যাইব, না তার গেইট গুলিই অগ্রে দেখিয়া যাইব? পথিপার্শ্বস্থ সলিল পূর্ণ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত প্রস্রবণবৎ জল দ্রোনী গুলিই দেখিব? না, উদ্যানের মনোহর পুষ্প-পত্র শোভিত লতামণ্ডপগুলির প্রতিই চাহিয়া থাকিব? বাস্তবিক তাজমহলের ন্যায় তাহার প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক দৃশ্যই আমাদিগের নয়ন ও মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাজমহল দেখিবার পূর্ব্বে যখন তাহার গেইটগুলি দেখিয়াছিলাম—যখন তাজমহলের অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি নয়নের—মনের—কল্পনারও অতীত ছিল—তখন যদি এই গেইটটিকেই "গাইড্" মহাশয় তাজমহল বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা মনে স্থান দিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতাম না। যাহা হউক, অশেষ প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া তাজমহলে পঁহুছিলাম।

ভুবন বিখ্যাত তাজমহল সম্রাট সাহাজাহানের গভীরপত্নী-প্রেমের মহান নিদর্শন। জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যসিন্ধু বিলোড়ন করিয়া পত্নীবিয়োগবিধুর সাজহান তাহার প্রিয়তমা প্রনয়িণী নবাব আর্জমন্দবানু বেগম ওরফে মমতাজ বিবির * স্মরণার্থ এই জগৎ বিশ্রুত অতুল কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে পতি সোহাগিণী তাজ বিবির ৮ম মাস গর্ভকালে

* ইতিহাসে তাজবেগমের ৭টি নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) তাজমহল (২) মমতাজমহল (৩) তাজ বিবি (৪) নবাব আলিয়া বেগম (৫) নবাব আজ মন্দবানু বেগম (৬) জেহানর (৭) দ্বিতীয় নূরজাহান।

তাঁহার গর্ভকোষ হইতেই গর্ভস্থ সন্তানের রোদনধ্বনি শ্রুত হওয়া গিয়াছিল; ইহাতে তিনি জীবনাশায় নিরাশ হইয়া প্রিয়তম স্বামীর নিকটে অন্যান্য প্রার্থনার সহিত এই একটী প্রার্থনা করেন, যে, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার গোরের উপর যেন এমন একটী কীর্ত্তি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয় যাহাতে তাঁহার নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। সন্তান প্রসব হইবার কিছু দিন পরেই তাজবিবির মৃত্যু হয়। সাহাজাহানও সেই বৎসরেই এই বিরাট যজ্ঞের অবতারনা করেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে তাজের নির্ম্মান কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপী অবিশ্রান্ত শ্রম, বিরাট উদ্যোগ অগণণ অর্থ ব্যয়ে ইহার আংশিক নির্ম্মান কার্য্য শেষ হয়। তাজ-মহলের নির্ম্মান বিষয়ে অনেকের অনেক মতভেদ। কেহ কেহ বলেন ইহা প্রাচীন ইয়ুরোপীয় শিল্পের অনুকরণ ও ইয়ুরোপীয় শিল্পীর শিল্প কৌশল। আবার কেহ কেহ দেশীয় গৌরব বজায় রাখিতে, দেশীয় শিল্পের দোহাই দিয়া থাকেন। ফলতঃ, মূলে দেশীয় ইয়ুরোপীয় উভয় শিল্পিগণই যে সমভাবে ইহার কার্য্য ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। অষ্টিন নামক ফরাসি শিল্পকর তাজমহলের প্রধান শিল্পী।* সেরাজ নিবাসী আমারনুদ বা অমণ্ট খাঁ ২য় শিল্পী। উভয়েই সহস্র মুদ্রা করিয়া মাসিক বেতন পাইতেন। ৩য় শিল্পী লাহোরের মোহন লাল পাইতেন ৯৮০৲; বোগ্‌দাদের মহম্মদ খাঁ পাইতেন ৯০০৲, মহম্মদ জন্নফা, মহম্মদ শরিফ ও মোহনলাল পাইতেন ৫০০৲ করিয়া। লাহোরের মনোহরলাল ও ইসমেল খাঁ (গম্বুজ নির্ম্মান কর্ত্তা) ও পাইতেন ৫০০৲ করিয়া। লাহোরের খতম খাঁ

* কেহ কেহ ইসামহম্মদের নাম প্রধান চিত্রকর স্থানে যোজনা করিয়াছেন কেহবা রোমের কোন অজ্ঞাত নামা খৃষ্টানকে ও প্রধান শিল্পি বলিয়া মনে করেন।

পাইতেন ২০০৲ করিয়া। এই ১০ জন প্রধান স্থপতির অধীনে আরও বিংশতি সহস্র শ্রমজীবি ব্যাপৃত থাকিয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহার পূর্ণাহুতিতে ৪ কোটী টাকারও অধিক ব্যয়িত হইয়াছিল।

ভারতেশ্বরী মমতাজের মৃত্যুর পর সাহজানের মনের এক ঘোর পরিবর্ত্তণ সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি প্রতি ক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে যেন প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমবিজড়িত মাধুরীময় বাণী প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেন, "আমার উপর এমন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হউক যেন ইতিহাস চিরদিন আমার নাম বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হয়।" তাই প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি তাজমহলের গুণগরিমা বৃদ্ধির চিন্তা করিতেন। অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতেন। এইরূপে পৃথিবীর যে স্থানে যত উৎকৃষ্ট বস্তু তৎকালে উৎপন্ন হইত, সাজাহান তন্ন তন্ন করিয়া তাহা সংগ্রহ করতঃ এ বিশ্ববিমোহন মহা-সমাধিতে সংযোজিত করিয়াছিলেন।

অমরার অনন্ত সৌন্দর্য্য তিল তিল লইয়া তিলোত্তমা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য রাশি লইয়া সেইরূপ মর-জগতে তাজমহল।

কৌতুহলী পাঠকদিগের পরিতৃপ্তির জন্য আমরা এখানে তাজ-মহলে সংযোজিত মহামূল্য প্রস্তর রাশি ও মণিমাণিক্যাদির তালিকা প্রদান করিলাম।

প্রস্তরের নাম।	প্রাপ্তিস্থান।
১। লেজাভার্ড (Laja vard)	সিংহল ও তিব্বত।
২। তামরাসং (Tamrasang)	ভারতীয় পার্ব্বত্য প্রদেশ ও তৎ প্রবাহিত নদীসমূহ।
৩। হেলিওট্রোপ (Heliotrope)	ঐ

প্রস্তরের নাম।		প্রাপ্তিস্থান।
৪। কেলসেডনিক এগেট (Calcedonic Agate)		সোন, নর্ম্মদা, গোদাবরী, প্রভৃতি নদী ও কাম্বে।
৫। কেলসেডনি (Calcedony)		ঐ
৬। কারনেলিয়ন (Carnelion)		ঐ
৭। সারদি (Sarde)		ঐ
৮। প্লাজ্‌ম (Plasma)		দক্ষিণ প্রদেশ।
৯। ইয়লো এণ্ড ষ্ট্রীপ্‌ট মারবেল (Yellow & striped marble)		গুজরাট।
১০। ক্লেশ্লেট (Clay slate)		—
১১। নেফরিট (Nephrite)		—
১২। সেলিলাইম ষ্টোন (Shelly lime stone)		কমায়ুন।
১৩। হোয়াইট ষ্টোন (White stone)		জয়পুর।
১৪। ব্লাড ষ্টোন (Blood stone)		ফতেপুর সীকরি।*

প্রস্তরেরনাম		পরিমাণ
১। মার্ব্বল	(প্রতি ঘনগজে)	৪০ মণ
২। পোরসিলেন্	,,	৭৯ ,,

* বহু দিন হয় এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের "তাজমহল" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ "বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটীর শেষ দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলাম। কিন্তু তাহা আর হইল না। এর অনেক দিন পরে "নব্য ভারতে" তাহার শেষ অংশ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ হইতে আমরা এস্থলে তিনটী তালিকা প্রদান করিলাম। আমরা উপরে যে তালিকার উল্লেখ করিয়াছি তাহা পুরাতত্ত্ববিদ্ ভয়সের (Voysey) সংগ্রহ। ভয়সের সংগ্রহের সহিত যে সকল স্থলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনৈক্য দৃষ্ট হইল তাহাই কেবল উপরে উল্লেখ করিলাম। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংগ্রহ বাস্তবিকই কৌতূহলাবহ।

প্রস্তরের নাম।		পরিমাণ।
৩। ব্লাক্ ষ্টোন্		৪৮ ,,
৪। জ্যাস্‌পারওয়েগেট	,,	৯৫ ,,
৫। লাল পাথর	,,	৩০ ,,
৬। পীজহর	,,	৪৫ ,,
৭। ফ্লিণ্ট	,,	৫৭ ,,
৮। অদ্ভুত প্রস্তর	,,	৪২ ,,
৯। স্ফটিক	,,	৮ ,,
১০। সুঙ্‌খুটু	,,	৮৫ ,,
১১। লেপিস লুজলি	,,	৩১২ ,,
১২। সলোমন প্রস্তর	,,	২৪ ,,
১৩। ফ্রেক্‌ল্‌ড	,,	৪২ ,,
১৪। বালনী	,,	২৫ ,,
১৫। গোলাপী রং প্রস্তর	,,	৪৫ ,,

(২) জহরতের নাম।	পরিমাণ।
১। রুবি (Ruby)	৫৪ মণ
২। মরকত (Emerald)	৯৭ ,,
৩। গ্রীন্ ষ্টোন্ (Green stone)	১২৫ ,,
৪। নীলকান্ত মণি (Saphire)	১৪৫ ,,
৫। পরাফিরি (Prophyry)	১৭৪ ,,
৬। টর্‌কোইজ্ (Turquoise)	৮৫৭ ,,
৭। গোয়ালিওব মানিক (Indian diamond)	৯৪৫ ,,
৮। রিফল জেণ্ট ষ্টোন্ (Refulgent stone)	৭৫ ,,
৯। ল্যাণ্ড ষ্টোন্ (Land stone)	৭৭ ,,
১০। ঝুটা মানিক (False stone)	১৭৫ ,,

জহরের নাম।	পরমাণ।
১১। পিটোনি (Petone)	৪৯ ,,
১২। কাশ্মীর মার্ব্বল	(সংখ্যা নাই)

৩ এই বিরাট কীর্ত্তি রক্ষার জন্য কত দেশ হইতে কত মণি-মাণিক্য হীরা জহরত সংগৃহীত হইয়া আগ্রার রাজকোষের শোভা সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহার তালিকা :—

প্রস্তরের নাম	প্রাপ্তিস্থান	পরিমাণ
১। লাপিস্ লাজুলি	বগদাদ	৯১০ মণ
২। ঐ	আরব	২৪০ ,,
৩। টরকুইস	তির্ব্বত	৪৪০ ,,
৪। লেপিস্ লাজুলি	সিংহল এবং তির্ব্বত	২৮০ ,,
৫। প্রবাল	মহাসমুদ্র	১১০ ,,
৬। এগেট্ এবং ওনিক্স	ভারতের দক্ষিণাংশে	৫৪০ ,,
৭। পেরিসিলেন্	কানাড়া	অগন্য
৮। নসুনিয়া	নীলনদী	৯১৫ ,,
৯। ঝুটা পাথর	গঙ্গানদী	২৪৫ ,,
১০। সুবর্ণ প্রস্তর	পার্ব্বত্য প্রদেশ	৯৭০ ,,
১১। পী জহর	কুমায়ুন	১০১০ ,,
১২। গোয়ালিয়র প্রস্তর	গোয়ালিয়র	অগন্য
১৩। অলবষ্টার	মক্রানা	ঐ
১৪। দুর্লভ মণি	সুরাট	৫০১০ মণ
১৫। কৃষ্ণ মণি	জেহেরি	৮৪৫ ,,
১৬। ওপাল	জেহেরি	৪৫ ,,
১৭। লাল মণি	নানা স্থান	৪৫ ,,
১৮। এগেট	খমচ	৪৫ ,,
১৯। সঙন খুদ	—	২২৫ ,,

তাজমহলের এই সকল প্রস্তর বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিক ইহার ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা করিতে ও কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক তাহার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় ভারতবর্ষের পক্ষ গৌরবের বিষয়ই হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আমি জুতা ছাড়িয়া তাজমহলে উঠিলাম। এক মুসলমান "গাইড্", "গেইট্" হইতেই আমার পশ্চাদানুসরণ করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তিই আমাকে লইয়া তাজের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা প্রথমেই নিম্নতলস্থিত একটী অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। এই স্থানে প্রেমিক দম্পতি যুগল অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। একটী লণ্ঠনে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ক্ষীণ দীপালোকে দেখিলাম, সম্মুখেই সেই অনন্ত সৌভাগ্য শালিনী, পতি সোহাগিণী মমতাজমহলের নশ্বর জীবনের ভীষণ পরিণাম সূচক শ্বেত মর্ম্মরে মণি মাণিক্য খচিত মহা সমাধি। সমাধি সমক্ষে ভক্তি ভাবে মস্তক অবনত করিলাম। ইহার উত্তর পার্শ্বেই প্রিয়তম স্বামী ভারতেশ্বর সাজাহানের অনন্ত শয়ন—অনন্ত ভাল বাসার ও পত্নী প্রেমের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহাও অবনত মস্তকে স্পর্শ করিলাম। ইহার প্রায় অধিকাংশ লতা পাতা ফল ফুলাঙ্কিত প্রস্তরগুলি স্থানচ্যুত হইয়াছে।* সমাধি দেখিয়া পতি বিয়োগ বিধুরা রমনীকুলরত্ন আরথেমেসিয়ার (Artemesia) গভীর উক্তিটি মনে পড়িল

"There thou ! whose love and life to gether fled
Have left me here to love and live in vain—
Twined with my heart and can I deem thee dead,
When busy memory flashes on my brain ?

* শুনিয়া সুখী হইলাম আমাদের বর্ত্তমান সহৃদয় বড় লাট লর্ড কার্জ্জন মহোদয় ঐ সকল শূন্য স্থান পূরণ করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন।

Well—I will dream that we may meet again,
And woo the vision to my vacant breast;
If aught of young remembrance then remain,
Be as it may futurity's behest,
For me 'twere bliss enough to know thy spirit blest."

আমরা তথা হইতে উপরে আসিয়া গম্বুজের নীচের বড় হলে প্রবেশ করিলাম। সেস্থানের কারুকার্য্য অতি চমৎকার, চতুর্দ্দিকে নানা রংএর প্রস্তরে লতাপাতা ও ফলপুষ্প অঙ্কিত এবং শ্বেত প্রস্তরের উপরে নানারূপ কারুকার্য্য খচিত অনন্ত সৌন্দর্য্য সংস্থাপিত। প্রায় ৫০ হাত প্রশস্ত ও প্রায় ৬০ হাত পরিমাণ উচ্চ হইবে।

গম্বুজের নীচে দাঁড়াইয়া শব্দ করিলে বা গান গাইলে যেন শত সহস্র কণ্ঠে কোলাহল করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। তাজমহলের প্রতিধ্বনি শ্রবণও একটি আমোদ মন্দ নয়। তাজের আরও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে, এবং বৃহৎ গম্বুজটী ব্যাতীত আরও চারিটি ক্ষুদ্র গম্বুজ আছে। এ সকল গুলিই অনন্ত সৌন্দর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। বহির্দ্দেশে নীল পীত লোহিত প্রভৃতি প্রস্তর খোদিত অক্ষরে কোরাণের বয়েদ গুলি অতি পরিষ্কার ভাবে লিখিত রহিয়াছে। নীচে দাড়াইয়া ৬০ ফিট উচ্চে নিবদ্ধ অক্ষরগুলি যত বড় দেখায় সম্মুখের অক্ষরগুলিও ঠিক তত বড় দেখা যায়, একটু বড় ছোট বোধ হয় না। গম্বুজ চতুষ্টয়সহ সমাধিটির পরিমাণ ১৮৬ বর্গ ফিট।

যে চতুষ্কোন প্রশস্ত বেদীর উপরে সমাধি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত তাহা শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে মণ্ডিত। পরিমাণ ৩০০ বর্গ ফিট, উচ্চতায় ১৮ ফিট। আমরা যমুনা সলিলস্পর্শী একটি স্তম্ভে (monument) যাইয়া আরোহণ করিলাম। তাহাতে ১৩০টি সোপান। প্রায় ৮০।৯০ ফিট উচ্চ।

তাজের অভ্রভেদী শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া আমরা যমুনা সলিল সিক্ত

মোগল রাজধানী আগ্রার প্রণয় সৌন্দর্য্য ও তাজলহলের গৌরব শ্রী উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে উন্নত প্রাচীর বেষ্টিত মোগল দুর্গ,—সে শেখর পরিবৃত আগ্রা নগরী। নিম্নে নির্ম্মল সলিলা, "যুগযুগবাহী কলকণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া তাজমহলের অসীম গৌরব তুচ্ছ করিয়া সদর্পে চলিয়াছে। বড়ই সুন্দর দৃশ্য। যমুনা যেন বলিতেছে 'আর কত কাল?' 'যমুনা লহরীর' যশস্বী কবি আগ্রায় বিদ্যমান তাঁহার কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল তাঁহার অমৃতময়ী একটী, একবার উচ্চস্বরে সঙ্গীতটি আওড়াইলাম। মনে করিলাম যমুনা নিদয় জল বুদ্বুদেই হউক অথবা মহাকালরূপী অনন্ত কালের হস্তেই হউক একদিন এই গৌরব শ্রী ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবেই হইবে; কিন্তু প্রেমিক যুগলের অক্ষয় নাম ইতিহাস যুগযুগান্ত পর্য্যন্ত বক্ষে ধারণ করিবে, ইহা নিশ্চয়। তাজমহলের দৃশ্য পৃথিবী হইতে লুক্কায়িত হইলেও তাহার অসীম কীর্ত্তি অনন্ত কাল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে সুশোভিত থাকিয়া মোগল সম্রাটের অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও গভীর প্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন জগতে যুগযুগান্তর কালে ঘোষিত করিবে।

দুই সহস্র বৎসর গত হইল Arthemesia প্রিয়তম স্বামীর পদানুসরণ করিয়াছেন মৌসলেমের (Mousolem) বিরাট দেহ ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু এখনও পতিপ্রাণা রমণী Arthemesia র পতি প্রেম এই নশ্বর জগতে স্বর্ণাক্ষরে ঘোষিত হইতেছে, তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রণয় স্মৃতি পৃথিবীর আশ্চর্য্য সপ্তকের অন্যতম বলিয়া জগতে বিঘোষিত হইতেছে, এবং অনন্ত কাল ঘোষিত হইবে। ধন্য রমণীকুলরত্ন পতিপরায়ণা সতী আর্থেমিসিয়া তুমিই ধন্য; আর ধন্য সাজাহান তোমার পত্নী প্রেম। সৌভাগ্য শালী Mousalus মৌসেলস এমন পতি পরায়না রমনীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলে। আর সৌভাগ্য

শালিনী মমতাজ এমন পুরুষ রত্নকে তোমার শেষ জীবনের সহচর করিতে পারিয়াছিলে।

আমরা তাহা হইতে অবতরণ করিয়া তাহার দক্ষিণে অন্য একটী দ্বিতল গম্বুজ গৃহে প্রবেশ করিলাম। ইহার দুই পার্শ্বে দুটী ইন্দারা। যমুনা গর্ভ হইতে কূপের চারিধার বেষ্টন করিয়া সোপানাবলী উপরি উপরি উত্থিত হইয়াছে। সোপান সাহায্যে আমরা নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। পরিষ্কার পথ, চারি দিকের মুক্ত বাতায়নে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া কক্ষটী আলোকিত করিয়াছে। আমরা অনেক দূর নামিয়া ক্লান্তিবোধ করিয়া ফিরিয়া পড়িলাম। তাজমহলের চারিপার্শ্বে এরূপ চারিটী কূপ অবস্থিত। আমরা এগুলি দেখিয়া তাজমহল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে মনে করিলাম। কিন্তু কিছুতেই যেন মন তাহা করিতে রাজি হইল না। আবার চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। তুহিন শুভ্র মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তর খচিত ভিত্তিভূমির উপর অনেক ক্ষণ পদাচরণ করিলাম, করিয়া করিয়া ক্লান্তচরণে অবসন্ন প্রাণে আসিয়া অবতরণ করিলাম।

আমরা বেলা ৮টার সময় জুতা ছাড়িয়া তাজে উঠিয়াছিলাম; এখন বেলা ১॥টা। জুতার কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন আসিয়া সে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। জুতা নাই। "আহা জুতা!" "আহা জুতা! বলিয়া খেদ করিতেছি এমন সময় গাইড্ সাহেবজী আসিয়া ডাক হাঁকিলেন "নরঙ্গি হো।"* ডাক শুনিয়া শশব্যস্তে নরঙ্গি আসিয়া জুতা লইয়া হাজির হইলে

* যাত্রিগণ জুতা পরিত্যাগ করিয়া তাজে উঠিলেই এব্যক্তি তাহা লইয়া সাবধানে রাখিয়া দেয়। পুনরায় যখন যাত্রিগণ নামিয়া আসে তখন তাহা আনিয়া তাহার পায়ে পরাইয়া দেয়, এবং এইরূপে দর্শকগণের নিকট হইতে ২।১ পয়সা পাইয়া থাকে। এই উপায়ে এই ব্যক্তি গড়ে প্রতিরোজ ১ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। এ ব্যক্তির দৈনিক আয় হইতে তাজমহলের দৈনিক দর্শক সংখ্যার একটা অনুমান করা যাইতে পারে।

তাহাকে দুটা পয়সা দিয়া জুতার ভাবনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া পেটের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে উদ্যানটা সরাসরি রকমে একবার দেখিয়া লইলাম। তৎপর গাইডকে বিদায় দিয়া একখানা পিলানাচ সে একা করিয়া দগ্ধ উদরকে ঠাণ্ডা করিবারে তেলেবেগুণে জ্বালাইয়া মৃতপ্রায় আসিয়া কালিকাদেবীর শ্রীচরণে প্রণিপাত করিলাম। তারপর স্নান আহার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পুরাতন থিয়েটার দেখিতে চলিলাম। অভিনয়ের বিষয় "ম্যাক্‌ব্যাথ" দিবা বেলায়ই হইয়াছিল। ঊর্দ্দু অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী দর্শকের পক্ষে সে এ হাস্য রসের অভিনয়। তথাপি তাহা দেখিবার এবং জানিবার তাই রঙ্গালয়ের শান্তিভঙ্গ না করিয়া স্থিরচিত্তে বসিয়া দেখিলাম।

সে দিন শরীর বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সন্ধ্যার পর আহার করিয়া শয্যাশায়ী হইলাম।

ভারতেশ্বরীর ভারত রাজ্য।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারত রাজ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া ভারত লক্ষ্মী মুসলমান দিগের প্রতি অকৃপা করিয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামক বৃটিশ বণিক্ সম্প্রদায়ের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ পলাশী প্রাঙ্গণে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইব বঙ্গের শেষ নবাব অপরিণত বয়স্ক লোকাপ্রিয় সিরাজ-উদ্দৌলার সৈন্য দলকে সেনানী মির্জাফরের কৌশলে পরাস্ত বা নিরস্ত করিয়া মহাগৌরবে বৃটনের বিজয় পতাকা উত্থিত করিয়া বণিক বৃত্তির বিনিময়ে ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত ও রাজ শাসন প্রণালিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন। এক শতাব্দী পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত রাজ্যে ব্যবসায় ও শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমোন্নতি বিধানে অনেক স্থানে অনেক বিধ অনুষ্ঠান করিয়া দেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শতাব্দীর পর বিজেতা ও বিজিত গণের অদূর দর্শিতায় ও ভারতবর্ষের দুরদৃষ্ট বশতঃ দেশ ব্যাপী ভীষণ বিদ্রোহের তুমুল আন্দোলনে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী রাজ্য গ্রহণ প্রণালীর অবৈধ ও অযোগ্য ব্যবহারে, রাজ্য লিপ্সার অদমনীয় অভিলাষে যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফলেই বিদ্রোহানল প্রধূমিত হইতে থাকে। লর্ড ক্যানিংএর শাসন সময়ে ভারতের নানাস্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইতিহাস পাঠকের নিকট "সিপাহী বিদ্রোহে"র সূচনা, ঘটনা ও কার্য্য প্রবাহ অপরিচিত নহে, ব্রিটিশ নর নারী ও নির্দ্দোষ শিশুসন্তানের প্রতি অত্যাচার ও নির্দ্দয় ব্যবহারের বিসদৃশ ও বীভৎস বিবরণ ইতিহাসের পত্র

পংক্তি কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সেই অপবিত্র পত্রের প্রতি পাঠক চক্ষুর উন্মীলন অপেক্ষা নিমীলনই ভাল বলিয়া মনে করি। ১৮৫৮ সালে বিদ্রোহ বিদমিত হইলে ব্রিটিশ রাজ্যের অধীশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে শাসন কার্য্য প্রচালন জন্য ভারত রাজ্য গ্রহণ করেন। প্রবল ঝটিকা অজস্র বৃষ্টি পাত বা অপরবিধ দৈব উৎপাতের পর প্রকৃতি যেমন শান্তিময়ী মূর্ত্তি ধারণ করে, কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার শাসনের পরিণামে, সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ভারত রাজ্যে ও তেমনই শান্তি বিধি প্রতিষ্ঠিত হইল। জলদাবৃত অমানিশার অবসানে জগচ্চক্ষু প্রদীপ্ত প্রভাকর সমুদিত হইলে বিশ্বমণ্ডল যেমন প্রফুল্ল বদনে, হাসিতে ও আনন্দ প্রবাহে ভাসিতে থাকে, ভারতবাসী মানবগণ তেমনই বিদ্রোহ বিড়ম্বনা হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সুখের আস্বাদে ও বিমল শান্তির প্রসাদে "দোহাই কোম্পানী"র পরিবর্ত্তে "দোহাই মহারাণী" "জয় মহারানী" রূপ মহানন্দ ধ্বনি ঘোষণা করিতে লাগিল।

১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বর তারিখে ভারত বাসীর অমূল্য সম্পত্তি আশা সূচক, আশঙ্কা নিবারক, আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধক সর্ব্বজন প্রিয় মহারাণীর হৃদয় কানন প্রসূত অপূর্ব্ব ঘোষণা পত্র ঘোষিত হইলে কি এক অদ্ভুত অননুভবণীয় অভিনব ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা এখনও স্মরণ মনন করিলে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই পরম পুলকিত হইয়া থাকেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা ভরসা, উচ্চাভিলাষী রাজ কর্ম্মচারী দিগের শাসন প্রথা, ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দু দিগের স্বধর্ম্ম প্রতিপালনী ব্যবস্থা, জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে শিক্ষা প্রাপ্তির সুবিধা ও যোগ্যতানুসারে রাজ পদ লাভের কামনা ইত্যাকার বিবিধ বিষয়ে আশ্রয় স্থল কেবল ঐ ঘোষণা পত্র।

বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে রাজ্য ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচনেচ্ছা সর্ব্বজনীন সমবেদনা আপামর সাধারণের

প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া মহারাণী যে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া একবারে সদয় হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া মনঃ প্রাণের শান্তিকরী মধুময়ী ভাষায় প্রাণের কথা বলিয়াছিলেন আমরা তাহার যৎকিঞ্চিত মাত্র পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিলাম।

"সম্পূর্ণ মাত্রায় সর্ব্ব সাধারণের ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আমি কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সাহায্যে আমার সকল শ্রেণীর প্রজাগণের অধিকার ও স্বত্ব রক্ষা এবং যথাসাধ্য তাহাদের সর্ব্ববিধ সুখ বর্দ্ধন ও মঙ্গল বিধানে প্রতিনিয়ত যত্নবতী থাকিব।"

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত রাজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া মহারাণী ভারত বাসীর জননী স্থানীয়া হইয়া যে ভাবে যেরূপে ও যে কৌশলে রাজ দণ্ড পরিচালনা করিয়া তাহাদের হৃদয় মধ্যে অটল রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার যথাযত বিবরণ বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং সাধ্যাতীতও বটে। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম মাসে গত ২২ জানুয়ারি মঙ্গল বার সেই সর্ব্বজন মাননীয়া সর্ব্বদেশ পূজনীয়া সর্ব্ব সাধারণের জননী স্থানীয়া মহারাণী অনিত্য নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য অপার্থিব দিব্য ধামে গমন করিয়াছেন। শোকের কারণ উপস্থিত হইলে শোক প্রকাশ বা বিলাপ করা মনুষ্য প্রকৃতির নিত্য সিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মহারাণী ভারতেশ্বরীর বিভীষিকা পূর্ণ মৃত্যু সংবাদ যখন দ্রুত তাড়িত সংযোগে দেশে দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল, সেই দিনের সেই সময়ের ভীষণ ভাব স্মরণ করিলে এখনও স্তম্ভিত ও চকিত হইতে হয়। মহারাণীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়াই সকলে উৎসুক, উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়াছিল—কখন কি সংবাদ আইসে—দেখিতে দেখিতে তৃতীয় দিবসের প্রভাতে একবারে চরম শোক পূর্ণ সংবাদ আসিল "মহারাণী আর ইহ জগতে নাই।" ১৮৫৮ সালের নবেম্বর হইতে ১৯০৭ সালের ২২ শে

জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল প্রায় ৪৬ বৎসর কাল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহে যত্নে, সুশাসনে ও সুপালনে ভারত বাসী সর্ব্বতোভাবে সুখ শান্তিতে নির্ভয়ে কাল যাপন করিতেছিল, সেই জননী স্বরূপা ভারতেশ্বরীর অভাবে ভারত বাসীর শোক দুঃখ প্রকাশ বা বিলাপ করা কেবল প্রকৃতিগত ভাব বিকাশ। মাতৃহীন শিশুর মাতৃ বিয়োগ জন্য শোক প্রকাশ ও বিলাপ হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বিশেষতঃ তিনি স্বকর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, ভারতবাসী এই অনুপম ভাবে মাতৃ দেবীর মরণ স্মরণে মাতৃ ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। রাজ মহিষী মাতৃস্থানীয়া ও দেবতা স্বরূপা একথা হিন্দু মাত্রেই জানেন ও মানেন। মনু সত্যই বলিয়াছেন :—

"মহতী দেবতা হ্যেষা নর রূপেণ তিষ্ঠতি॥"

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ও রাজত্ব কালের বিবরণ বিবৃত করিতে প্রস্তুত ও প্রয়াসী নহি। আরতি পত্রিকার ন্যায় ক্ষুদ্র স্থান মধ্যে সেই বিবিধ ঘটনা পূর্ণ সুদীর্ঘ রাজত্বের বিবরণ প্রদান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অসাধ্য। তবে ভারতেশ্বরীর জন্ম দিনে ১৯০০ সালে ২৪ শে মে সর্ব্ব প্রথম আরতি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়, যাঁহার জন্ম দিনে আরতির প্রথম প্রকাশ, তাঁহার পরলোক গমনে আরতি যেরূপ ব্যথিত ও দুঃখিত তাহা পরিজ্ঞাপন জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

১৮১৯ সালের ২৪ শে মে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয় ১৮৩৭ সালে ১৯ শে মে ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৫৮ সালে ১ লা নবেম্বর বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের শাসন স্বহস্তে গ্রহণ ব্রিটিশ ও ভারতরাজ্যের অধিশ্বরীরূপে পরিচিত হওয়ায় তৎসূচক ঘোষণা প্রচারিত হয়। প্রায় ৪৩ তেতাল্লিশ

বৎসর তিনি ভারত রাজ্য সুশাসন ও ভারত বাসীর সুপালন করিয়াছিলেন সুতরাং এই ৪৩ বৎসরই তাঁহার সহিত ভারত বাসীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু দীর্ঘকাল নানাবিধ ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। এই ৪৩ বৎসর মধ্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকার কলেবরে অসম্ভব সুতরাং অতি সংক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ মাত্র করিয়া পরিতৃপ্ত ও বিরত হইতে বাধ্য হইলাম। ১৮৫৭ সনের পর ১৮৬৭, ১৮৭৭, ১৮৮৭ এবং ১৮৯৭ এই বৎসর কয়টী ভারত বাসীর স্মরণীয়। ভারতেশ্বরীর নামের সহিত আবার এই কয়েকটি বৎসরের ঘটনাবলী অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংবদ্ধ। একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে ও ভাবিলে সকলেই বুঝিতে ও জানিতে পারিবেন প্রতি দশ বৎসরে এক একটী স্মরণীয় ঘটনা ১৮৫৭ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত এই চল্লিশ বৎসর মধ্যে ভারত বাসী যেরূপ ভীত, প্রীত ও বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে এই বৎসরগুলি তাঁহাদের নিত্য স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক চিত্রে সুবিদিত হইয়া থাকিবে। আমরা সংক্ষেপে ঐ কয় বৎসরের ঘটনা মাত্র উল্লেখ করিতেছি। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের প্রবল তাড়নায় উৎসন্ন হইয়া যায় অসংখ্য নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার ১৮৬৭ সালে দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যবস্থা বিহিত হয় এবং দেশমধ্যে জল পথে ও স্থল পথে গমনাগমন সৌকর্য্যার্থ এবং এক প্রদেশের উৎপন্ন শস্যাদি অপর স্থানে লইয়া যাওয়ার সুবিধার বিধান নিমিত্ত খাল খনন ও লৌহ পথ বিস্তারের ব্যবস্থা ও প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষ নিবারণ নিমিত্ত যে বিধি ব্যবস্থা প্রণীত ও যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে মহারাণীর শাসন প্রথার পরিচয় ও ভারত দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৭৭ সালেও মান্দ্রাজ প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দাবানল

জ্বলিয়া উঠে। গ্রাম, নগর সমস্ত স্থানকে পরিদগ্ধ করিয়া দুর্ভিক্ষ বহ্নির নির্ব্বাপন অবসরেই ভারতের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে ভারতেশ্বরী নাম গ্রহণ উপলক্ষে যে সুবৃহৎ রাজ সূয় যজ্ঞের আয়োজন ও উদ্যাপন হইয়াছিল, তাহা ভারত বাসী চিরকাল স্মরণ রাখিবে। আবার ১৮৮৭ সালে যখন মহারাণীর রাজত্ব কাল পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়া যায় সেই মহোৎসব ব্যাপারে ভারতবাসী যে আনন্দ উল্লাসে ও আমোদ প্রমোদে মাতিয়াছিল এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে "জয় মহারাণী ভারতেশ্বরী" বলিয়া যে আনন্দধ্বনি উঠিয়াছিল এবং জাতি ধর্ম্ম শিক্ষা সংস্কার নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসী যে রাজভক্তির প্রমাণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল তাহার স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই এবং কালের প্রবাহে তাহাকে সুদূরবর্ত্তী করিলেও অতীত কাল সাক্ষী—ইতিহাস তাহাকে সমাদরে হৃদয়ে ধারণ পোষণ করিবে এবং ১৮৭৭ সালের রাজসূয় ও ১৮৮৭ সালের "জুবিলি"র ঘটনা জগতের নিকট বিঘোষিত করিবার জন্য জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিবে। তারপর ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প ও ডায়মণ্ড বা হীরক জুবিলি। মহারাণীর রাজত্বকাল ষাটি বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার স্মরণ উপলক্ষে যে মহোৎসবে ভারতবাসী মাতিয়াছিল, সেই উৎসব ব্যাপারই হীরক জুবিলি নামে অভিহিত। যদি আমরা সুখ দুঃখের তুলনায় সম্পদ্ বিপদের আলোচনায় এবং দ্বন্দ্বভাবাত্মক বিষয়গুলির বিচারণায় প্রবৃত্ত হই তবে ১৮৫৭ সাল হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর মধ্যে মহারাণীর রাজত্বকালে ভারতীয় প্রজাবৃন্দ নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তি সম্ভোগ করিতে পায় নাই। বিধাতৃবিধান অনুসারে অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও তদানুসঙ্গিক বিবিধ ব্যাধিতে প্রজাগণের শরীর মর্ম নিয়তই উত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন

চিত্রপটের অংশবিশেষের প্রতি দৃষ্টি করিলে, তাহার সামগ্র্য ও পূর্ণতা উপলব্ধি হয় না তেমনই ভারতেশ্বরীর ভারতরাজ্য শাসন সময়ে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে তাহার রীতিমত আলোচনা করিতে গেলে কেবল উজ্জ্বল অংশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে চলিবে কেন? সেই জন্যই আমরা উজ্জ্বল মলিন উভয় ভাগই পাঠকগণকে দেখিতে ও ভাবিতে বলি এবং আমরা এইরূপে ভাবিলে ও দেখিলেই ভারতরাজ্যের অতীত অবস্থা হইতে বর্ত্তমান দশার পরিবর্ত্তন বুঝিতে ও জানিতে পারিব। সাময়িক উন্নতি অবনতি প্রকৃতিদেবীর অটল নিয়মের অমোঘ পরিণাম ব্যবস্থা। কাহারই কোন শক্তি বলে তাহার প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নহে। প্রকৃতি প্রণোদিত হইয়া ভারতবাসী যে উপকার লাভ করিয়াছে তাহা অবশ্যই বিশিষ্টরূপে উল্লেখ যোগ্য কিন্তু আবার কালস্রোতে যে অপকার ও ক্ষতি হইয়াছে যাহার পরিপূরণের কোনই উপায় নাই তাহা কদাচ উপেক্ষিত হওয়া উচিত নহে।

যখন মহারাণী ভারতরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চদশ কোটী ছিল কিন্তু এক্ষণে ১৯০১ সালে এই সংখ্যা প্রায় ত্রিংশত কোটিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। ৪৩ বৎসর মধ্যে মোটামুটী বলিতে গেলে লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। সুতরাং বংশবৃদ্ধির আলোচনায় ভারতবাসীর সুখাধিক্য ও আরামের অবস্থা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তবুও দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, মহামারী, প্রবল ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে সকল নৈসর্গিক কারণে মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে লোকসংখ্যার হ্রাস হইতেছে তাহার কোনরূপ নিবারণ উপায় থাকিলে লোকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই।

লোক সংখ্যার কথা ত্যাগ করিয়া জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা, বাণিজ্য, সাহিত্য ও লৌকিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল

পরিবর্ত্তন এই কিঞ্চিদূন অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে সংসাধিত ও সংঘটিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আবশ্যক।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত একশত বৎসর মধ্যে ইংরাজদিগের সংস্রব, সংসর্গ ও সংঘর্ষণে ভারতবাসী যে পরিবর্ত্তন প্রবাহে পড়িয়াছিল। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজপুরুষগণ সাধারণ বণিকবৃন্দ ও সৈনিক সমূহের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় কতকগুলি অবশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছিল। কালস্রোতে বিধাতৃ বিধানের অনিবার্য্য নিয়মে যেসকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহাতে কাহারও কোন হাত নাই। আমরা ঐ শতবর্ষ ব্যাপী ঘটনা সমূহের উল্লেখালোচনা করিতে অনবসর, কেবল ভারতেশ্বরীর শাসন সময়ে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত এই ৪৩ বৎসর মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি অবনতি ঘটিয়াছে, আগামী বারে আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বসন্তে।

এমন বসন্ত বিফলে যে যায়
সখি আয়, হেথা আয়।
একা এ মাধুরী ধরিতে না পারি
হয়েছি অধীরপ্রায়।

(ওই) ডেকে ডেকে শ্যামা ফিরে বনে বনে
অচেত প্রকৃতি চকিত চুম্বনে
সঞ্চারিত প্রীতি তরু-লতাগণে
পূর্ণ শ্যাম-সুষমায়।

অই ওঠে পিক কুহরি কুহরি
তনু মন মম উঠিছে শিহরি
গুঞ্জরে ভ্রমর আমরি আমরি
ফুল রেণু মেখে গায়।

(ওগো) কি জানি কাহিনী সমীরণে ভাসে
কার দেহ-গন্ধ কোথা হতে আসে
আমি যেন বুঝি কে যেন সম্ভাষে
মৃদুল অঙ্গুলি ঘায়।

আয়লো হৃদয়ে ফুল-কুলরাণি
সৌরভে গৌরবে মাখ দেহখানি
মরমের কথা দিবসযামিনী
নিবেদিব তোর পায়।

শ্রীমনোমোহন সেন।

১ম বর্ষ, ১ম, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮। ১ম, ১১শ, ১২শ সংখ্যা।

ভারতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীচ—বি,এ, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, শ্রীম—বি,এ, শ্রীদুর্গাদাস রা—, শ্রীশশধর সেন বি,এ, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত শ্রীমনোমোহন সেন ও শ্রীকেদারনাথ মজুমদার সম্পাদক।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জ্যোতিষ—ক্রমবিকাশ	২৭১	৬। মহরম	৩১১
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	২৩৮—২৭৭	৭। মানব শব্দের বুৎপত্তি কি	৩১৯
৩। বর্ষশেষ ও নববর্ষ (গ্রাম্য চিত্র)	২৭১	৮। আগ্রায়	২৪৯—৩২৮
৪। বেদ	৫২, ৯০, ২০৫, ৩০৪	৯। সীমান্ত (গল্প)	৩৩৬
৫। পরিণয় উপহার (যুগল কবিতা)	৩৩৫		

PRINTED BY N. K. MAZUMDAR.
MAZUMDAR PRESS,
20, Cornwallis Street.
CALCUTTA.

ময়মনসিংহ
ভারতি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৷৷০ আট আনা।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন—

আরতির বৎসর শেষ হইল। এখনও অনেক গ্রাহক মূল্য প্রদান করেন নাই। আশা করি তাহারা দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মূল্য দেড় টাকা প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অনেক ভদ্রলোক ৭ মাসের অধিক কাল আরতি গ্রহন করিয়াও ভিঃ পিঃ প্যাকটি ফেরত দিয়াছেন। আমরা যে আরতি দেই নাই। দেশের শিক্ষিত বালক যাহারা সুপরিচিত তাহাদের নিকটই যত্ন করিয়া আরতি প্রেরণ করিয়াছিলাম। যাহারা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়াছেন তাহারা সুশিক্ষারই পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় বৎসরের জ্ঞাতব্য বিষয় বাহিরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। স্থানীয় গ্রাহকগণের মূল্য আদায় জন্য শ্রীবিপিন চন্দ্র দে কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়াছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের দস্তখতি রসিদ গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট মূল্য প্রদান করিবেন।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত

মহামতি রানাডে (সচিত্র) মূল্য ৵১০ পয়সা।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত

হিমালয় ১।০ ও প্রবাসচিত্র ১

কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত

প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন, ফুল রেণু। প্রতি খণ্ড ৸০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রীম—কথিত)

প্রথমভাগ ছাপা হইতেছে;

মহাপুরুষ প্রদত্ত

হাঁপানির (এজ্‌মা) মাদুলী।

গত বিংশতি বৎসর যাবৎ এই মাদুলীর আশ্চর্য্য আরোগ্যশক্তি সহস্র রোগীতে পরীক্ষিত হইয়াছে। ধারণ মাত্র রোগযন্ত্রণার লাঘব হয় এবং সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। মাদুলী ব্যবহার করিয়া এপর্য্যন্ত একটী রোগীও বিফল হন নাই। কঙ্কালাবশিষ্ট শয্যাগত বহুরোগী সপ্তাহে কর্ম্মক্ষম হইয়াছেন। মূল্য ১, এক টাকা। ব্যবস্থা পত্র মাদুলীর সহিত প্রেরণ করা হয়।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, সার্কেল পণ্ডিত।
পোঃ আটঘড়ী—টাঙ্গাইল।

আরতি।

চৈত্র ১৩০৭ } মাসিকপত্রিকা সমালোচনী। { ১ম বর্ষ, দশম সংখ্যা।

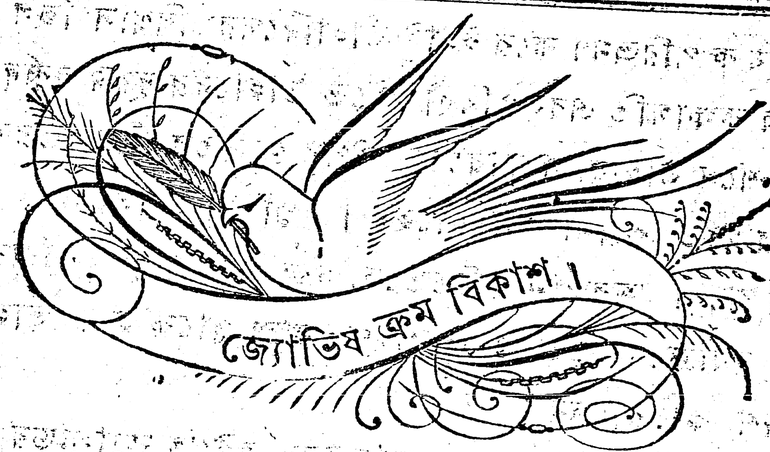

ভারতবর্ষ, চীন, ক্যালডিয়া এবং মিসর এই চারি দেশে ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্ব হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা ছিল; ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। সংস্কৃত ভাষায় জ্যোতিষ সম্বন্ধে অষ্টাদশটি প্রাচীন সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান থাকা অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে সূর্য্য, সোম, ব্রহ্ম, বশিষ্ঠ, এই চারিটী ভিন্ন আর সমস্ত সিদ্ধান্তই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। সূর্য্য সিদ্ধান্তই অস্মদ্দেশে সমধিক সমাদৃত। এই গ্রন্থ প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের গভীর জ্ঞান এবং গবেষণার পরিচয় প্রদান করে। ইহার প্রণয়নকাল বিবেচনায় গণনাপ্রণালী অতি সূক্ষ্ম বলিতে হইবে। কথিত আছে সত্যযুগ অবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, অর্থাৎ একবিংশতি লক্ষাধিক বর্ষ গত হইল, ভগবান সূর্য্যদেবের অংশ সম্ভূত এক পুরুষ ময়নামক অসুরকে এই গ্রন্থোক্ত বিষয় শিক্ষা দেন, এবং ঋষিগণ

ময়ান্থর হইতে এই অপূর্ব্ব জ্যোতির্বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। একথা সত্য না হউক, এই গ্রন্থ যে অত্যন্ত প্রাচীন তাহার কোন সন্দেহ নাই। *

সিদ্ধান্ত কর্ত্তাগণ গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি চাক্ষুষ যেরূপ দেখিয়াছেন তাহাই প্রকৃত মনে করিয়াছেন। সুতরাং পৃথিবীই নভোমণ্ডলের কেন্দ্র এবং জ্যোতিষ্কগণ বৃত্তাকার পথে তাহাকে দৈনিক ও বার্ষিক পরিভ্রমণ করে ইহাই তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল। গ্রহদিগের কক্ষাগতি এবং পৃথিবী হইতে তাহাদের দূরত্ব সর্ব্বদা সমান নহে দর্শনে তাঁহারা কক্ষাবৃত্তের উপর ক্ষুদ্রতর নীচোচ্চবৃত্ত, সকল গ্রন্থের গতি কল্পনা করিয়াছেন। পৃথিবী গোলাকার, নিরবলম্ব ভাবে শূন্যে অবস্থান করিতেছে, চন্দ্র এবং পৃথিবীচ্ছায়ার আচ্ছাদনে যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে ইহা তাঁহারা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে ক্যালডিয়ান পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক ব্যাবিলনে নীত হয় এবং তথা হইতে প্রাচীন গ্রীসে বিস্তার লাভ করে। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত হিপার্কাস ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের আদি কল্পিত হইয়া থাকেন। হিন্দু সিদ্ধান্ত সম্মত গ্রহগতি সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল তিনিই প্রাচীন গ্রীসে প্রথম প্রচার করেন। তাঁহার তিন শতাব্দী পর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমি সেই সকল নিয়ম রীতিমত লিপিবদ্ধ করেন। এই জন্যই সিদ্ধান্ত মত ইউরোপে টলেমির মত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আর্য্য ভট্টের ন্যায় কোন কোন ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্

* কোন কোন ইউরোপিয়ানের মতে প্রায় চারি সহস্র বৎসর হইল সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রণীত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত মতের বিরুদ্ধ আভাস প্রদান করিয়া থাকিলে ও তাহা সাধারণ্যে গৃহীত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রুসিয়া দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ কোপার্ণিকাস স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলেন যে পৃথিবী স্থির নহে ও গ্রহকক্ষার কেন্দ্র নহে। পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক এই দুইটী গতি আছে। দৈনিক গতিবশতঃ জ্যোতিষ্কগণের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত দৃষ্ট হয়। বার্ষিক গতিবশতঃ সূর্য্য বৎসরে ইহাকে একবার পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়। পৃথিবী এবং শুক্রাদি গ্রহগণ সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রন্থের নীচোচ্চবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিয়া সূর্য্যকে গ্রহকক্ষার কেন্দ্র কল্পনা করা এত সহজ বোধ হয় যে টলেমির এত দীর্ঘকাল পরে কোপার্ণিকাসের অভ্যুদয় অতি আশ্চর্য্যজনক। বলা বাহুল্য যে কোপার্ণিকাসের মতে সূর্য্যগ্রহ শ্রেণী চ্যুত হইল এবং পৃথিবী তাহার স্থলবর্ত্তী হইল। আর, চন্দ্রগ্রহ নাম হারাইয়া উপগ্রহে পরিগণিত হইল।

কোপার্ণিকাস ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ গ্রহকক্ষা সকল বৃত্তাকার বলিয়াই কল্পনা করিতেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার্ম্মেন জ্যোতির্ব্বিদ কেপ্লার নির্দ্দেশ করিলেন যে কক্ষা সকল অণ্ডাকার ও সূর্য্য তাহাদের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত নহে। তাঁহার মতে সূর্য্যের সহিত কোন গ্রহের যোগকারক রেখা সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া একই সময়ে একই পরিমাণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করে এবং কোন দুই গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্বের ঘনের অনুপাত তাহাদিগের কক্ষা পরিভ্রমণকালের বর্গের অনুপাতের সমান।

কেপ্লার পর্য্যন্ত সমস্ত পণ্ডিতই গ্রহগতির প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কেহই তাহার কারণ অনুসন্ধিৎসু হন নাই। কেপ্লারের অনতিকাল পরে তাঁহার আবিষ্কৃত নিয়ম অনুসরণ করিতে করিতে সুবিখ্যাত বৃটিশ পণ্ডিত নিউটন এই অশ্রুতপূর্ব্ব

অত্যদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রচার করিলেন যে, যে সহজ দৃশ্যমান আকর্ষণ শক্তিবশতঃ আতাফল ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় সেই বিশ্বব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া গ্রহগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অণ্ডাকার পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

কেপ্লারের সময়েই ইতালিদেশীয় বিখ্যাত গণিতবেত্তা গ্যালিলিউ দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিনব জীবন প্রদান করিল। অনেক সন্দেহজনক জটিলতত্ত্ব দূরবীক্ষণ সাহায্যে সহজ হইয়া গেল। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই দূরবীক্ষণ তাহা চাক্ষুষ পরিদর্শন করাইল। অনেক নূতন গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ হার্শেল শনিগ্রহের কক্ষার বহির্ভাগে ইউরেনাস নামক একটি বৃহৎ নূতন গ্রহ আবিষ্কার করিলেন, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরেনাসের বহির্ভাগে নেপচুন নামক আর একটি সুবৃহৎগ্রহ আবিষ্কৃত হইল, কেবল ইহাই নহে, মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যবর্ত্তী স্থানে পরস্পর নিকটবর্ত্তী কক্ষায় অনেকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদগণ আবিষ্কার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কেবল পৃথিবীরই একটি উপগ্রহ জানা ছিল, দূরবীক্ষণ বুধ ও শুক্র ভিন্ন সমস্ত বৃহৎ গ্রহেরই এক কি ততোধিক উপগ্রহ প্রদর্শন করিল।

নক্ষত্র জগতে দূরবীক্ষণের আবিষ্কার অতি আশ্চর্য্য জনক। সুধু চক্ষে যথায় ১০টি মাত্র নক্ষত্র দৃষ্ট হয় দূরবীক্ষণ সেখানে হয়ত সহস্রটি দেখাইল, 'সাত ভগ্নী' কৃত্তিকা প্রায় শত ভগ্নীতে পরিণত হইল। দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্যালিলিউ প্রথম দেখাইলেন যে ছায়াপথ সুরভীর ভ্রাম্যপথ নহে, ইহা অসংখ্য তারকার সমাবেশ ক্ষেত্র মাত্র। ইহাও প্রমাণিত হইল যে প্রত্যেক নক্ষত্র স্বয়ং

তেজময় এক একটি সূর্য্য কেপ্লার প্রথম এই মত প্রচার করেন। আমাদিগের সূর্য্য যেমন গ্রহমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত, কে বলিতে পারে এইসকল অসংখ্য সূর্য্য প্রত্যেকে তেমনি গ্রহ পরিবৃত নহে? সিরিয়স বা মৃগব্যাধনক্ষত্রের একটী গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নক্ষত্র সকল এ পর্য্যন্ত অচল বলিয়াই প্রতীতি ছিল এবং সাধারণ গণনায় তাহাদিগকে অচল মনে করাই উচিত, কারণ বহু শতাব্দীতেও তাহাদের কোন দৃশ্যমান গতি অনুভূত হয় না। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে হার্শেল, ষ্ট্রুভ ও এইরি প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে নক্ষত্র সকলের অতি প্রবল গতি আছে, এবং আমাদিগের সূর্য্য ও গ্রহাদি সহ প্রচণ্ডবেগে আকাশমার্গে ধাবমান হইতেছে। পৃথিবী হইতে নক্ষত্রগণ কোটী কোটী মাইল দূরবর্ত্তী বলিয়াই তাহাদের এই প্রবল গতি চাক্ষুষ অনুভূত হয় না।

সূর্য্য তাহার পরিভ্রমণকারী গ্রহাদিসহ 'সৌরজগৎ' নামে অভিহিত হয়। এই রূপ নক্ষত্রগণের একত্র সমষ্টিকে 'নক্ষত্র জগৎ' বলা যাইতে পারে। ক্যাণ্ট, হার্শেল, ও ষ্ট্রুভ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে নক্ষত্র জগৎ গোলাকার নহে বরং একটি অল্পবেধ বিশাল ব্যাসের রথ চক্রের ন্যায়। ঐ চক্রের ব্যাস ছায়াপথের দিকে বহুদূর বিস্তৃত, সুতরাং ঐদিকে দূরবীক্ষণ লক্ষ করিলে স্তরে স্তরে অবস্থিত বহু নক্ষত্র একত্র সন্নিবিষ্ট ভাবে দৃষ্ট হয়। কিন্তু চক্রের লম্বদিকে নক্ষত্র জগৎ অল্প পরিসর বলিয়া নক্ষত্রস্তর অপেক্ষাকৃত অনেক কম, সুতরাং নক্ষত্র সকলকে বিরল সন্নিবিষ্ট বলিয়া দৃষ্ট হয়।

কৃত্তিকাপুঞ্জের ন্যায় আকাশের স্থানে স্থানে বহু নক্ষত্র একত্র সন্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। দূরবীক্ষণে এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, এবং 'নক্ষত্র পুঞ্জ' সকল প্রত্যেকেই একটী নক্ষত্র

জগৎ বলিয়া অনুমিত হইল। অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ অনাবৃত চক্ষে শুভ্রমেঘ খণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হয়, দূরবীক্ষণের সহায়তা ভিন্ন তাহাদিগের নক্ষত্র সকলকে বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য। আবার, এইরূপ মেঘ খণ্ডবৎ দৃশ্যমান কোন কোন পদার্থ দূরবীক্ষণেও বিশ্লেষণ করা যায় না। হুগিন্‌স্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে সুদূর বিস্তৃত জ্বলন্ত গ্যাস রাশি বলিয়া অনুমান করিলেন। সম্ভবতঃ ইহারা বিশ্বকর্ত্তার অনন্ত কোটি বিশ্বরাজ্যের বীজগর্ভে ধারণ করিয়া আকাশ মার্গে ভ্রমণ করিতেছে। ইহাদিগকে 'নীহারিকা' নাম প্রদত্ত হইতে পারে।

নীহারিকা পর্য্যালোচনা উপলক্ষে একটি অতি সুন্দর সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা উপস্থিত হইল। আমাদিগের এই বিশাল সৌর জগৎ ও কি কোন সময়ে একটি নীহারিকা মাত্র ছিল? সূর্য্য হইতে সুদূরবর্ত্তী নেপচুনের কক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত আকাশ রাজ্য কোন দিন জ্বলন্ত গ্যাস রাশিতে পূর্ণ থাকা কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। সেই গ্যাস রাশি ক্রমশঃ শীতল ও সঙ্কুচিত হইয়া সম্ভবতঃ মধ্যভাগে জ্বলন্তদেহ রবিমণ্ডল রূপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই সঙ্কোচন সময়ে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে ঘনীভূত গ্যাসরাশি কেন্দ্র হইতে বহির্ভাগে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া ও তাহা একত্রীভূত হইয়া গ্রহ উপগ্রহাকারে পরিণত হইয়াছে এবং বিজ্ঞানানুমোদিত স্বাভাবিক আকর্ষণশক্তি কেন্দ্রস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

শ্রীচ—

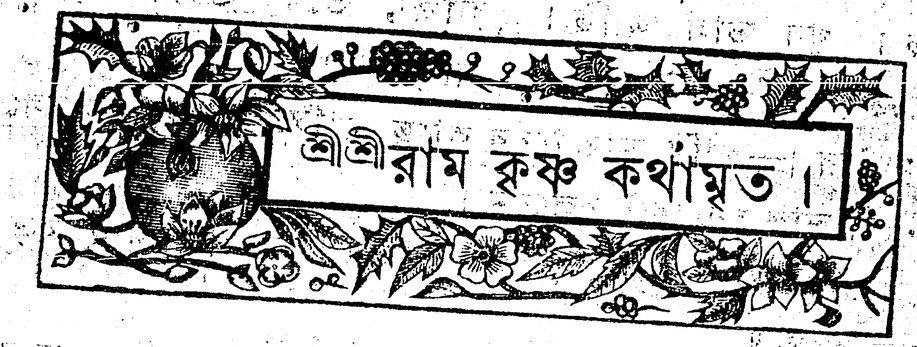

(শ্রীম—কথিত)

(শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ডাক্তার সরকার, ছোট নরেন্দ্র, কালী *
শরৎ, রাখাল ইত্যাদির কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(সেবক হৃদয়ে)

আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি, সোমবার, ১১ই কার্ত্তিক ইংরাজি ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ লইয়া লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে।

---

* কালী—(স্বামী অভেদানন্দ) তখন আমেরিকায় আছেন। আর একটি অন্তরঙ্গ ভক্ত, শরৎ (স্বামী শারদানন্দ) তিনিও আমেরিকায় গিয়াছিলেন।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার যাইবেন, তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) অসুখটা খুব হাল্কা হইয়াছে। খুব ভাল আছি। আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হ'য়েছে? তা'হলে ঔষধটা খাই না কেন?

মাষ্টার।—আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব বলবো, তিনি যা ভাল হয়, তাই বলবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ।—দেখ, পূর্ণ * দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন কচ্চে॥

মাষ্টার।—(কালীর প্রতি) কালী বাবু, তুমি পূর্ণকে ডাকতে যাও না।

কালী। তাই যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ।—(মাষ্টারের প্রতি) ডাক্তারের ছেলেটী বেশ। একবার আসতে বলো।

মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দুই এক জন বন্ধুর সঙ্গে বসে আছেন।

ডাক্তার। (মাষ্টারের প্রতি) এই এক মিনিট হ'লো তোমার কথা কচ্ছিলাম, দশটায় আসবে বল্লে, দেড় ঘণ্টা বসে। ভাবলেম, কেমন আছেন, কি হলো! ডাক্তার। (বন্ধুর প্রতি) ওহে, সেই গানটা গাওত।

বন্ধু গাইলেন:—

কার তাঁর নাম গান
যতদিন রহে দেহে প্রাণ।

---

* শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র সেন ১৪।১৫ বৎসর, তখন স্কুলে পড়িতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাকেও ভাল বাসিতেন। ঠাকুরের আর একটি অন্তরঙ্গ।

যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতিঃ, জগৎ করেছে আলো;
স্রোত বহে প্রেম পীযূষ-বারি, সকল
জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি;
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ;
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুঃখ লেশ হে?

ডাক্তার। (মাষ্টারের প্রতি) গানটী খুব ভাল নয়? ঐখানটী কেমন? "অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর এই সদা সবে জিজ্ঞাসে।"

মাষ্টার। হাঁ, ওখানটী বড় চমৎকার, খুব অনন্তের ভাব।

ডাক্তার। (সস্নেহে) অনেক বেলা হয়েছে, তুমি খেয়েছোত? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হ'য়ে যায়, তার পর আমি ডাক্তারী কর্‌তে বেরুই। না খেয়ে বেরুলে অসুখ করে। ওহে একদিন তোমাদের খাওয়াবো মনে করেছি।

মাষ্টার। তা বেশ মহাশয়!

ডাক্তার। আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল।

মাষ্টার। মহাশয়, এখানেই হোক, আর সেখানেই হোক, সকলে আহ্লাদ করে খাবে।

মা কালীর কথা পড়িল।

ডাক্তার। কালী ত একজন সাঁওতালী মাগী। (মাষ্টারের হাস্য)

মাষ্টার। ও কথা কোথায় আছে?

ডাক্তার। শুনেছি এই রকম।

পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও অন্যান্য ভক্তের ভাব সমাধি হইয়াছিল। ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতে লাগিল।

ডাক্তার। ভাব ত দেখলুম। বেশী ভাব কি ভাল?

মাষ্টার। পরমহংসদেব বলেন যে, ঈশ্বর চিন্তা করে যে ভাব হয়, তাহা বেশী হলেও কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন যে, মণির জ্যোতিতে আলো হয়, আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না।

ডাক্তার। মণির জ্যোতির! ও যে reflected light.

মাষ্টার। পরমহংসদেব আরও বলেন, অমৃত সরোবরে ডুবলে মানুষের অনিষ্ট হয় না, বরং মানুষ অমর হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়।

ডাক্তার। হাঁ, তা বটে।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, দু-চারটি রোগী দেখিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবেন। পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর 'অহঙ্কার' এই কথা শুনিলেন।

মাষ্টার। পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া আসা আছে, অহঙ্কার কিছুদিনের মধ্যে আর থাকিবে না। তাঁর কাছে বসিলে জীবের অহঙ্কার পলায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয়। ওখানে অহঙ্কার নাই কি না। নিরহঙ্কারের নিকট বসিলে অহঙ্কার পালিয়ে যায়। দেখুন বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড় লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়াছেন। পরমহংসদেব বাদুড় বাগানের বাটীতে তাঁকে দেখিতে গিয়াছিলেন। যখন বিদায় লন, রাত তখন ৮।৯টা হবে। বিদ্যাসাগর library ঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে নিজে এক এক-বার বাতি ধরে এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর বিদায়ের সময় হাত জোর করে রহিলেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, ওঁর বিষয় বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কি রকম মত?

মাষ্টার। সেদিন খুব ভক্তি করে ছিলেন, তবে কথা কয়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে ভাব-টাব বলে, সে সব বড় ভাল বাসেন না। আপনার মতের মত।

ডাক্তার। হাত জোর করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ওসব ভাল বাসি না মাথাও যা, পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক।

মাষ্টার। আপনি ভাব টাব ভাল বাসেন না। পরমহংসদেব 'আপনাকে মাঝে মাঝে 'গম্ভীরাত্মা' বলেন, বোধ হয় মনে আছে। তিনি সেই সেদিন আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নাম্‌লে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়ের, দিঘী বড়, তাতে হাতী নাম্‌লে জল বেশী নড়েও না। গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাব হস্তী নাম্‌লে তার কিছু করতে পারে না। তিনি বলেন, আপনি 'গম্ভীরাত্মা।

ডাক্তার। I don't deserve the complement ভাব আর কি? feelings ভক্তি আরও অন্যান্য feelings বেশী হলে কেউ চাপতে পারে; কেউ পারে না।

মাষ্টার। কেউ এক রকম করে—Explanation দিতে পারে কেউ পারে না, কিন্তু মহাশয়, ভাব ভক্তি জিনিষটা অপূর্ব্ব সামগ্রী। Stebbing বা Darwinism আপনার libraryতে দেখিলাম। Stebbing on Darwinism আপনার library তে দেখিলাম stebbing বলেন, human mind যার দ্বারাই হউক—evolution দ্বারাই হোক বা ঈশ্বর আলাহিদা বসে সৃষ্টিই করুন, equally wonderful. তিনি একটি বেশ উপমা দিয়াছেন, theory of light. Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful."

ডাক্তার। হাঁ, আর দেখেছো, Stebbing Darwinism মানে, আবার Godও মানে! আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

ডাক্তার। ইনি (পরমহংসদেব) দেখছি কালীরই উপাসক।

মাষ্টার। তাঁর কালী মানে আলাদা। বেদে যাঁরা পরম ব্রহ্ম বলে, তিনিই তাঁকে কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খ্রীষ্টান যাঁকে গড্ বলে, তিনি তাকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাকেই কালী বলেন। তার কাছে শুনেছি, একজনের একটী গামলা ছিল তাতে রং ছিল। কারো কাপড় ছোপাবার দরকার হলে তার কাছে কাপড় ছোপাতে যেত। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করতো, "তুমি কি রঙ্গে ছোপাতে চাও"। লোকটা যদি বোলতো, সবুজ রং, তাহলে কাপড়খানি গামলার রঙ্গে ডুবিয়ে ফিরিয়া দিত ও বলতো, 'এই নাও তোমার সবুজ রঙ্গে ছোপান কাপড়।' যদি কেহ বলতো, লাল রং তা হলে সেই একটি গামলায় কাপড়খানি ছোপিয়ে বলতো 'এই নাও তোমার লালে ছোপান কাপড়? 'সেই এক গামলার রঙ্গে সবুজ, লাল, নীল, হল্‌দে সব রঙের কাপড় ছোপান হতো। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক বল্লে, বাবু আমি কি রং চাই বলবো? তুমি নিজে যে রঙ্গে ছোপেছ, আমায় সেই রঙ্গ দাও। সেইরূপ পরমহংসদেবের ভিতর সব ভাব আছে, সব ধর্ম্মের সব সম্প্রদায়ের লোক তার কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায়। তার যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝবে?

ডাক্তার। All things to all men! তাও ভাল নয়, although St. Paul says it.

মাষ্টার। পরম হংসদেবের অবস্থা কে বুঝবে! তাঁর মুখে

শুনেছি, সূতার ব্যবসা না করলে ৪০ নং সূতা আর ৪১ নং সূতার প্রভেদ বোঝা যায় না। Painter না হলে Paint এর out বুঝা যায় না। মহাপুরুষের গভীর ভাব। Christ এর ন্যায় না হলে Christ এর সব ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো Christian বলেছিলেন, তাই Be perfect as your father in heaven is perfect.'

ডাক্তার। আচ্ছা, তাঁর অসুখের তদারক তোমরা কিরূপ কর?

মাষ্টার। প্রত্যহ এক একজন superintendent করেন, যাঁদের বয়স বেশী। কোনদিন গিরিশ বাবু, কোন দিন রাম বাবু, কোন দিন বলরাম, কোন দিন সুরেশ বাবু, কোন দিন নবগোপাল, কোন দিন কালী বাবু, এই রকম।

এই সকল কথা হইতে হইতে পরমহংসদেব শ্যামপুকুরের যে বাড়ীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছিলেন সেই বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া লাগিল। তখন বেলা ১টা হইয়াছে। দোতলার ঘরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি। সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় উঁহার সম্মুখে বসিয়া আছেন। অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'আজ বেশভাল আছি।'

ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[Sama পণ্ডিত সঙ্গে তত্ত্ববিচারে]

(পণ্ডিত ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে! ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটী অবস্থা হয়। তখন পরণের কাপড় পড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণ জ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তা হলে তাকে খড় কুটো মনে হয়।

"রামনারাণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিল, হঠাৎ সেই অবস্থাটা হলো। তারপর তাকে বল্লুম, 'তুমি কি বলছো, তাঁকে তর্ক করে কি বুঝ্‌বে, তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝ্‌বে। তোমার ত ভারি তেতে বুদ্ধি!' আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদ্‌তে লাগিল। আর আমার পা টিপ্‌তে লাগিল।

ডাক্তার। রামনারাণ ডাক্তার হিন্দু কি না,। আবার ফুল-চন্দন লয়। সত্য হিন্দু কি না।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) ডাক্তার বিস্তু শাক ঘণ্টায় নাই।

শ্রীরাম-কৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) বঙ্কিমের * সঙ্গে দেখা হইয়া-

---

* বঙ্কিম চন্দ্র চাটুর্য্যের সহিত বেনেটোলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পরম ভক্ত ৺ অধরলাল সেনের বাটীতে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের দেখা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে এই একবার দর্শন করিয়াছিলেন।

ছিল॥ আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, মানুষের কর্ত্তব্য কি? তা বলে, 'আহার, নিদ্রা, আর মৈথুন!' এই রকম কথাবার্ত্তা শুনে আমার ঘৃণা হলো। বল্লুম যে, ও কি রকম কথা! তুমিতো বড় ছ্যাচড়া,। যা সব রাত দিন চিন্তা কর্‌ছো; আর কাজে কাজে তাই তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। মুলো খেলেই মুলোর ঢেকুর উঠে।' তার পর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হলো, ঘরে সংকীর্ত্তন হলো। আমি আবার নামলুম। তখন বলে মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন! আমি বল্লুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে দেখ্‌বেন। আমি হাসিতে হাসিতে বল্লুম, কি রকম ভক্ত আছে গো?

'গোপাল' 'গোপাল' যা বলেছিল, সেই রকম ভক্ত নাকি?

ডাক্তার। 'গোপাল' 'গোপাল' সে ব্যাপারটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটী শ্যাক্‌রার দোকান ছিল। বড় ভক্ত। পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, কপালে তিলক, হাতে হরিনামের মালা। সকলে বিশ্বাস করে ঐ দোকানেই আসে, ভাবে পরম ভক্ত, তারা কখনও ঠকাতে যাবে না। একজন খোদ্দের এলে দেখ্‌ত, কোন কারিকর বল্‌ছে 'কেশব' 'কেশব!' আর একজন কারিকর খানিক পরে নাম করছে, 'গোপাল' 'গোপাল!' আবার খানিক ক্ষণ পরে একজন কারিকর বল্‌ছে, 'হরি' 'হরি' তারপর কেউ বল্‌ছে, 'হর' 'হর!' কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দাররা সহজেই মনে কর্‌তো, শ্যাক্‌রা অতি উত্তম লোক, কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে বল্লে, 'কেশব! কেশব,' তার মনের ভাব ওদব খদ্দের কে? যে বলে, 'গোপাল! 'গোপাল,' তার অর্থ এই যে, আমি তাদের চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লুম, এরা গরুর পাল, গরুর পাল (সকলের হাস্য) যে বল্লে, 'হরি' 'হরি'—তার অর্থ এই যে, যদি গরুর পাল হয়, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি

(সকলের হাস্য)। যে বলে 'হর' 'হর,' তার মানে এই যে 'তবে হরণ কর; হরণ কর, এরাত গরুর পাল। (সকলের হাস্য)।

'সেজ বাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম, অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমিতো মুখ্য, তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে বলে, মহাশয়! আগে যা পড়েছি, সে সব পড়া বিদ্যা তোমার সঙ্গে কথা কয়ে, সব ফু হয়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফুটে!

(ঈশ্বরের আবির্ভাব ও মুখের কণ্ঠে সরস্বতী) শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তার কৃপা হলে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখ না, তবে এ সব কথা বলে কে। আবার ও জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ও দেশে ধান মাপে, "রাম রাম" "রামে রাম" এই সব বলতে বলতে একজন মাপে, আর যায় ফুরিয়ে আসে আসে, এমন সময় আর এক-জন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্ম্মই ঐ, ফুরালেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমায় অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।

'ছেলে বেলাই আবির্ভাব হয়েছিল। ১১ বছর বয়সের সময় মাঠের উপর কি দেখলুম। সর্ব্বদাই বলে, বেহুস হয়ে গিছিলুম, কোন সাড় ছিল না। সেই দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর এক জনকে দেখিতে লাগলুম। যখন ঠাকুর পূজা করিতে যেতুম, হাতটা অনেক সময় ঠাকুরের দিক না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসতো, আর ফুল মাথায় দিতুম। যে ছোকরা থাকতো, সে আমার কাছে আসতো না, বোলতো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়।

('যন্ত্রারূঢ়')

শ্রীরামকৃষ্ণ:-আমিতো মুখ্য, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে? আমি বলি, মা আমি যন্ত্র—তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর—তুমি ঘরনী, আমি রথ-তুমি রথী, যেমন করাও-তেমনি করি, যেমন বলাও—তেমুনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি, নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ। তাঁরই জয়, আমি ত কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী (রাধা) যখন সহস্রধারা কলসী নিয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা করিতে লাগিল, বলে, এমন সতী হবে না। যখন শ্রীমতী বল্লেন, তোমরা আমার জয় কেন দাও, বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়, আমি তাঁর দাসী মাত্র। আমি ঐ অবস্থার ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম; কিন্তু এদিকেতো এত বিজয়কে ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি?

ডাক্তার। তারপর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাত জোড় করে) আমি কি করবো, সেই অবস্থাটা এলে আমি বেহুষ হয়ে যাই। নিজে কি করি কিছুই জানতে পারি না।

ডাক্তার। সাবধান হওয়া উচিত, হাত জোড় করলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন কি আমি কিছু করতে পারি? তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনেকর? যদি ঢং মনে কর, তাহলে তোমার Science (সায়েন্স্) সব ছাই পড়েছ।

ডাক্তার। মহাশয়! যদি ঢং মনে করি, তাহলে কি এত খাটি? কত রোগীর বাড়ী যেতে পারিনা, আর এখানে এসে ছয়ঘণ্টা সাতঘণ্টা ধরে থাকি।

('ন যোৎস্যে' ভগবদ্গীতা)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজো বাবুকে বলেছিলাম, তুমি মনে কর

না, তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মেনেছো বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো, তবে একটী কথা আছে, কিন্তু মানুষ কি করবে, তিনিই মানাবেন! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়কুটো!

ডাক্তার। তুমি কি মনে করেছো, অমুক মাড় তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মানবো? অমুক মাড়কে আমি কি মানি? একজন ক্যাওট্ মেনেছে বলে আমিও পায়ে পড়্বো? তবে তোমায় সম্মান করি বটে, তোমায় Regard করি মানুষকে যেমন regard করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "আমি কি মানতে বলেছি?

গিরীশ ঘোষ। উনি কি আপনাকে মানতে বলেছেন?

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) তুমি কি বলছো, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে আর কি বলছি! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি করবে? অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বল্লেন, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না, জ্ঞাতিবধ করা আমার কর্ম্ম নয়। কৃষ্ণ বল্লে, অর্জ্জুন! তোমায় যুদ্ধ করতেই হবে। কৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই সব লোক মরে রয়েছে। "শিখরা ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিল--তাদের মতে অশ্বত্থ গাছে যে পাতা নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর মত বই একটী পাতা ও নড়বার যো নাই।

[Liberty or Necessity; Free will or God's will]

ডাক্তার। যদি সব ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলাচ্চেন তাই বলি! আমি যন্ত্র--তিনি যন্ত্রী।

ডাক্তার। যন্ত্র তো বোলছো, হয় তাই বলো, নয় চুপ করে থাক, সবই ঈশ্বর।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশাই যা মনে করেন করুন; কিন্তু তিনি যা করান্ তাই করি—a single step against the Almighty will কেউ যেতে পারে?

Influence of motives

ডাক্তার। Free will তিনিই দিয়েছেন ত আমি মনে করলে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারি, আবার না করলে না করতে পারি।

গিরীশ। আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সৎকাজ ভাল লাগে বলে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়?

ডাক্তার। কেন, আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে করি——

গিরীশ। সেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করতে ভাল লাগে বলে।

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) মনে কর, একটী ছেলে পুড়ে যাচ্চে, তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্ত্তব্য বোধ——

গিরীশ। ছেলেটীকে বাঁচাতে আপনার আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান, আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া (সকলের হাস্য)।

(জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্ম চোদনা?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম করতে গেলে আগে একটী বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিষটী মনে করে আনন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়।

মাটীর নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই, ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তার পর খোঁড়ে। 'খুড়তে খুড়তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তার পর

যখন ঘড়ার কান্দা দেখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকমে ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুর বাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখেছি সাধু গাঁজা তয়ের কর্‌ছে, আর সাজতে সাজতে আনন্দ।

ডাক্তার! কিন্তু আগুন heat (উত্তাপ) ও দেয়, আর light (আলো) ও দেয়। আলোতে দেখা যায় বটে, কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়।

Duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) করতে গেলে কেবল যে আনন্দ হয় তা নয়, কষ্ট ও আছে।

মাষ্টার। (গিরীশের প্রতি) পেটে খেলে পিঠে সয়। কষ্টেতে ও আনন্দ।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়! duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) শুষ্ক।

ডাক্তার। কেন?

গিরীশ। তবে সরা (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার। বেশ। এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়লো।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) সরম নচেৎ duty কেন করেন?

ডাক্তার। এই রূপ মনের inclination (মনের ঐ দিকে গতি)।

মাষ্টার। (গিরীশের প্রতি) পোড়া স্বভাবে টানে। (হাস্য) যদি inclinationই হলো, তবে free will কোথায়?

ডাক্তার। আমি free (স্বাধীন) একে বারে বলছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে; দড়ি যতদূর যায়, তার ভিতর free দড়ি টান পড়লে আবার—

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free will)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই উপমা যদু মল্লিকও বলে ছিল। (ছোট নরেনের প্রতি) এ কি ইংরাজিতে আছে?

(ডাক্তারের প্রতি) দেখ, ঈশ্বর সব করেছেন, তিনি যন্ত্রী। আমি যন্ত্র। এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে তো জীবন্মুক্ত। 'তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কি রকম জানো? বেদান্তের একটা উপমা আছে—একটা হাড়ীতে ভাত চড়িয়েছো, আলু; বেগুণ সব ভাতে দিয়েছ, খানিক পরে আলু, বেগুণ, চাল সব লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে, আমি নড়ছি আমি লাফাচ্চি। ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে আলু, পটল, বেগুণ ওরা বুঝি জীবন্ত, তাই লাফাচ্চে। যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, পটল, বেগুণ এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্চে না, হাঁড়ীর নীচে আগুণ জ্বল্‌ছে তাই ওরা লাফাচ্চে। যদি কাট টেনে লওয়া যায় তাহলে আর নড়ে না। জীবের আমি কর্ত্তা, এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান; জ্বলন্ত কাট টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল নাচের পুতুল, বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়ে চড়ে না। "যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্ত্তা এই ভুল থাকবে, ততক্ষণ আমি সৎকাজ করেছি, আমি অসৎকাজ করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাকিবেই থাকিবে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যা মায়া আশ্রয় করলে, সৎপথ ধরলে তাঁরে লাভ করা যায়। তাঁকে যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হয়ে যেতে পারে। 'তিনি একমাত্র

কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত। একথা আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) Free will কেমন করে আপনি জানলেন?

ডাক্তার। Reason (বিচার) এর দ্বারা নয়—I feel it

গিরীশ। Then I and others feel it to be the reverse আমরা সকলে ঠিক উলটা বোধ করি, আমরা বোধ করি যে, আমরা পরতন্ত্র (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার। Duty ভিতর দুটো element আছে,—(১) Duty বলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করতে যাই (২) পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু Initial stage এ (গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না। ছেলে বেলায় দেখতুম, পুরু'ত, সন্দেশে পিপড়ে হলে বড় ভাবিত হতো। পুরু'তের প্রথমেই সন্দেশ চিন্তা করে আনন্দ হয় না—প্রথমে বড় ভাবনা।

মাষ্টার। (স্বগত) পরে আনন্দ হয়, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে করে আনন্দ হয়, বলা বড় কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য্য হলে free will কোথায় থাকে?

(অহৈতুকী ভক্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ! ইনি (ডাক্তার) যা বলছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না কোন প্রয়োজন নাই, তবু মহেন্দ্র সরকারকে দেখতে বড় ভাল লাগে—তারই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয়, তা কি করবো? অহল্যা বলেছিলেন, হে রাম! যদি শূকর যোনিতে জন্ম হয়, তবেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে আমি আর কিছু চাই না। নারদ রাবন বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে

গিয়াছিলেন। তিনি সীতারামদর্শন করে স্তব করতে লাগ্‌লেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন, নারদ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কিছু বর লও, নারদ বল্লে 'রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বল্লেন, আর কিছু বর লও। নারদ বল্লেন, 'আর কিছুই চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি।

"এঁর তাই। যেমন ঈশ্বরে শুধু দেখতে চায়, আর কিছু—ধন, মান, দেহ সুখ—চায় না। তার নাম শুদ্ধ ভক্তি।

"আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) বলেছিল---যখন আমি তার বাড়ীতে প্রায় যেতুম---তুমি এখানে এস, অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও---ঐ টুকু আনন্দ আছে।

"তবে ওর উপর আর একটা অবস্থা আছে। বালকের মত যাচ্ছে, কোন ঠিক নাই, হয়ত একটা জড়িয়ে ধরছে।

শ্রীরাম কৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) তাঁ ডাক্তারের মনের ভাব কি বুঝেছ? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর আমায় সৎ ইচ্ছা দাও যেন অসৎ কাজে মতি না হয়।

"আমারও ঐ অবস্থাছিল। একে দাস্য বলে। আমি মা মা বলে এমন কাঁদতুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেত। আমার এই অবস্থার পর, আমাকে পিতার জন্য আর আমার পাগলামি সারাবার জন্য তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল, সুন্দর চোক ভাষা। আমি মা মা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বল্লুম, 'দাদা দেখবে এস ঘরে কে এসেছে।' হলধারীকে আর সব লোককে বলে দিলুম। এই অবস্থায় মা মা বলে কাঁদতুম, কেঁদে কেঁদে বলতুম, মা রক্ষা কর,

মা! আমায় নিখোদ কর, মা-যেন সৎ থেকে অসৎএ মন না যায়। (ডাক্তারের প্রতি)। তোমার এ ভাব ত বেশ-ঠিক ভক্তি ভাব। দাস ভাব।

(জগতের উপকার বা কর্ম্মত্যাগ ?)

শ্রীরাম কৃষ্ণ। যদি কারো শুদ্ধ সত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছু ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ব গুণ পায়। কামনা শূন্য হয়ে কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিলে শেষে শুদ্ধ সত্ব লাভ হয়। রজো মিশান সত্ব গুণ থাকিলে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার করলে, এই অভিমান এসে জোটে, জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে করতে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্য কামনা শূন্য হয়ে কর্ম্ম করে তাতে দোষ নাই—নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম করতে চেষ্টা করা খুব ভাল। সকলেরই কর্ম্ম করিতে হবে; দুই একটা লোক কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে। দুই একজন লোকের শুদ্ধ সত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম্ম করতে করতে রজো মিশান সত্ব গুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ব হয়ে দাঁড়ায়। শুদ্ধ সত্ব হলেই ঈশ্বর লাভ হয়। সাধারণ লোকে এই শুদ্ধ সত্বের অবস্থা বুঝিতে পারে না; হেম আমায় বলেছিল, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, জগতে মান লাভ করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য। কেমন'

বর্ষশেষে নববর্ষে।

অদ্য চড়ক সংক্রান্তি। বিজন গ্রাম্যপথগুলি প্রতিধ্বনিত ও কুলায়স্থিত পক্ষীবৃন্দের বিশ্রব্ধারবে ভঙ্গ করিয়া প্রত্যুষকাল হইতেই বাদকের দল ঢকা-নিনাদে চতুর্দ্দিক কম্পিত ও গৃহস্থের শান্তিভঙ্গ করিতেছে। কিন্তু ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কারণ সকলেই জানে আজ বর্ষশেষ সুতরাং একটা বিশেষ পর্ব্বদিন, এবং পর্ব্বোপলক্ষে ঢকা নিনাদ চিরপ্রসিদ্ধ।

প্রভাত হইতেই গৃহস্থরমণীগণ ব্যস্ত। কেহ বা ঘর লেপিতেছে. কেহ বাসন মাজিতেছে, কেহ আঙ্গিনা ঝাঁট দিতেছে। আজ রান্নাঘর উত্তমরূপ নিকাইয়া সমস্ত পুরাতন ব্যবহৃত হাঁড়ি কুঁড়ি বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদের স্থান নূতনে পূর্ণ করিতে হইবে, এজন্য কুম্ভকারের উপর পূর্ব্বেই বরাত ছিল, সে আসিয়া যাহার যেকয়টা হাঁড়ি দরকার রাখিয়া যাইতেছে। কাহার কতটুকু দধি, ক্ষীর লাগিবে. গোয়ালা পূর্ব্বেই, তাহার সংবাদ লইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ঘোষনন্দন ও উষার

রক্তিম রাগের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ নয়নাভিরাম রসনা তৃপ্তিকর উপাদেয় গব্যে ঝাঁকা পূর্ণকরতঃ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কোন বাড়ীতে আদেশানুরূপ ভাঁড় কয়টি নাবাইয়া দিলেই গৃহিণী আসিয়া একটু দধি লইয়া পরিক্ষা করিয়া বলিতেছেন, এত দই নয়, শুধু জল। এবং ক্ষীরের ভাঁড় হইতে অঙ্গুলি সংযোগে কিঞ্চিৎ ক্ষীর তুলিয়া লইয়া নাসিকার নিকট আনয়ন পূর্ব্বক নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতেছেন 'ক্ষীর টানা।' গোপনন্দন এরূপ মন্তব্যে অভ্যস্ত, এবং অদ্যকার মালের জন্য সে যে মূল্য দাবী করিবে তাহাও তাহার ঠিক ছিল, সুতরাং কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা, না করিয়া সে নিঃশব্দ পাদ বিক্ষেপে প্রশান্তবদনে অবিক্ষিপ্ত চিত্তে অন্য বাড়ীতে প্রস্থান করিতেছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল, সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নগগণে আরোহণ করিলেন। বাড়ীর পুরুষগণ নিম প্রভৃতি অষ্টতিক্ত সংযোগে স্নান করিয়া আসিল, এবং প্রত্যেকে গলদেশে উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক এক মুষ্টী ছাতু ও একমুষ্ঠী ছাই লইয়া গৃহপার্শ্বস্থ চতুষ্পথের মোড়ে দাঁড়াইয়া নতশির হইয়া দুই পায়ের মধ্য দিয়া তাহা উড়াইয়া দিল। ইহা এতদ্দেশের একটি সনাতন প্রথা, ইহা শাস্ত্রানুমোদিত অথবা ইহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। পরে আহারের পালা। অদ্য প্রত্যেক গৃহস্থই সাধ্যানুসারে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছে, সুতরাং আহারটি যে কিছু গুরুতর হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। পুরুষদিগের আহারাদী শেষ হইয়া গেলে রমণীগণ এক হস্তে উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র ও অপরহস্তে কাপড়গামছা লইয়া গজেন্দ্রগমনে পুষ্করিণী পথাভিমুখী হইলেন

সকলে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক দ্বি প্রহরিক তন্দ্রামগ্ন, বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে মধ্যে মধ্যে দুই একটা কোকিল কু-উ কু-উ রবে কুলবধুর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, অথবা একটা চিল তীব্র আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিয়া মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে, এমন সময় পুনরায় সেই ঢক্কানিনাদে দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। গৃহস্থ নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন একদল বাদ্যকর ও মসীমণ্ডিত লোলজিহ্বা করধৃত করবাল চিত্রিত মুণ্ডমালাধারী অনাবৃতদেহ বিরল বসন আলুলায়িতকেশ কিঙ্কিনীবলয় নুপুরসজ্জিত এক অদ্ভুত জীব গৃহপ্রাঙ্গণে নৃত্যায়মান একব্যক্তি থালাহস্তে তাহাদের সঙ্গে, এবং একপাল গ্রাম্যবালক

তাহাদিগকে ঘেরিয়া সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, 'কালিকাচ' নৃত্য আরম্ভ হইল। ভবাণী যে রণরঙ্গিনী চণ্ডীবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরদলন করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই অভিনয়। নর্ত্তক নানারূপ অঙ্গভঙ্গি সহকারে দর্শকবৃন্দকে দেখাইতে লাগিল কিরূপে চণ্ডী দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে, অধোভাগে অসুর বিনাশ করিয়া শোণিত প্রবাহে উন্মত্ত হইয়া বিকট তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন। সকলেই যে এই নৃত্যের সহিত পুরাণের সেই চণ্ডীর অসুর নিপাতকালীন নৃত্যের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে তাহা নহে। অধিকাংশই বুঝিতেছে না চৈত্র সংক্রান্তিতে 'কালিকাচ' নৃত্যের সার্থকতা কি। তথাপি তাহারা নৃত্যদর্শনে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে, কারণ কোন প্রকার ঐতিহাসিক গবেষণাকাঙ্ক্ষা বা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসা কস্মিন্‌কালেও তাহাদের সরল মস্তিষ্ক আলোড়িত করে নাই। নাচ শেষ হইয়া গেলে থালা হস্তে ব্যক্তিটি কর্ত্তার নিকটে আসিয়া থালা খানি ধরিতেছে, কর্ত্তা তদুপরি যথাসাধ্য দক্ষিণাস্থাপন করিলে নৃত্যকারী সদলবলে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেছে।

পূর্ব্বে গ্রামে চড়কতলা ছিল, চড়ক গাছে গ্রামের অনেক মাতব্বর ব্যক্তি ঘূর্ণায়মান হইয়া বাল্যকালে আমাদের বিস্ময় ও হর্ষোৎপাদন করিয়াছে, তদুপলক্ষে সংসাজা, নৃত্যগীত, পুতুল নাচ প্রভৃতি অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদে গ্রামখানি উজ্জল ও হাস্য মুখরিত হইয়া উঠিত,—এখন আর সে সব নাই চড়ক-বৃক্ষ সম্বন্ধে কত গভীর রহস্য পূর্ণ স্বপ্নময় উপাখ্যান (তখন তাহা ঐতিহাসিক সত্যরূপেই প্রতীয়মান হইত) আমাদের শৈশব কল্পনার ভীতি সঞ্চার করিয়াছে, চড়ক-বৃক্ষে ঘূর্ণায়মান ও 'কালিকাচ' নৃত্যকারী ব্যক্তিদিগের বিশেষরূপ দেবানুগৃহীত হওয়ার সম্বন্ধেই বা কত রোমাঞ্চকর গল্প পরম আগ্রহভরে সোৎসুকচিত্তে শ্রবণ করিয়াছি—এখন আর তাহাতে আস্থা নাই। প্রতীচ্য সভ্যতালোক এখন গ্রামেও প্রবেশ করিতেছে, তাহার ফলে আমাদের পুরাতন আমোদ প্রমোদ ও রীতি নীতিগুলি একে একে লোপ পাইতেছে। জানি না, ইহাতে আমাদের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে।

ক্রমে গোধূলি সমাগত। সকলে সকাল সকাল আহার সমাপনে ব্যস্ত, কারণ গ্রামের বাড়ুয্যে বাড়ী আজ 'কবি' হইবে বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ সকলেই অবশ্য তাহা শুনিতে যাইবে। বাড়ুয্যেরা খুব বড়লোক, দুইদল কবি বায়না করিয়াছে

একদল পুরুষের ও একদল মেয়েলোকের, দুইদলে খুব একটা 'পাল্লা' হইবে সকলেই তৎশ্রবনে উৎসুক। কবি শুনিতে মুসলমানের বড় আগ্রহ,—অবশ্য রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণাদি সম্পর্কীয় যে সকল বর্ণনা, গান বা উত্তর প্রত্যুত্তরাদি হয় তাহা শুনিতে নহে, কিন্তু নিশিশেষে যখন আসরে ভদ্রলোকের সংখ্যা কমিয়া আইসে ও চিকের আড়ালের চন্দ্রবদনগুলি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়; তখন দুইদলের পুরুষ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে সকল বেদ, বাইবেল, কোরাণ বহির্ভূত ছড়া পাঁচালী কাটাকাটী হয়, তাহা শুনিবার জন্য। সুতরাং বাড়ীঘোবাড়ী মুসলমানের দল খুব ঝুঁকিয়াছে। ঝাড় লণ্ঠনের আলোকে আসর উদ্ভাসিত, নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে বহু ভদ্র ও ইতর লোকের সমাগম হইয়াছে, বাড়ীর কর্ত্তা স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সকলকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতেছেন,—যেন কাহারও যত্নের ত্রুটীতে তাঁহার দুর্নাম না হয়। নাটমন্দিরের চতুর্দ্দিকে পানের দোকান সাজিয়াছে; কতকগুলি লোক ইক্ষু বেচিতে বসিয়াছে, ইতর লোকের মধ্যে তাহার কাট্‌তি খুব, ইক্ষুর ছোব্‌ড়াতে শীঘ্রই বাঁড়ুয্যেদের বহির্বাটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কবিওয়ালাদের চীৎকারে, ঢাক ঢোল কাসির শব্দে পর্দ্দান্তরালে মাতৃক্রোড়ে শিশুর ক্রন্দনে নাটমন্দির মুখরিত, যে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত লইয়া সম্প্রতি দুই দলে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, মুসলমান শ্রোতাগণও চিকের আড়ালে বিধুমুখীগণ তাহার এক বর্ণও বুঝিতেছে না, তথাপি একটা কিছু হইতেছে ভাবিয়া সকলেই মহাখুসী। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, ভদ্রলোকগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন, প্রতিবেশী রমণীগণও ঢুলু ঢুলু নেত্রে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন আসরে মুসলমান ও বাড়ীর কর্ম্মচারীগণ ব্যতীত বড় একটা কেহ রহিল না,—শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে 'লাল' গাওয়ার জন্য ঘন ঘন ফরমাইস হইতে লাগিল, আমরাও তাহাদিগকে একাতপত্র প্রভুত্ব করিতে রাখিয়া দিয়া আসর হইতে গাত্রোত্থান করিলাম।

এইরূপ আড়ম্বর শূন্য সরল আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়া বৈচিত্র বিহীন গ্রাম্য জীবনের একটী সুদীর্ঘ বৎসর অতীত হইয়া গেল। আজ নববর্ষ। গ্রামের সন্নিকটে সেরাজাবাদ নামে একটী হাট আছে, অদ্য সেখানে মেলা। চতুর্দ্দিকের পাঁচ ছয় মাইল পরিধির মধ্যে যত গ্রাম আছে, তাহার অধিকাংশ লোক আজ এই মেলাভিমুখী। উষার মৃদু আলোকে প্রভাতী বায়ুর হিল্লোলে

বিহগের মধুর কুজনে মনঃপ্রাণ পরিতৃপ্ত করিতে করিতে যাত্রীর দল বিচিত্র বেশে বিভূষিত হইয়া মেলার দিকে চলিয়াছে। বালকের দল নীলবাস পরিধান করিয়া কোমরে ছাপযুক্ত রঙ্গিন রুমাল জড়াইয়া। বালিকাগণ নানাবর্ণ সাড়ীতে দেহ মণ্ডিত করিয়া স্ব স্ব পিতা মাতা বা ভ্রাতার হস্ত ধারণ করিয়া চলিয়াছে। বয়স্কগণ প্রায় সকলেরই মাথায় ছাতি, কোমরে চাদর, পায়ে চটিজুতা অথবা নগ্নপদ। মেলায় যাইতে পথে একটা সেকেলে পরিত্যক্ত নীলকুঠি আছে, তাহার সম্মুখে তিন চারিটি প্রকাণ্ড লিচু বৃক্ষ, যদিও এখন লিচু পাকে নাই তথাপি একদল রাখাল বালক এক এক খণ্ড লাঠি হস্তে তাহার তলে দাঁড়াইয়া শিশ্ ফেলিতেছে ও গুণ্ গুণ্ স্বরে গান গাহিতেছে এবং এক একবার সতৃষ্ণ নয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের আগ্রহ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে গাছের লিচু ভাল করিয়া পাকিবার অবসর পায় না। মেলার কিঞ্চিত দূর হইতেই বহুলোক সমাগম জনিত একটি ঘনীভূত কোলাহল শ্রুত হইতেছে। যাত্রীর দল যতই অগ্রসর হইতেছে, শব্দ ততই স্পষ্টতর আকার ধারণ করিতেছে। হাটের উপরে কয়েক খানি চালা ও কয়েকটি প্রকাণ্ড বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া মেলা বসিয়াছে। কোন স্থানে খেল্‌না ও পুতুল বিক্রয় হইতেছে, কোথায়ও বা গুড়, বাতাসা, জিলিপি, মুড়ি, মুড়কী প্রভৃতি মিষ্টান্নের দোকান, একদিকে হাঁড়ি, পাতিল প্রভৃতি মৃন্ময় সামগ্রী সজ্জিত, অপর দিকে ফুটি, বাঙ্গি, তরমুজ, ইক্ষু, ক্ষীরাই প্রভৃতি সময়োচিত ফল মূলের সারি, আবার দুই তিন খানি চালায় সামান্য রকমের মনোহারী দোকান, তাহাতে টিনের কৌটা, বাক্স, আয়না, চিরুণি, ঘুন্‌সি, সাবান, গজাল, স্ক্রু, কড়াই, শিকল প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে। খান দুই কাপড় ও পোষাকের দোকান এবং একটি জুতার দোকানও মেলার এক পার্শ্বে শোভা পাইতেছে। মিঠাই দোকানের সম্মুখস্থ বটবৃক্ষে এক ঝাঁক কাক বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে মিঠাইগুলির মাধুরী পর্য্যালোচনা করিতেছে, এবং যাত্রীদের ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া বৃক্ষতলে একদল কুক্কুর কলহ করিয়া মেলাটিকে আরও সরগরম করিয়া তুলিতেছে। প্রত্যেক দোকানের সম্মুখেই লোকের ভিড়, কিন্তু তাহার মধ্যেই জমিদারের পিয়াদা অক্লেশে 'তোলা' আদায় করিয়া বেড়াইতেছে। হাটের এক পার্শ্বেই জমিদারের কাছারি, নায়েব মহাশয় সেখানে সশরীরে বর্ত্তমান, যদি কেহ 'তোলা'

দিতে আপত্তি করে বা কলহ করিয়া মেলার সুশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তাহা হইলে অমনি তিন চারি জন পাইক তাহাকে ধরিয়া নায়েব মহাশয়ের নিকট লইয়া আসে। প্রভু তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রোষ কষায়িত নেত্রে কৃতান্তের সহোদরের ন্যায় হুঙ্কার শব্দে আজ্ঞা করেন—'উহাকে পাঁচ জুতি লাগাও,' বলা বাহুল্য হুকুম মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই তামিল হইয়া যায়।

ক্রমে বেলা চড়িতে থাকে এবং মাধ্যাহ্নিক স্নানাহারের জন্য কিয়ৎ কাল মেলা একটু শান্তভাব ধারণ করে। অনেক যাত্রী তখন আবশ্যকীয় সওদা পত্র কাপড়ে বা চাদরে বাঁধিয়া কাঁধে ফেলিয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করে, আবার কতক ঐ স্থানে স্নানের নিমিত্ত থাকিয়া যায়। হাটের পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত, তাহার চলিত নাম 'সেরাজাবাদের নদী', পূর্ব্বে ঐ নদী প্রবল পরাক্রান্ত মেঘনার সহিত এক ছিল, এখন মধ্যে এক সুবিস্তীর্ণ চর পড়িয়া উহা মেঘনার একটি ক্ষুদ্র শাখারূপে পরিণত হইয়াছে। সরল বিশ্বাসী গ্রাম্য লোকের ধারণা উহাতে স্নান করিলে গঙ্গা স্নানের ফল হয়, এবং কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এ অঞ্চলের যে সকল লোক কলিকাতা গিয়া গঙ্গা স্নানে অশক্ত, তাহারা এই স্থানে স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের আশা করে। এ হেন যাত্রীর দল অদ্য নববৎসরান্তে গঙ্গা স্নানে প্রভূত মঙ্গল আশায় ঐ স্বল্প তোয়া নদীর পঙ্কিল জলে অবগাহন পূর্ব্বক পরম প্রীতিলাভ করিতেছেও স্নানান্তে কোন বৃক্ষতলে কয়েকখানি বাতাসা সংযোগে এক গ্লাস জল পান বা একটি ফুটি কি তরমুজ ভক্ষণ করিয়া সূর্য্যদেবের উত্তাপ কিছু প্রশমিত হইলে বাড়ীর দিকে রওনা হইতেছে। এইরূপে সারাদিন ক্রয় বিক্রয় হইলে সন্ধ্যাকালে মেলা ভঙ্গ হয়, তখন দোকানী পসারীগণ যে যাহার দোকান পাঠ তুলিয়া লাভালাভ হিসাব করিতে করিতে একে একে গৃহাভিমুখে যাত্রা করে।

এদিকে সন্ধ্যাসমাগমের অনেক পূর্ব্বেই নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে কয়েকটি হরি সংকীর্ত্তনের দল বাহির হইয়াছে। কীর্ত্তনওয়ালাদের গলায় ফুলের মালা, অনেকের পরিধান গৈরিক বসন, এবং সঙ্গে খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, সিঙ্গা প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র। প্রথমতঃ তাহারা স্ব স্ব গ্রামে ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, যাহার যাহা সাধ্য সে তাহা দিয়াই লুট দিয়াছে। কেহ বাতাসা, কেহ ক্ষীরাই ও বাঙ্গি প্রভৃতি ফল মূল দিয়া থালা পূর্ণ করিয়া উঠানে রাখিয়াছে,

সংকীর্ত্তনের দল হরি নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া সেই থালা খানি তুলিয়া লইয়া বাতাসা ক্ষীরাই প্রভৃতি সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিতেছে ও গান করিতেছে 'হরির লুট নিবি কে লুটে নে, নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে,'—গৃহ কর্ত্তার জন্যও দয়া করিয়া কিছু লুটের প্রসাদ রাখিয়া যাইতেছে। এইরূপে সংকীর্ত্তনের দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া মেলাস্থানে একত্রিত হইয়াছে, এবং সমবেত স্বরে গান ধরিয়াছে। খোল করতালের শব্দে এবং গায়কদিগের তীব্র কণ্ঠনিনাদে কর্ণে তালি লাগিবার উপক্রম, তথাপি তাহাদের বিরাম নাই, বরং তাহাদের আগ্রহ ও উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে; ভক্তিরসে মাতোয়ারা হইয়া কয়েক জনের 'দশা' হইয়াছে। সকলেই প্রীতিবিহ্বল হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে এবং সমস্ত স্থানটি যেন প্রেমে সজীব ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

তখন প্রদোষ সমাগত, সান্ধ্যগগণে দু'একটী নক্ষত্র দেখা দিয়াছে কিন্তু উত্তর পূর্ব্বকোণে একখণ্ড গাঢ় নীলবর্ণ মেঘ ক্রমেই বর্দ্ধমান আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে ক্রমাগত বিদ্যুৎ বিস্ফরিত হইতেছে। বায়ু স্তম্ভিত, গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না, পক্ষীগণ নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে; নিকটে সংকীর্ত্তনের ও ভেকের মক্ মক্ শব্দ এবং দূরে থাকিয়া থাকিয়া ফেরুপালের চীৎকার ও গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনশীল গাভীর হাম্বারব ব্যতীত আর কিছু শ্রুত হইতেছে না। শীঘ্রই ঝড় আসিবে বুঝিতে পারিয়া সংকীর্ত্তনের দলগুলি স্ব স্ব গ্রামের দিকে ফিরিয়াছে, দোকানীরা দোকান পাট বন্ধ করিতে মনোনিবেশ করিয়াছে; আমরাও নববর্ষের আমোদ প্রমোদ সঙ্গে করিয়া সম্মুখে বিপদ গণিয়া দ্রুতপদ বিক্ষেপে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছি। তখন নায়েবের কাছারীতে এক বৈরাগী তাহার বৈষ্ণবীর সহিত গলা মিশাইয়া সারেঙ্গের তানে কত বিগত সুখস্বপ্নের সুমধুর স্মৃতি বিমথিত করিয়া হৃদয়ের নিভৃত কোণে কোন অজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট অভাব ও বিষাদের সুর জাগাইয়া দিয়া গাহিতেছিল ঃ—

পূবাকাশে মেঘ ঢেকেছে দেখলো সজনি !
মাঝে মাঝে ঝলুক কেমন দিচ্ছে সৌদামিনী !

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখন আবার বলিতেছি—সনাতন প্রাচীন দীক্ষা-রীতির অভাবে এবং অধুনাতন নবীন শিক্ষানীতির প্রভাবে এখনকার দিনে জড় জগতের বস্তু বিষয় লইয়া যেরূপ আলোচনা, বিবেচনা, আন্দোলন, আস্ফালন, অনুষ্ঠান, অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, অনুশোচনা ও অনুশীলন দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যময় অন্তর্জগতের তত্ত্ব জানিতে শুনিতে খুঁজিতে বুঝিতে তাহার কোনরূপ অস্পষ্ট লক্ষণ ও পরিলক্ষিত হয় না। এই জন্য আমরা দিব্যজ্ঞান ও দিব্য দর্শনের বিষয় লইয়া একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিলাম ?

ভারতীয় ঋষিগণ সুচারুরূপে সূক্ষ্মদর্শী, দৃঢ়ভাবে দূরদর্শী, অদ্ভুত প্রকারে অন্তর্দর্শী এবং প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রকৃতিদর্শী ছিলেন আমাদের মত ক্ষীণদৃষ্টি ও হীনশক্তি মানবের দ্বারা তাঁহাদের অলৌকিক দৃষ্টিশক্তির প্রকৃত তথ্য পরিগৃহীত হওয়া দূরে থাকুক, ঐ তথ্য ভাবিতে গেলেও আমাদিগকে বিস্মিত, চকিত এমন কি স্তম্ভিত হইতে হয় !

ঋষিগণ যে উদ্দেশ্যে যে ছন্দো দ্বারা যে দেবতানুপ্রাণিত হইয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাই সেই ছন্দে সেই দেবতার নামে সেই ঋষি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত বলিয়া বেদমন্ত্র আখ্যায় অভিহিত।

আমরা যেমন সময় সময় আপদ বিপদের ও ভয় ভাবনার তাড়নায় পীড়িত হইয়া মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলি, মানুষ ঋষিগণও তেমনই আপনাদের সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, আশা আশঙ্কা ভক্তি ভাবনা ও প্রেম প্রার্থনা পরিজ্ঞাপন করিবার জন্য বেদ মন্ত্রের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের প্রবল প্রভাবে পরিচালিত হইয়াই আমরা ঋষিদের যোগ প্রভাব, দিব্য দর্শন ক্ষমতা বুঝিতে পারি না এবং সেই জন্যই বেদের

অপৌরুষেয়ত্ব লইয়া অশেষ প্রকারে গোলযোগ উপস্থাপিত করিয়া বিতর্ক বিকাশ চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ ও বিতণ্ডা ব্যাপারে বিড়ম্বনা ভোগ করি। বিতর্কের উপর বিতণ্ডার প্রতি কাহারও কোনই হাত নাই। স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিয়া বিশ্বাস ভক্তির ন্যূনাধিক্য প্রদর্শন করিতেও কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারেনা। বৌদ্ধ পর্ব্বকে প্রভৃতি নাস্তিক নামধারী দর্শনকারগণ বেদমন্ত্রে অবিশ্বাস করিয়া তাহার নিত্যত্ব অস্বীকার ও ভ্রান্তি প্রদর্শন মানসে নানারূপে মন্ত্র সকলের অসদর্থ করিতে সাহসী হইয়া বেদের প্রতি লোক সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা লাঘবের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মহীধর দুর্গাচার্য্য প্রভৃতি অনেক টীকাকারের ভাষ্যেই তাহার প্রমাণ অনুসন্ধানে দেখিতে পাওয়া যায়।

অল্প শক্তি বিশিষ্ট মানবও যোগবলে কি প্রকারে প্রবল শক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত একটী সামান্য দৃষ্টান্ত সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে; আমরা সেই দৃষ্টান্তটী এই সুযোগে ব্যবহার করিলাম। মনে কর :—বৃহদায়তন বিশিষ্টা প্রবল প্রবাহশালিনী একটী তরঙ্গিনীর নিকট একটী অতি অল্প পরিসর খাল আছে, এবং নদীও খালের মধ্যে সামান্য ব্যবধান স্থলে অতি সংকীর্ণ ক্ষুদ্র অল্পোচ্চ এক খণ্ড ভূমিও আছে। গ্রীষ্মকালে নদী জলের স্বাভাবিক সবলতা নিবন্ধন উক্ত ভূমিখণ্ড বিশুষ্কহইয়া থাকায় খালের জলশ্রোত নদী প্রবাহ হইতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; সে সময় একখানি ক্ষুদ্র তরণী ও খাল হইতে নদীতে বা নদী হইতে খালে যাইতে আসিতে পারে না। বলিতে কি নদী ও খাল যেন প্রকৃতই দুইটী বিভিন্ন জল প্রবাহের আধার বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রাবৃটকালীন বারিবাহের প্রচুর বর্ষণে যখন স্রোতস্বতীর সলিল রাশি প্রবল প্রবাহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং উক্ত উচ্চ ভূমি খণ্ডকে পরিপ্লাবিত করিয়া নদী ও খালকে একাকারে পরিণত করে তখন সুবৃহৎ তরণী ও অনায়াসে নদী ও খাল উভয়ের মধ্যে গতিবিধি করিতে পারে ও করিয়া ও থাকে। মানবীয় শক্তি বিশিষ্ট আর্য্য ঋষিগণ সংযম নিয়ম পরায়ণ হইয়া যখন তপশ্চর্য্যা ও যোগ কার্য্যে নিরত হইয়া থাকেন তখন যোগ প্রভাবে দৈবশক্তির আনুকূল্যে ঐশী ক্ষমতার সাহায্যে তাঁহারা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ও অদ্ভুত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সে সময় তাঁহারা দিব্য জ্ঞান ও দিব্য দর্শন লাভ

করেন। সুতরাং তদবস্থা সম্পন্ন হইলে তাঁহাদের নিকট কিছুই অবিদিত, কিছুই অলক্ষিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। প্লাবটকালে যেমন নদী ও খালের পার্থক্য বোধ থাকেনা তপশ্চর্য্যার সময়ে, যোগযুক্ত কালে সেই রূপ ব্রহ্ম ধ্যান পরায়ণ যোগিগণ ব্রহ্ম সামীপ্য লাভে বঞ্চিত হয়েন না। যোগ বলে ঐশী শক্তি লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে আশ্চর্য্য বাক্য বিন্যাস ও অদ্ভুত কার্য্য সাধন যোগিগণের জীবনের নিত্য ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যোগের কথা অধিক করিয়া বলিতে গেলে অভিযোগের আশঙ্কা না থাকিলেও অনুযোগের বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইবার আশা নাই। যে দেশের যোগিগণ ও ঋষিগণ সর্ব্ব বিষয়ের নিয়ন্তা ছিলেন ও রহিয়াছেন, সেই দেশের লোকেরা এখন যোগ ও তপস্যাকে আলস্য নামে অভিহিত করিয়া থাকে, সুতরাং ঋষি বাক্য ও ঋষি কার্য্যের অমানুষী শক্তি আমরা কিরূপে অনুভব ও স্বীকার করিতে সক্ষম হইব। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে যোগের ক্ষীণরশ্মি দেখা দিয়াছে বলিয়া কত চীৎকার কত কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। Trance কি অদ্ভুত জিনিষ তাহা বুঝিতে আজিও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলী দর্শনের যুক্তি ও বিজ্ঞানের শক্তি প্রয়োগ করিয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছেন, কিন্তু বুঝাইবার নিমিত্ত সংযত রসনার সুচারুরূপ স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

এই যোগাবস্থার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে "ঋষয়োমন্ত্রদ্রষ্টারঃ" এই বাক্যের ভাবও বুঝিতে পারা যাইবে; আমরা এক্ষণে পৌরুষের বেদের বা অপৌরুষের শ্রুতির বিচার শেষ করিবার অভিপ্রায়ে বেদ কি ভাবে কিরূপে মানব সকলের হিত সাধনে উন্নতি বিধানে কার্য্যকর হইয়াছে অথবা তৎসম্বন্ধে সংহিতাকারগণ কি রূপ অভিমতি অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সংহিতাকারদিগের শীর্ষ স্থানীয়, অগ্রগণ্য ও প্রামাণ্য ঋষি ভগবান মনু। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা প্রজ্ঞাশীল বৃহস্পতি বলিয়াছেন।

বেদার্থোপ নিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থা বিপরীতা যা সা স্মৃতিঃ ন প্রশস্যতে॥

অর্থাৎ মনুর স্মৃতিই প্রধান কারণ ইহাতেই বেদের অর্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে মনুর সহিত যাহার অর্থ বিরোধ সে হয় স্মৃতি প্রশস্ত নয়।

বেদার্থ পরিজ্ঞাতা ভগবান মনু বেদকে অখিল ধর্ম্মের মূল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং সর্ব্বজাতীয় সর্ব্ব শ্রেণীর ও সর্ব্ববিধ মানবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন,

সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতি প্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥

অর্থাৎ শাস্ত্র সকলকে জ্ঞান নয়ন দ্বারা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ (পর্য্যালোচনা) করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম শ্রুতি প্রমাণে অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবেন।

পাঠক দেখিবেন জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা শাস্ত্র দর্শন ও পর্য্যালোচনার সারবত্তা মনু স্বীকার করিয়াছেন।

সংহিতার শেষ করিবার সময় ভগবান্ মনু, দ্বাদশাধ্যায়ে বলিতেছেন :—

পিতৃদেব মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
অশক্যঞ্চা প্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥ ৯৪

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন—

"ইদানীং বেদাদেব ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিতি প্রদর্শয়িতুঃ বেদপ্রশংসামাহ পিতৃদেবেতি। পিতৃদেব মনুষ্যাণাং হব্যকব্যান্নদানেষু বেদ এব চক্ষুরিব চক্ষুরনশ্বরং তৎ প্রমাণত্বাদসন্নিকৃষ্ট ফলকবাদাদৌ প্রমাণান্তরানবকাশাৎ। অশক্যঞ্চ বেদশাস্ত্রং কর্ত্তুমশক্যং অনেনা পৌরুষেয়তোক্তা। অপ্রমেয়তোক্তা। অপ্রমেয়ঞ্চ মীমাংসাদি ন্যায় নিরপেক্ষতয়া অনবগম্যমান প্রমেয়মেবং ব্যবস্থা। ততশ্চ মীমাংসয়া ব্যাকরণাদ্যঙ্গৈশ্চ কর্ম্ম ব্রহ্মাত্মকং বেদার্থং জানিয়াদীতি বিবক্ষিতঃ॥"

বেদই পিতৃগণ, দেবগণ ও মানবগণের সনাতন অবিনশ্বর নিত্যচক্ষুঃ স্বরূপ। এই বেদ অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয় এইটী সবিশেষ বুঝাইবার উদ্দ্যেশেই টীকাকার সবিচারে সদর্থ প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা নিজে না বলিয়া প্রামাণিক টীকাকারের অর্থই প্রদর্শন করিলাম। বেদ কি জন্য অপৌরুষেয় ও কেন অপ্রমেয় তাহাও দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। মনু সংহিতার প্রামাণিক ভাষ্যকার মেধাতিথিও এই শ্লোকের অর্থ বিবৃতি প্রসঙ্গে সুচারু বিচার

করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহার উদ্ধার করিলাম না। সনাতন শব্দের অর্থ বিশদরূপে বুঝাইতে গিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"সনাতনং শাশ্চতং নিত্যং অনেনা পুরুষ কৃতত্বাৎ।'

অর্থাৎ সনাতন বলাতেই অপৌরুষেয় বলা হইল। অগ্নিতে ভিজে, জলে পোড়ে এরূপ উক্তির প্রমাণ বা অসারতা বুঝাইতে যাওয়া কিরূপ বিড়ম্বনা তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই সহজে স্বীকার করিবেন—অতএব অনলের অদ্ভুত দাহিকা শক্তি আছে এবং সলিলের আশ্চর্য্য সেচনী শক্তি আছে একথার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। নিত্য সিদ্ধ সদ্যঃ প্রত্যক্ষ, সহজবোধ্য বিষয়ে অনর্থক বাক্য ব্যয়ের কোনই সার্থকতা নাই।

তারপরে মনু বলিয়াছেন :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়োলোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমা পৃথকং।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি।
শব্দস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসোগন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতি গুণ কর্ম্মতঃ॥
বিভর্ত্তি সর্ব্ব ভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনং।
তস্মাদেতৎ পরংমন্যে যজ্জন্তোরস্যসাধনং॥

* * *

বেদশাস্ত্রোর্থ তত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণোবরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ এবং স্বর্গাদি লোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় এই সমস্তই বেদ হইতে প্রসিদ্ধ। এবং ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা হইয়াছে, আছে বা হইবে সে সকলও নিয়ত বেদ সিদ্ধ বলিয়া জানিবে। বেদ ছাড়া কিছুই নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয় ও সত্ত্ব, রজস্তমো গুণ প্রযুক্ত বেদোক্ত কর্ম্ম সমূহ ও তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান এই সকল ব্যাপারই বেদ হইতে সঞ্জাত ও উৎপন্ন।

সনাতন বেদই সকলকে ধারণ পোষণ করে। বেদশাস্ত্রই সর্ব্বার্থ সাধনের মূলীভূত কারণ। জীবিত পুরুষের অন্য সাধন আর নাই। (অগ্নিতে আহুতি প্রদান, সূর্য্যোপাসনা, মেঘ সঞ্চয়, বৃষ্টিপাত, শস্যাদির উৎপত্তি, তাহা হইতে ভূত সকলের জন্মবৃদ্ধি পুষ্টি হইয়া থাকে। কল্লুক ভট্ট এরূপ ভাব ও অর্থের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।)

* * * *

যে ব্যক্তি যথাথরূপে বেদ, তদর্থ কর্ম্ম এবং ব্রহ্মাত্মক বেদ জানে সে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সহচরিত ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে অবস্থিত হইয়াই এই জন্মেই ব্রহ্মত্ব লাভের যোগ্য হইয়া থাকে।

অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা গ্রন্থাধ্যায়ী শ্রেষ্ঠ—গ্রন্থপাঠক অপেক্ষা গ্রন্থার্থ সংস্মর্ত্তা শ্রেষ্ঠ,—গ্রন্থার্থ সংস্মর্ত্তা অপেক্ষা গ্রন্থ মর্ম্ম পরিজ্ঞাতা শ্রেষ্ঠ,—গ্রন্থমর্ম্ম পরিজ্ঞাতা অপেক্ষা বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ॥

এখন ক্রমশঃ শ্রেষ্টতা পরম্পরা বুঝিয়া বেদের অর্থবোধে তদধিক তাহার সমালোচনে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

বেদার্থ বুঝিবার নিমিত্ত উপযুক্ত অধিকারীকে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ মনু অবিচলিত ভাবে মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন :—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদ শাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

অর্থাৎ ঋষি প্রোক্ত বেদশাস্ত্রে, উপদেশ পূর্ণ মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র অবিরোধি মীমাংসাদি তর্ক দ্বারা অনুসন্ধিৎসা পরায়ণ হইয়া বিচার করেন, তিনিই ধর্ম্মবেত্তা, অন্যে নহে॥

দর্শন পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রেও যে বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার অপৌরুষেয়ত্ব বিচারে আমরা আর অধিকআড়ম্বরসূচক তর্ক-বিতর্ক করিতে যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে চাই না। সরল ভাবে শাস্ত্র বিশ্বাসের জন্য যাহা বক্তব্য তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিনা। সহজ জ্ঞানে সরল বিশ্বাসে যাহাতে সত্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে তাহাই দেখাইতে ও জানাইতে আমরা প্রয়াসী নতুবা কূট তর্কের মীমাংসা বা দুরূহ তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিতে আমরা

সাহসী নই। যাঁহারা সেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছেন এবং তদুপযোগী কার্য্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া ও বদ্ধপরিকর হইয়া সমর প্রাঙ্গনে অগ্রসর হইতে উদ্যত, তাঁহাদিগকে আমরা দীন ভাবে ঐ সুদূরস্থিত যোগ রশ্মির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই অনুরোধ করি এবং স্থূল দৃষ্টিতে না দেখিয়া যৎকিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টির আশ্রয় করিতেও অনুরোধ করি। তবে আমাদের বিশ্বাস এই তর্ক যত কম হয় ততই মঙ্গল। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" এই প্রাচীন মহাজন বাক্য স্মরণ করিয়া সকল সময়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিতেন:—ওরে পদো আম বাগানের গাছ গুণে গুণে আম দেখে দেখে রোদে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেলি, মুখ শুকিয়ে গেছে, গায়ে ঘাম দিয়েছে, আর এই আম তলায় বসে ছায়ায় ঠাণ্ডা হয়ে দুটা সুপক্ক সুমিষ্ট সুস্বাদু (রসাল ফল) আম খা।"

নীরস শুষ্ক তর্কবাগীশের প্রতি তীব্র তিরস্কার করিবার উদ্দেশেই রাম কৃষ্ণের এই তীব্রোক্তি ব্যবহার। আমরাও বলি রসময়ের রস অনুভব করিবার জন্য রস বিচার যেমন নিষ্প্রয়োজন শুষ্ক তর্কের আশ্রয়ে তত্ত্ব বিচার করাও তেমনই অনাবশ্যক।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

মহরম পর্ব্ব।

একদা ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদ শিষ্য পরিবৃত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন সহসা স্বীয় বংশধরগণের দুরবস্থা তাঁহার মানস নেত্রে উদিত হইল। তাঁহার প্রসন্ন বদন অপূর্ব্ব বিষাদে সঙ্কুচিত হইল। শিষ্যগণ পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহারা মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম শিষ্য মাবিয়া আবার সাগ্রহে অনুরোধ করিলেন। মহম্মদ ঈষৎ বিচলিত হইয়া বলিলেন "তোমাদের মধ্যে কাহারও সন্তান আমার স্নেহাস্পদ হাসেনহোসেনের বিজাতীয় শত্রু হইবে; হাসেনকে বিষপানে এবং হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করিবে।"

সকলেই অধিকতর উৎসুক্যের সহিত সেই শিষ্য কে জানিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহম্মদ কোনরূপেই তাঁহাদের অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া বলিলেন "ভ্রাতৃগণ! বিধাতার আদেশ সহস্র চেষ্টায়ও ব্যর্থ হইবার নহে। তোমাদের মধ্যে এই প্রিয়তম মাবিয়ার আত্মজই আমার বংশধর গণের পরম শত্রু হইবে।" শুনিবা মাত্র শিষ্যগণের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণপরে সকলেই চিরকুমার থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মাবিয়া উৎকট রোগে শয্যাগত হইলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি দার পরিগ্রহ করিয়া রোগমুক্ত হইলেন। কালক্রমে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মিল। এই পুত্রের নাম এজিদ। মাবিয়া পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রেই তাহাকে নিধন করিবেন। অপত্য স্নেহের বশে তাঁহার সঙ্কল্প আর কার্য্যে পরিণত হইল না। কিছুদিন পরে মাবিয়া মহম্মদের নিকট হইতে দূরবর্ত্তী হওয়া নিরাপদ মনে করিয়া প্রভুর সম্মতিক্রমে সপরিবারে মদিনা ত্যাগ করিয়া দামস্ক নগরে বাস করিতে লাগিলেন। মহম্মদ সন্তুষ্ট চিত্তে দামস্কের সিংহাসন মাবিয়াকে অর্পণ করিলেন।

মহাপুরুষ মহম্মদ ইহ জগতের কার্য্য সমাপন করিয়া ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিষষ্টি বর্ষ বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এক মাত্র কন্যা ফাতেমা, জামাতা আলি, দৌহিত্রদ্বয় হাসেন ও হোসেন এবং অসংখ্য শিষ্য তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অবলম্বন রহিলেন। এদিকে দামস্ক নগরে বয়োপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। যৌবন মদে এবং ঐশ্বর্য্য ভোগে মত্ত হইয়া এজিদ্ নিজেকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণা এবং মদিনা রাজ্যের প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন। আলির লোকান্তরের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসেন মদিনার সিংহাসনে পঞ্চম অধিপতি হইলেন।

এজিদের রাজ্যান্তর্গত এক নগরে আবদুল জোব্বার নামে একজন ভদ্র বংশোদ্ভূত লোক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া এজিদ্ মুগ্ধ হইলেন। এই সাধ্বী পতি পরায়ণা স্ত্রী রত্নকে হস্তগত করিবার আশয়ে এজিদ্ কৌশল জাল বিস্তার করিলেন। জোব্বারকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া রাজ কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করা হইল। জোব্বার সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় সহধর্ম্মিণী জয়নাবকে পরিত্যাগ করিলেন এবং পরিশেষে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে বঞ্চিত এবং প্রতারিত হইয়া ভিক্ষুকের বেশে নিরুদ্দেশ হইলেন।

অসহায়া জয়নাবের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য এজিদ্ দূত প্রেরণ করিলেন। হাসেন মৃগয়ার্থ সদলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে এজিদ্ প্রেরিত দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ও এই দূতের দ্বারা জয়নাবের পাণিগ্রহনার্থী হইলেন। জয়নাব হাসেনকেই স্বামি পদে বরণ করিলেন। এজিদের জাতক্রোধাগ্নি দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি হাসনের জীবন বিনাশের জন্য কুটিল ষড়যন্ত্রে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মারইয়ানকে এই দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য নিযুক্ত করিলেন।

প্রকাশ্য শত্রুতা বৃদ্ধি করিবার জন্য এজিদ্ হাসেনের নিকট মক্কা ও মদিনার রাজস্ব চাহিয়া পাঠাইলেন এবং রাজস্ব না দিলে রাজ বিদ্রোহীরূপে যথোচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তাহাও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্র ছিন্ন ভিন্ন এবং পত্র বাহককে যথেষ্টরূপে লাঞ্ছিত করিয়া মদিনা বাসীগণ তাহাকে নগর বহির্ভূত করিয়া দিল। যুদ্ধ ব্যতীত উপায়ান্তর রহিল না। উভয় পক্ষীয় অগণিত সৈন্যগণের শোণিতে রণস্থল প্লাবিত হইল। পরিশেষে এজিদের

সৈন্যগণ পরাজিত হইল। সকলেই প্রাণভয়ে দামস্কে পলায়ন করিল কেবল দামস্ক রাজের প্রধান মন্ত্রণাদাতা মারইয়ান ছদ্মবেশে কোন এক গুপ্ত অভিসন্ধি সাধনের জন্য মদিনার সন্নিকটে রহিলেন।

কয়েকদিন বৃক্ষতলে রজনীর অন্ধকারে ছদ্মবেশী মারইয়ান মায়মুনা নাম্নী একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত নিগূঢ় পরামর্শ করিলেন। পরিণামে প্রভূত পুরস্কারের সূচনা স্বরূপ মায়মুনা কয়েক মুষ্টি রৌপ্য মুদ্রা পাইল। মায়মুনার সহিত হাসেনের দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদার সাতিশয় সৌহার্দ্য। মায়মুনার পরামর্শে জায়েদা স্বামী বধে উত্তেজিত হইলেন। প্রথম বার মধুর সহিত এবং দ্বিতীয়বার খর্জ্জুরের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া জায়েদা হাসেনকে দিলেন। হাসেন অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহা ভক্ষণ করিয়া পাড়িত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার জীবনের কোন অনিষ্ট হইল না। দ্বিতীয় বার বিষ প্রয়োগের পর হাসেন জায়েদার চাতুর্য্য বুঝিতে পারিয়া স্বাস্থ্য লাভের জন্য স্থানান্তরে গমন করিলেন। এই এই নূতন স্থানে একজন একচক্ষু বিহীন বিধর্ম্মী হাসেনের নিকট মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সাতিশয় অনুরক্ত হইল। একদিন সুযোগ পাইয়া এই দুরাত্মা অলক্ষিত ভাবে হাসেনের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া বিষাক্ত বর্ষা নিক্ষেপ করিল। সৌভাগ্য বশতঃ নিক্ষিপ্ত বর্ষা কোনরূপে প্রতিহত হইয়া তাঁহার পাদদেশ বিদ্ধ করিল। দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ ধৃত হইল কিন্তু হাসেন তাহাকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দিলেন। বিষে হাসেনের দেহ জর্জ্জরিত হইল। তিনি শয্যাগত এবং চলচ্ছক্তি হীন হইলেন। তদীয় অনুজ হোসেন সংবাদ পাইবামাত্র ভ্রাতাকে মদিনায় আনয়ন করিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কোনরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। পরিজনগণের শুশ্রূষায় হাসেন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। জায়েদার প্রতি সকলেরই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়িল। মায়মুনার পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় জায়েদা আবার স্বামীর প্রাণ হরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েকবার ব্যর্থ মনোরথ হইয়া নিশ্চিত মৃত্যুর কামনায় মায়মুনা এবারে জায়েদাকে হীরক চূর্ণ দিল। সতর্কতার ঘন আবরণ ভেদ করিয়া জায়েদা একদিন রজনীতে পানীয় জলের সহিত হীরক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিল। জলপান করিবা মাত্র তীব্র বিষের ক্রিয়ায় হাসেনের অন্তিম অবস্থা উপস্থিত হইল। মুমূর্ষ সময়ে জায়েদাকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা এবং তাঁহার

প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয় তজ্জন্য হোসনকে বার বার অনুরোধ করিয়া হাসেন ইহ সংসার হইতে অন্তর্হিত হইলেন। "হায় হাসেন, হায় হাসেন" এই ধ্বনিতে মদিনা-গগণ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইল।

হাসেনের বিয়োগে মদিনার আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই শোকার্ত্ত ও আত্ম বিস্মৃত। কেহই কাহারও সন্ধান রাখিতেছে না। সুযোগ বুঝিয়া জায়েদা ও মায়মুনা ছদ্মবেশী মারইয়ানের সাহায্যে দামস্ক নগরে উপস্থিত হইল। দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত, পাপানুষ্ঠানের পরিণাম ইহ জগতেই দেখিতে পাওয়া যায়। হাসেনের মৃত্যুতে উৎফুল্ল হইয়া এজিদ প্রথমে জায়েদা ও মায়মুনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন। পরে উভয়ের দুর্বৃত্ত আচরণের জন্য শাস্তি বিধান করিলেন। এজিদের আদেশে জায়েদা তীক্ষ্ণ ধার কৃপাণে দ্বিখণ্ডিত এবং মায়মুনা মৃত্তিকা মধ্যে অর্দ্ধ প্রোথিত এবং প্রস্তর নিক্ষেপে চুর্ণীকৃত মস্তক হইল।

হাসেনের মৃত্যুর পর এজিদ্ হোসেনের বধ সাধনে নিবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ মারইয়ান আবার মদিনায় প্রেরিত হইলেন। ছদ্মবেশে মারইয়ান একজন অনুচরের সহিত রজনীযোগে হোসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া জায়েদার বিষ-প্রয়োগে হাসেনের মৃত্যু, মারইয়ানের কুটিল ষড়যন্ত্র এবং এজিদের সৈন্য কর্ত্তৃক মদিনা আক্রমণ প্রভৃতি বিষয় বন্ধুভাবে তাহাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। ভ্রাতৃ বিয়োগে ভগ্নান্তঃকরণ হোসেন গুপ্তচরদ্বয়কে বলিলেন "তোমাদের নিঃস্বার্থতায় আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। আমি নিজের মৃত্যুর জন্য সঙ্কুচিত নহি। স্বর্গগত মাতামহের নিকট শুনিয়াছি, দামস্ক কিংবা মদিনায় আমার মৃত্যু হইবে না।"

এই গূঢ় সন্ধান পাইয়া চরদ্বয় মহাহর্ষে আপনাপন শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এজিদের নিকট পত্র সহ একজন বিশ্বস্ত দূত পাঠাইলেন। এজিদ্ পত্রের মর্ম্মানুসারে নিজের করপ্রদ কুফা নগরের অধিপতি আবদুল্লা জেয়াদকে যথেষ্ট পুরস্কার এবং পরিণামে তাঁহাকে স্বাধীন করিবার প্রলোভন দেখাইয়া হোসেনের হস্তে রাজ্যদান, আত্ম সমর্পণ ও তাঁহাকে কুফা নগরের রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তথায় আগমন করিতে অপুরোধ করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ এজিদের অত্যাচার ভয়ে জেয়াদ তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিলেন! হোসেন বিশ্বস্ত বন্ধু জেয়াদের প্রার্থনায় কুফা নগরে যাইতে সম্মত

হইলেন। মদিনাবাসীগণের পরামর্শে, হোসেন স্বয়ং প্রথমে কুফায় না গিয়া জেয়াদের বন্ধুতা পরীক্ষার্থ সহস্র সৈন্যের সহিত মোসলেম নামক একজন মদিনা-বাসীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। মোসলেম কুফারাজের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র উদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অভ্যর্থনায় এবং আনুগত্যে অতীব প্রীত হইয়া মোসলেম হোসেনকে স্বয়ং কুফা নগরে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। হোসেন নিঃসন্দেহ চিত্তে সপরিবারে ষষ্ঠি সহস্র সৈন্য লইয়া কুফা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হোসেন মদিনা পরিত্যাগ করিয়া কুফায় যাইতেছেন সংবাদ পাইয়া মারইয়ান সসৈন্যে কুফায় উপস্থিত হইলেন। কুফা নগরের প্রবেশ পথে মোসলেম ও মারইয়ানে বিষম যুদ্ধ হইল। জেয়াদ মোসলেমকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া মারইয়ানের সঙ্গে যোগ দিলেন। দিবাব্যাপী যুদ্ধের পর মোসলেম শত্রু হস্তে নিহত হইলেন।

হোসেন নিঃশঙ্ক চিত্তে কুফার পথে অগ্রসর হইতেছেন, সঙ্গে আত্মীয়, স্বজন প্রয়োজনাতিরিক্ত দাস দাসী, অসংখ্য বাহন, ষষ্ঠি সহস্র শিক্ষিত সৈন্য এবং প্রচুর আহার্য্য। কয়েকদিন পথ বাহনের পর হোসেন সপরিবারে এবং সসৈন্যে পথ ভ্রান্ত হইয়া জনহীন জন্তু সমাগম শূন্য নির্জ্জল এবং পাদপবিহীন এক মরুপ্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার অশ্বের পদ চতুষ্টয় বালুকাভূমিতে গভীর ভাবে প্রোথিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে শোক ব্যঞ্জক সহস্র মুখোচ্চারিত "হায়! হায়!" শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। হোসেন বুঝিলেন এই প্রান্তরই কারবালা, এই কারবালাই তাঁহার শ্মশান ভূমি। আর অগ্রসর না হইয়া তিনি সেই স্থানেই সহযাত্রীদিগকে শিবির স্থাপনের আদেশ দিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা পথভ্রষ্ট হইয়া শ্মশানভূমি কারবালায় আসিয়াছেন। সঙ্গে যে পানীয় জল ছিল নিঃশেষিত হওয়ায় জলের জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান হইল। মদিনাবাসীগণের কয়েক জন কিছু দূরে গিয়া ফেরাত নাম্নী একটী স্বচ্ছতোয়া নদী দেখিতে পাইল। জল আহরণার্থ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিল যে নদীর উভয়কূল অসংখ্য সৈন্যে পরিবেষ্টিত। সৈন্যগণের নিকটস্থ হইয়া তাহারা জল প্রার্থনা করিলে শতকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল "মহারাজ এজিদের আদেশে ফেরাতকূল সুরক্ষিত; সহস্রজীবন দিলেও

ইহার প্রবাহে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।" হোসেন পক্ষীয় লোকেরা এই কথা শুনিয়া পশ্চাৎ পদ হইল এবং দ্রুত পদে আসিয়া হোসেনের নিকট সমস্ত কথা গোচর করিল। হোসেন দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং বুঝিলেন এই প্রান্তরই তাঁহার জীবনের শেষ রঙ্গভূমি।

হোসেনের সৈন্যগণের মধ্যে "জল! জল!" চীৎকার উত্থিত হইল, বালক বালিকাগণ অসহ্য তৃষ্ণায় গগণ বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কয়েকজন ইস্‌লাম ধর্ম্মের শিষ্য অতি গোপন ভাবে শিবিরে আসিয়া হোসেনকে মোসলেমের নিধন, জেয়াদের বিশ্বাস ঘাতকতা, এজিদের দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বিষয় জ্ঞাপন করিল। হোসেন সাতিশয় বিচলিত হইলেন। পিপাসার্ত্ত সৈন্যগণের হাহাকার, পরিবারস্থ সকলের আর্ত্তনাদ, বালক বালিকাগণের হৃদয়ভেদী রোদনে দশম দিবসে কারবালার বিস্তৃত প্রান্তর বিকম্পিত হইল। জল বিনা মাতৃবক্ষে দুগ্ধ সঞ্চারিত হইল না,—শুষ্ক কণ্ঠে কাহারও বাক্যস্ফূরণ হইল না, পিপাশায় শত শত সৈন্য বিগত প্রাণ হইল। সকলেই "জল জল" করিয়া হোসেনের পাদ-দেশে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। মহাত্মার হৃদয়তন্ত্রী শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হোসেনের ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন "জল বিনা স্তনে দুগ্ধ নাই; পিপাসায় আমার জীবন শুষ্ক হউক, তাহাতে দুঃখ নাই—কিন্তু একবিন্দু জল দিয়া এই শিশুর প্রাণরক্ষা কর।" হোসেন আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া স্বীয় প্রিয়তম অশ্ব দুলদুলে আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ফেরাত তীরে উপস্থিত হইলেন। হোসেন শিশুটীর জন্য জল প্রার্থনা করিলেন প্রত্যুত্তরে শত্রুপক্ষ হইতে একটী সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া শিশুর তৃষ্ণার জ্বালা ইহজন্মের মত শেষ করিল। হোসেন শিশুর মৃত দেহ লইয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন।

উভয় পক্ষে লোম হর্ষন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মদিনার বীরগণ অসংখ্য শত্রু নিপাত করিয়া একে একে যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মদিনা শিবিরে পুরুষ পক্ষে কেবল হোসেন এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র জয়নাল এ পর্য্যন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েন নাই। হতাবশিষ্ঠ সৈন্যগণের নায়কত্ব গ্রহণ করিবার আর কেহ নাই দেখিয়া জয়নাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইবার জন্য পিতার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। হোসেন অশ্রুপ্লাবিত নয়নে মহম্মদের পবিত্র কুলের বংশধরকে প্রতিনিবৃত্ত

করিয়া স্বয়ং যুদ্ধাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার শাণিত কৃপাণাঘাতে দুলদুলের অপ্রতিহত বেগে এজিদ পক্ষীয় শ্রেণী বদ্ধ সৈন্যগণ ভূপতিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফেয়াতকুল উদ্ধার হইল। হোসেন নদীতীরে গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। জলে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া মুখে দিবেন এমন সময়ে সহসা তাঁহার মনে হইল সহস্র সহস্র সৈন্য প্রিয়তম পুত্র এবং আত্মীয় স্বজন শুষ্ক কণ্ঠে জল জল বলিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। এ জল পান করিয়া তিনি কিরূপে তৃপ্ত হইবেন? আর জলপান করিলেন না ঊর্দ্ধ নেত্রে ভগবানের নাম করিতে করিতে আবার অশ্ব পৃষ্ঠে রণপ্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল তিনি ক্রমে ক্রমে অস্ত্র শস্ত্র বসনাদি ত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে-নীমিলিত নেত্রে ধ্যান মগ্ন হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে তীর বর্ষা প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাঁহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল তথাপিও মহাপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইল না। রুধিরাক্ত কলেবরে তিনি ভূতলশায়ী হইলেন। এজিদ পক্ষের শিমার নামক জনৈক সৈনিক তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা হস্তে এজিদের প্রতিশ্রুত লক্ষ মুদ্রার পুরস্কারের লোভে হোসেনের মস্তক ছেদন করিতে অগ্রসর হইল। পাপাত্মার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল পরিশেষে হোসেনের ইঙ্গিতে পশ্চাদ্দিক হইতে শিমার মস্তক ছেদন করিয়া মহোল্লাসে পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে দ্রুতগামী অশ্ব পৃষ্ঠে দামস্কের দিকে ছুটিল। হোসেনের মস্তক হীন দেহ রণ ক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল, এজিদ জয়লাভ করিলেন, হোসেনশিবিরে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া রমণী কণ্ঠে রোদন উঠিল "হায় হোসেন! হায় হোসেন!"

শিমার বর্ষাগ্রে দেহ বিচ্ছিন্ন মস্তক বিদ্ধ করিয়া অবিশ্রান্ত চলিতে চলিতে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণার্থ সায়ং কালে পথিমধ্যে এক গৃহস্থের অতিথি হইল। এই গৃহ-স্থের নাম আজর। আজর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া হোসেনের শির অন্তঃপুরের নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত রাখিলেন এবং শীমারকে যথাসাধ্য আহার্য্যে তৃপ্ত করিয়া পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া শিমা আজরকে বিচ্ছিন্ন মস্তক প্রত্যর্পণ করিতে বলিল। আজর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিমারকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে না পরিয়া তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে তীক্ষ্ণ কৃপাণের সাহায্যে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া শিমারকে দিলেন। শিমার আজরের

চাতুর্য্য বুঝিতে পারিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন আজর ক্রমে ক্রমে সংসারের অবলম্বন আর দুইটী পুত্রের সদ্যচ্ছিন্ন শির আনিয়া শিমারকে দিলেন। দুর্বৃত্ত কিছুতেই পরিতৃপ্ত না হইয়া সরোষে হস্তস্থিত বর্ষাদ্বারা আজরের মস্তক দেহ হইতে ভূপতিত করিলেন। আজরের স্ত্রী সকলই দেখিলেন তথাপিও নির্ভীকচিত্তে হোসেন শির রক্ষা করিবার জন্য অন্তঃপুরের দ্বারদেশে কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। শিমার বর্ষাবিদ্ধ হোসেন-মস্তক লইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্দেশে যাইতেছেন দেখিয়া শিমারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া আজর স্ত্রী সবেগে কৃপাণ নিক্ষেপ করিলেন। বর্ষায় প্রতিহত হইয়া হোসেন শির ভূপতিত হইল শিমার অনাহত রহিল আজর স্ত্রী শির লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে দুরাত্মা শিমার তাঁহার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক শির লইয়া প্রস্থান করিল। আজর স্ত্রী প্রথমে সংজ্ঞাশূন্য পরে স্বীয় পুত্রগণের রক্তে রঞ্জিত কৃপাণে আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন।

হাসেন হোসেনের মৃত্যু স্মরণে মুসলমান জগতে যে প্রতিবৎসরে শোকচ্ছাস উত্থিত হয় তাহাই মহরম পর্ব্ব। ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই সকল ঘটনার অসম্ভাবী ফল। এজিদের ঐশ্চর্য্যগর্ব্ব, শিমারের অমানুষিক নৃশংস ব্যবহার জেয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা, মারইয়ানের কূচক্র প্রভৃতির যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। আবার হাসেনের অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা হোসেনের ঈশ্বর পরায়ণতা ও আত্মত্যাগ আজরের নিঃস্বার্থ পুত্রবলিদান আজর রমণীর বীরত্বও পরোপচিকীর্ষা জগতের পূজ্য ও আদর্শ স্থানীয় হইয়া রহিল।

শ্রীশশধর সেন।

মানব শব্দের বুৎপত্তি কি ?

"মনোরপত্যং পুমান্ মানবঃ" একথা না বলেন বা একথা না জানেন, এরূপ লেখক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি বিরল। শিক্ষক ও ছাত্র গুরু ও শিষ্য ব্যবসায়ী বা অব্যবসায়ী শিক্ষার্থী বা শিক্ষা প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি এই "মানব" শব্দের বৈজিক তত্ত্বে অভিজ্ঞ। যখন পড়িতাম ও পড়াইতাম কেবল তখন নহে, যখন নিজে কারিকর হইয়া "মঞ্জুষার" দেহ প্রতিষ্ঠা করি তখনও "মানব" শব্দের উৎপত্তিবুৎপত্তি বিষয়ে অজাগরূক ছিলাম না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তখন এ কথাটা একবারও মনে জাগে নাই যে এ মনু জিনিষটা কি ? স্বর্গ ও ভারতের প্রশস্ত বক্ষে অনন্ত মনুর আমদানী রপ্তানি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ কথা এক দিনও কেহ ভাবি নাই যে কোন্ মনু হইতে এই "মানব" শব্দ ব্যুৎপাদিত ! যেরূপ বাইবেলের আদি মানব আদম হইতে আদ্‌মী তেমনই স্বায়ম্ভুব মনু হইতেই মানব নামের সমুৎপত্তি এতদিন এই স্বতঃসিদ্ধ অপরিবর্ত্ত সহ জ্ঞান লইয়াই তুমি আমি ঘর করিতাম। কিন্তু বস্তুতই কি সে জ্ঞান অদোষ সন্তুষ্ট ছিল ? এখন কি একটা খট্‌কা আসিয়া সে বনেদী জ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করে নাই ?

সে খট্‌কাটা কি ? সে খট্‌কাটা এই যে যদি স্বায়ম্ভুব মনুর পুমান্ অপত্যকেই তোমরা মানব নামের গদিতে বসাইতে চাহ তাহা হইলে তাঁহার যে কোন অপত্যই উক্ত নামের তুল্যাধিকারী হইবে কি না ? যদি হয় তাহা হইলে দৈত্য দানব আদিত্য (দেবতা) যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও ভূত পিশাচেরাও কেন ঐ সাধারণ পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত থাকিবে ? তোমরা কি দৈত্য দানব দেবতাকেও মানব বলিয়া অবগত আছ ? মানব দানব ও দনুজ মনুজ একই জিনিস তোমরা কি কোন দিনও একথায় সায় দিতে প্রস্তুত হইয়াছ ? মনু বলিয়াছেন,

আদি মানব বিরাটের অনন্ত বংশ মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনুর মধীরি প্রভৃতি দশ পুত্র। সেই দশ পুত্র দশ প্রজাপতি ও আদি ঋষি বলিয়া প্রখ্যাত॥ উক্ত আদি ঋষি গণই দেব দানব, মানব ও যক্ষ রক্ষঃ প্রভৃতি আমূল জীব নিবহের আসন্ন নিদান সুতরাং স্বায়ম্ভুব মনুর সাধারণ সন্তান জায়া, কেন সে সাধারণ "মানব" নামে সংসূচিত হইবেন না? ইঁহারা এক সাধারণ "মানব" নামের পরিচিত না হইয়া কেনই বা দৈত্য দানবাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিশেষিত হইলেন? মনুতে বিবৃত রহিয়াছে—

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ॥৩২
তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজ সত্তমাঃ॥৩৩
অহং প্রজাঃ শিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং।
পতীন্ প্রজানা মসৃজম্ মহর্ষী নাদিতোদশ॥৩৪
মরীচি মত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদ মেবচ॥৩৫
এতে মনূংস্তু সপ্তান্যান্ অসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেব নিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥৩৬
যক্ষ রক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথগ্ গণান্॥৩৭
কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তো দতঃ॥৩৮

অর্থাৎ ব্রহ্মা আপনার দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ ও অন্যার্দ্ধে নারী দেহ পরিগ্রহ করিলেন। সেই পুরুষ হইতে উক্ত নারীর গর্ভে বিরাটের উৎপত্তি হয়। সেই মহাপুরুষ বিরাট তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করেন, আমিই সেই মনু। হে দ্বিজগণ! আমা হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আমি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া ছিলাম তাহাতে আমা হইতে প্রথমে মরীচি আত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু, বশিষ্ঠ ভৃগু ও

প্রচেতা; এই দশ মহর্ষির জন্ম হয়। এবং ইহা দিগ হইতে অপর ভূরিতেসা অপর শত জন মনু দেবগণ এবং আরও কতিপয় অমিততেজা মহর্ষির সৃষ্টি হয়। এবং উক্ত মরীচ্যাদি ঋষিগণই স্বর্গ ধামে দেবগৃহ সকল প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এবং উহা দিগ হইতেই মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, নাগ, সর্প, সুপর্ণ, কিন্নর, বানর, মৎস্য, বিবিধ বিহঙ্গম মৃগ প্রভৃতি নানা প্রকার পশুও উভয় দিকে দন্ত বিশিষ্ট নানা প্রকার হিংস্র জন্তুর উৎপত্তি হইয়াছিল।

অন্যত্র—"অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্ত শস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্ব দেবতাঃ॥১৯২
যস্মাদুৎপত্তিরেতেষাং সর্ব্বেষা মপ্যশেষতঃ।
যে চ কৈ রুপচর্য্যাঃ স্যুর্নিয় মৈস্তান্ নিশেষত॥১৯৩
মনো হৈরণ্য গর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষা মৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতা॥১৯৪
বিরাট্ সুতাঃ সোম সদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিদাত্তাশ্চ বেদানাং মারীচ্যা লোক বিশ্রুতাঃ॥১৯৫
দৈত্য দানব যক্ষাণাং গন্ধার্ব্বোরগ রক্ষসাং।
সুপর্ণ কিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোঽ ত্রিজাঃ॥১৯৬
সোম পা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানা মাজ্যপা নাম শূদ্রাণান্তু সুকালিনঃ॥১৯৭
সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তো ঽঙ্গিরঃ সুতাঃ।
পুলস্ত্যস্যাদ্যেপাঃ পুত্রা বশিষ্টস্য সুকালিনঃ॥১৯৮
ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্বং চরং স্থাণ্বনু পূর্বশঃ॥"২০১—৩ অ।

অর্থাৎ—আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্বে যুদ্ধাদি করিতেন, কিন্তু এইক্ষণে তাঁহারা ক্রোধ ও অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিরা ব্রহ্মচর্য্যাতে মনঃ সংযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অন্তর বাহির উভয়ই অতি পবিত্র তাঁহারা অতি ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ তাঁহারা পূর্ব্বে দেবতা ছিলেন। এই পিতৃলোকেরা যে, যাঁহা হইতে

উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ইঁহারা কে কাহার পূজাহ তাহা বিবৃত হইতেছে শ্রবণ কর। হিরণ্য গর্ভ ব্রহ্মার বংশ সম্ভূত মনু হইতে যে মরীচ্যাদি দশ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিরাই পিতৃ লোক নামে প্রখ্যাত। তবে সাধ্য দেবগণের পিতৃ লোক সোম সদেরা মনুর সন্তান নহেন তাঁহার বিরাট তনয় ধর্ম্ম হইতে মনুদ্ভুত। অনিষ্বাত্ত নামক পিতৃ লোকের দেবগণের পিতৃ পুরুষ তাঁহারা রীষি সন্তান। এবং দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ রাক্ষস সুপর্ণ ও কিন্নরগণ বর্হিষদ নামক পিতৃ লোক দিগের অনন্তর বংশ্য। বর্হিষদগণ অত্রি সন্তান। সোমপ্ হবির্ভুজ আজ্যপ ও সুকালিন্ ইঁহারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের পিতৃ পুরুষ। এই পিতৃ লোক গণ ও যথাক্রমে ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য ও বশিষ্ট ঋষির অধস্তন সন্তান। ফলতঃ মরীচ্যাদি ঋষিগণ হইতে পিতৃলোকগণ ও পিতৃ লোক সকল হইতে জগতের দৈত্য, দানব, দেবতা প্রভৃতি সকলেরই উৎপত্তি হইয়াছে।

আমরা মনুর এই বিবৃতি হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, স্বায়ম্ভুব মনুই দৈত্য দানব মানব (মনুষ্য) ও আদিত্যাদি সকলেরই আদি নিদান। এবং মানব বলিলে যেমন মনুষ্য বুঝাইয়া থাকে তেমনই উক্ত মানব শব্দে দৈত্য দানব আদিত্য (দেবতা) প্রভৃতি অবযোষিত হইবে। কেন না এক মনু পিতৃকত্ব হেতু দেবদানবাদি সকলেই উক্ত সাধারণ মানব নামের তুল্যাধিকারী। কিন্তু মানদ্ধাতার সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত আমরা কি কখনও মানব শব্দের তাদৃশ সার্ব্বভৌম পদার্থ এই করিয়া থাকি ? যে কারণে দৈত্য দানব ও আদিত্য গণ মনুর সন্তান হইয়াও উক্ত দৈত্যদানবাদি পৃথক নামে বিশেষিত হইয়াছেন, মানবেরাও কি ঐরূপ কোন কারণে পৃথক "মানব" নামের বিষয়ীভূত হয়েন নাই সুতরাং "মানব"শব্দ স্বায়ম্ভুব মনুশব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত, একথা ঠিক হইতেছে না সত্য বটে—বেদের বাহুল্য "মনুষ্পিতা" আমরা "মনুর সন্তান" ইত্যাদি অনেক কথা বিবৃত আছে * সুতরাং

* হোতা নিষত্তো মনোরপত্যে (৪—৬৮—১ম)। যামথর্ব্বা মনুষ্পিতা ধির মন্বতা (১৬—৮০—১ম) হোতার মিতি যাবৎ মনুমাতং মনুমাতৃকং স্বধ্বরং শোভন যান যুক্তং যজ্ঞ দক্ষং জনং মানব নাম ধেয়ং দেবতান্তরং চ আযজ। দিবি ভবত্বাৎ দৈত্য মানব মানবাদয়োপী পূর্ব্বং দেব সংজ্ঞায় সমলতাকৃতা আসন্ "পূর্ব্বদেবা দিতিসুতা" পিতরঃ পূর্ণ দেবতা ইতি স্মরণাৎ।

সে পিতা বা পুরুষ মনু যে সেই দেবদানবাদির সাধারণ পিতা স্বায়ম্ভুব মনু তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার নামে কেহইত মানব বলিয়া অববোধিত হয়েন নাই, ভ্রান্তি নিবারণের নিমিত্ত আমরা এখানে বেদের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

ত্বমগ্নে বসূঁরিহ্ রুদ্রান্ আদিত্যান উত।
যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃত প্রুষং॥

ঋকবেদ ১—৪৫ সূ —১ম ও সামবেদ—ছন্দ আর্ষিক অ ১।৩।৩১ ঋক

তত্র মায়ণঃ— হে অগ্নে! ত্বমিহ কর্ম্মাণ চস্বাহীন্ যজ।
উত অপিচ জনং অন্যমপি দেবতা রূপং প্রাণিনং যজ।
কীদৃশং স্বধ্বরং শোভন যাগযুক্তং মনুজাতং মন্ধনা প্রজাপতীন।
উৎপাদিতং ঘৃত প্রুষং উদকস্য সেক্তারং যজেতি সম্বন্ধঃ।

আমরা কিন্তু—সায়নের এ তুর্য্যধ্বনিতে বিচলিত হইবার নহি। আমাদিগের ধারণা তিনি এখানে পদার্থগ্রহ বিষয়ে ষোলআনা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন। আমরা এই ঋকের রূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করিতেছি। যথা—

হে অগ্নে! ত্বমিহ কর্ম্মনি যজ্ঞচিধৌ বসূন্ বসুমাতৃকান্
অষ্ট ধর্ম্ম পুত্রান্ রুদ্রান্ একাদশাত্মকান্ আদিত্যান্ দ্বাদশাত্মকান্
আদিতি মাতৃকান্ তথা ঘৃত প্রুষং ঘৃত সেক্তারং
ঘৃতেন আহুতি প্রদাতারং

এখানে স্পষ্টই দেখাইতেছে ঋক্ প্রণেতা ঋষি, যেমন ভিন্ন মাতৃক বসু, রুদ্র ও আদিত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন তেমনই মনুজাত (সুতরাং মানব ?) দেবতা দিগেরও স্বতন্ত্র উল্লেখ করিতেছেন ? সুতরাং বুঝিতে হইবে এ মনুপিতা মনু নহেন অবশ্যই মাতা মনু হইবেন ? কেননা বসুরা বসু মাতৃক ও আদিত্যেরা অদিতি মাতৃক ? যদি এ মনু সাধারণ পিতা স্বায়ম্ভুব মনু হইতেন তাহা হইলে ঋক্ প্রণেতা কেন এক রচনাও পৃথক মনুজাত শব্দের প্রয়োগ করিবেন ? বসু রুদ্র ও আদিত্যাদিও যখন পিতা মনুজাত তখন এক

"মনু জাতান্" বলিলেই ত পর্য্যাপ্ত হইত? সায়নও ত মনুজাত লোক পৃথক রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন? অতএব এ মনু অবশ্যই মাতা মনু হইতেছেন। কায়ন অবশ্যই "মনুনা প্রজাপতিনা" বলিয়া পুরুষ অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু বসু রুদ্র ও আদিত্যেরাও কি সেই একই স্বায়ম্ভুব মনুর প্রসূতি নহেন? তবে তাঁহারাও কেন মনুজাত বলিয়া নির্দ্দোষিত হইলেন না? সুতরাং বুঝিতে হইবে এ মনু পিতা নহেন? পূর্ব্বকালে সকলেই বিশেষতঃ দেবতারা মাতৃ নামেই পরিচিত হইতেন। সুতরাং মানব নামও মাতা মনু হইতে ব্যুৎপাদিত ইহা ধ্রুব। দেবতারা যে মাতৃ নামা ছিলেন তাহা দৈত্য (দতি+ষ্ণ্য), দানব (দনু+ষ্ণ); ও আদিত্য (অদিতি+ষ্ণ) প্রভৃতি শব্দেই অভিব্যক্ত রহিয়াছে? বায়ুপুরাণে লিখিত আছে:—

দিবৌকসঃ স্বর্ণ এষ প্রোচ্যতে মাতৃ নামভিঃ॥ ৫৮১ অ—উত্তর খণ্ড।

তবে বলা যাইতে পারে কই—কোন গ্রন্থেই ত কশ্যপের "মনু" নামে কোন স্ত্রী থাকার কথা পরিলক্ষিত হয় না? মহাভারতে লিখিত আছে—

মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ।
প্রজজ্ঞিরে মহাভাগা দক্ষকন্যা স্ত্রয়োদশ॥
অদিতিদিতির্দিনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা।
ক্রোধা প্রধো চ বিশ্বা স্ব বিনতা কপিলা মুনিঃ॥

১+১৩৫+১১−১২

বিষ্ণুপুরাণেও (১ম অংশ ১১৫পৃ—১২৫।১২৬) আমরা মুনি শব্দের সন্তা দেখিতে পাইয়া থাকি এবং অপ্সরাগণ যে মুনির সন্তান—তাহাও পুরাণে বিবৃত আছে, কিন্তু মানব দানব কাদ্রবেয় ও বৈনতেয় প্রভৃতির ন্যায় আমরা "মৌনের" নামে একটী পরিভাষার কথা কখনই শ্রুতিগোচর করি নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে মুনি শব্দ লিপিকর প্রমাদ সম্ভূষ্ট সম্ভবতঃ বোধ হয় মনু শব্দই কালে ভিন্ন কারিকরের হাতে পড়িয়া মুনিতে পরিণত হইয়াছে। আজ ১৫।১৬ বৎসর যাবৎই আমার মনে এই একটা ধান্ধা লাগিয়া আসিতেছিল, যখন দৈত্য, দানব ও আদিত্যেরা সকলেই মাতৃ নামা, তখন মানবেরাও কেন মাতৃনামা না

হইলেন? কেন এ সনাতন সার্ব্বভৌম বিধি, তাঁহাদিগের অনুকূলেও প্রবর্ত্তিত হইল না? অনন্তর যখন (৩ বৎসর হইল) রামায়ণ অধ্যয়ন করি—তখন আমি অরণ্যকাণ্ডের চতুর্দ্দশ সর্গে দেখিতে পাইলাম—

প্রজাতেস্তু দক্ষস্য বভূচুরিতি বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টির্দুহিতরোরাম যশস্বিন্যো মহাযশঃ॥১০॥
কশ্যপঃ প্রতি জগ্রাহ তামা মষ্টৌ সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিঞ্চৈব দনূ মপিচ কালকাং॥১১
তাম্রাং ক্রোধ বশাং চৈব মনুঞ্চাপ্যনলামণি।
জন্তু কন্যাস্ততঃ প্রীতঃ কশ্যপঃ পুনরপ্রচীৎ॥১২
সুরসা জনয়ন্ নাগান্ রাম কদ্রুশ্চ পন্নগান্।২৮
মনুর্মনুষ্যান জনয়ং কশ্যপাত্তু মহাত্মনঃ।

বাঙ্গালা ভাবার্থ:—প্রজাপতি দক্ষের যশস্বিনী ৬০ টী দুহিতা ছিল। তাহাদের মধ্যে মহামতি কশ্যপ আটটী কন্যাকে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। কশ্যপ এই কন্যাদিগকে প্রীতি বাক্যে তুষ্ট করিয়াছিলেন। কশ্যপ ঔরসে রুদ্র গর্ভে পন্নগগণ মনুর গর্ভে মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং "মানব" শব্দ যে মাতা মনু হইতে ব্যুৎপাদিত, সে বিষয়ে আর কোন সংশয়ই রহিল না। তবে বলা যাইতে পারে রামায়ণে এ কথা থাকা সত্বেও কেন সমগ্র ভারত মাতা মনুর কথা জ্ঞাত নহেন? তাহার হেতু অধীয়ানবর্গের অসাবধানতা? মনু পিতা, মাতা নহেন, এ ভ্রান্তি কেবল আমরাই বহন করিতেছি, তাহা নহে, নির্ব্বাসিত ভারত সন্তান জর্ম্মাণগণও অদ্যাপি সেই দক্ষকন্যা মাতা মনুকে পিতা মনু বলিয়াই ধারণা করিয়া আসিতেছেন। Ency clopidia Britanica য় জর্ম্মাণ শব্দে ২য় প্রকরণে লিখিত আছে—"Although without a common name the ancient Germans believed that they had a common origin. all of them regarding as their forefather Mannus, the first man the son of God Tuisco.

* খশা যক্ষ রক্ষাংসি মুনিরপ্সরম স্তথা। ২৪—২১ অ—১ অংশ।

জর্ম্মাণদিগেরও এ ভ্রান্তি ঘটিল কেন? তাঁহার হেতু এই—যে সময়ে আমরা স্বর্গের জ্ঞাতি দেবতাদিগকে উপাস্তে পরিণত করিয়াছিলাম, সেই সময় আমরা যে স্বর্গের আদি নিবাসী ও মাতা মনুর অধস্তন সন্তান তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। জর্ম্মাণেরা সেই সময়েই আমাদিগকে ভারতে রাখিয়া অজয়ন হইয়া ইউরোপে (হরীয়ুর পিয়া জনপদে) গমন করেন, সুতরাং তাহারা ভ্রান্তি সঙ্গে করিয়াই লইয়া গিয়াছিলেন। ভাষার বিকারে দিবা, দ্যৌ ও দ্যুপিতরঃ যথাক্রমে Day, Two, ও Inpiter পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ঐ কারণে দক্ষ (দুইক্ষ) শব্দও যে Tuisco (টুইস্কো) পরিণত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

কশ্যপাত্মজ আমরা যে মাতা মনুর সন্তান, আমার সামবেদের আর একটী ঋক্ অধ্যাহার করিয়া তাহা সমর্থন করিতেছি। কারণ এই ঋকের ভাষ্যেও ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুকে বৈবস্বত পুরুষ মনু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পিতা কশ্যপ শব্দের সাহায্য বশতঃ মাতা পদ যে মনুর সহিত একাধিকরণ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ঋক্ প্রণেতা যেমন কশ্যপকে পিতা বলিয়াছেন তেমনই মনুকেও মাতা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা আমাদের ব্যাখ্যা সহ ঋক্টী উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

জাতঃ পরেণ ধর্ম্মণা যত্ সবৃদ্ভিঃ সহাভুবঃ।
পিতা যত্ কশ্য পশ্যাগ্নিঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবিঃ ॥১০—ছন্দ ১।২

হে অগ্নে! যত্ যত্ত্বং পরেণ ধর্ম্মণা—উৎকৃষ্টে না ধানাদি কর্ম্মণা জাতঃ সন্ সবৃদ্ভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ সহ অভুবঃ ভবসি বর্ত্তসে পিতা কশ্যপঃ শ্রদ্ধয়া উপলক্ষিতা মাতা মনুশ্চ তস্য অগ্নেস্তে কবিঃ স্তোতা স্তোত্রীচ আসীদিতি শেষঃ। কশ্যপস্যাগ্নিরিত্যেতয়োঃ পদয়োঃ পরস্পরং বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ।

হে অগ্নি পুরোহিতেরা তোমাকে উৎকৃষ্ট আধানাদি কর্ম্ম দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করাতে তুমি প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত বর্ত্তমান আছ। পিতা কশ্যপ ও শ্রদ্ধাস্পদ মাতা মনু তোমার স্তোতা ছিলেন।

এখন চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, পিতা মনু হইতে যে মানব নাম ব্যুৎপাদিত, তাহার ব্যাপ্যর্থ ধরিয়া পদার্থ গ্রহণ করিতে গেলে আমরা সে

"মানব" শব্দে দৈত্য, দানব, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি সমুদায়কেই বুঝিতে বাধ্য হইব, কেননা ইহাঁরা সকলেই পিতা মনুর সন্তান? কিন্তু আমরা 'মানব" বলিলে মানুষ ভিন্ন আর কাহাকেই উহার অন্তর্ভূত বলিয়া জানি না সুতরাং প্রচলিত মানব শব্দ যে মাতা মনু হইতে ব্যুৎপাদিত তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। সত্য বটে এখন মানব ভিন্ন দৈত্য, দানব, ও দেবতা প্রভৃতি সংজ্ঞাসূচক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ জগতে নাই কিন্তু যখন ছিল তখন দৈত্য দানব মানব ও আদিত্য বলিলে যথাক্রমে দিতি, দনু, মনু ও অদিতির সন্তানেরাই ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংসূচিত হইতেন। ইহা হইতেই "মানব" শব্দ মাতা মনু হইতেই ব্যুৎপাদিত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আগ্রায়।

২। মোগল দুর্গ।

পরদিন আগ্রার দুর্গ দেখিতে গেলাম। সে দিন রবিবার ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের আফিস বন্ধ—পাস মিলাইতে কিছু গোল বাধিরা গেল। কিন্তু H–র * অনুগ্রহে আমরা সে ভাবনা ভাবিবার জন্য তত অবকাশ পাইলাম না। তাহার পশ্চাদানুসরণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে মোগলের ভীষণ দুর্গ তোরণ অতিক্রম করিলাম।

আগ্রা দুর্গ দিল্লী দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মাইল, প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল হইবে। দুর্গ প্রাচীর রক্ত প্রস্তরে গাঁথা। সমভূমি হইতে প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ। ঠিক যমুনার উপরেই স্থাপিত। বর্ত্তমান সময়ে যমুনা কিছু পূর্ব্বধারে সরিয়া যাওয়ায় যমুনা ও দুর্গের মধ্যে একটা রাস্তা পড়িয়া গিয়াছে।

আমরা মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই যোধবাইর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে যোধবাইর পূজার মন্দির ছিল। মোগল কুলকলঙ্ক ঔরঙ্গজেব ইহা একেবারে ধ্বংশ করিয়া তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দু মহল পার হইয়া "আঁখমিছৌলি" দেখিলাম। ইহা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী সংযুক্ত একটি শ্বেত প্রস্তরের গৃহ। ইহাতে নাকি বাদসাহ বেগম দিগের সহিত লকচুরি খেলিতেন। তার পর আর কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম সেই জগৎ

---

* এক জন বিচক্ষণ গাইড। এ ব্যক্তি ইংরেজী লিখা পড়ায় অনভিজ্ঞ। কিন্তু ইংরেজি অভিজ্ঞ দর্শকদিগকে দর্শনীয় পদার্থ গুলির ইতিবৃত্ত ইংরেজী ভাষায় বর্ণনা করিয়া সবিস্তার বুঝাইতে বড়ই সুপটু। যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা-গুলি অনর্গল কণ্ঠস্থ বলিয়া যাইতেছে। তাহার এ অলৌকিক গুণে ও তাহার নিকট হইতে প্রতি দর্শনীয় পদার্থের বিস্তারিত ইতিহাস অবগত হইয়া আমরা বড়ই আপ্যায়িত হইয়া ছিলাম।

বিখ্যাত চন্দন কাষ্ঠের কপাট। কপাটটী প্রায় ৮ হাত উচ্চ ৬ হাত প্রস্থ। গজনির মামুদ সোমনাথের মন্দির ধ্বংশ করিয়া এই কপাট গজনিতে লইয়া যায়। ইংরেজরাজ পুনরায় তাহা গজনি হইতে আনিয়া এখানে রাখিয়াছেন। ইহাতে নাকি ৭৫০-মণ সুবর্ণ জড়িত ছিল। বর্ত্তমানে তাহার কিছুই নাই। ইহার সুচিক্কণ কারুকার্য্য ও শিল্প নৈপুণ্য অনুকারিত হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবার জন্য এক জন সুদক্ষ ব্রিটিশ আর্টিষ্টকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তার পর সুপ্রসিদ্ধ দেওয়াম আম (Public audience Hall) এখানে বাদসাহ প্রকাশ্য দরবার করিতেন। ইহা দিল্লীর দেওয়ান আম হইতে আকারে ছোট ১৮০ ফিট দীর্ঘ ও ৬০ ফিট প্রশস্ত। পূর্ব্ব ধারে আকবরের সিংহাসন বেদী। বেদীর উপর উঠিলেই নাকি মুখে রক্ত উঠিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। পঞ্চত্ব প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করিয়া আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া গৃহটী ও তৎসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণটী দেখিয়া লইলাম। সম্মুখের প্রাঙ্গণে পশু পক্ষীর ক্রীড়া হইত। দরবারে বসিয়া বাদ-সাহ তাহা দেখিতেন।

ইহার পার্শ্বেই মাচ্ছি ভবন। ইহা লক্ষ্ণৌ মাচ্ছি ভবন হইতে অনেক বিষয়ে হীন।

পূর্ব্বদিগে দ্বিতল দেওয়ান খাস (Private audience Hall)। এ গৃহটী অতি সুন্দর কিন্তু দিল্লীর দেওয়ান খাসের সহিত তুলনীয় নহে। এই স্থানে রাজ্য সংক্রান্ত মন্ত্রণা, রাজস্ব হিসাব ইত্যাদি গুপ্ত বিষয়ের পরামর্শ হইত। কষ্টি পাথরের কৃষ্ণ সিংহাসনে বাদশাহ উপবেশন করিতেন। ভরতপুর রাজ আগ্রা অধিকার করিয়া দুর্গ হইতে অনেক মূল্যবান প্রস্তর, হীরা, জহরৎ ইত্যাদি লইয়া যান। এই কৃষ্ণ সিংহাসনটীও লইতে মনস্থ করিয়া ছিলেন। হঠাৎ পড়িয়া যাইয়া ভগ্ন হওয়ায় তাহা আর নেওয়া হইল না। ইহা এখন স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

এরপর শিশমহল দেখিতে লাগিলাম। ইহা বেগমদিগের স্নানাগার। অতি অনির্ব্বচনীয় স্থান। চতুর্দ্দিগের প্রাচীর গাত্রে শত সহস্র স্ফটীক খণ্ড চিত্রিত লতাপাতা সংযুক্তে অনন্ত সৌন্দর্য্য খুলিয়া হাসিতেছে। মধ্যস্থলে স্নানাগার। পূর্ব্ব দিকে হিন্দু বেগমদিগের যমুনা স্নানের মৃত্তিকা ক্ষোদিত সোপান সংযুক্ত পথ।

শিশমহল দেখিয়া মতি মসজিদে উঠিলাম। ইহা ১৬৫৪ খৃঃ সাজাহান প্রায় এক কোটী টাকা খরচ করিয়া প্রস্তুত করেন। ইহাতে বেগমেরা নেমাজ পড়িতেন। দিল্লীর মতি মসজিদ হইতে ইহার আকার অনেক বৃহৎ। তারপর জেনানা বাজার পরিদর্শন করিলাম। এই স্থানে "খোসরোজা" মেলা করিয়া আকবরসাহ রমণীর হাট বসাইতেন। এই স্থানে আকবরের বিমল চরিত্র দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমায় কলুষিত হইয়াছিল, আকবর যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। জেনানাবাজারের উপর কক্ষ হইতে মৃত্তিকার নিম্নে দিয়া তাজ মহলে ও আকবরের পরিত্যক্ত রাজধানী ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী ফতেপুর যাইবার নাকি একটী সোপান সংযুক্ত গুপ্ত পথ ছিল। তাহা এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বন্ধ করিবার চিহ্ন ও পরিলক্ষিত হইল। গাইড্ বলিল সিপাহী যুদ্ধের পর দুইটা বিদ্রোহী সেনাকে ঐ গৃহে আবদ্ধ রাখা হয়। রজনীতে পাহারাওয়ালার ষড়যন্ত্রে ঐ বন্দীদ্বয় গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করে। তাহার পর হইতে ঐ রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সব বিরাট কারবার দেখিয়া কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

অতঃপর আমরা নগদামসজিদ, অঙ্গুরি বাগ, সমনবরুজ, স্বর্ণ গৃহ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া কতকগুলি কল্পিত স্থান ও দেখিয়া লইলাম। যথা, বেগমদিগের তহবিল রাখিবার স্থান, মৎস্য ধরিবার স্থান, দশ পচশি খেলিবার ছক সাহাজাহানের কারাবাসের স্থান ইত্যাদি।

বেলা অধিক হইয়া যাওয়ায় আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। পথে পথে ভাবিলাম, হায়, হায়! অমরার সুখ সৌন্দর্য্য বিলুণ্ঠিত করিয়া যে মোগল সম্রাটগণ এই সুখসেব্য স্বর্গধাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা কোথায়?

জুম্মা মসজিদ। দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জুম্মামসজিদে উঠিলাম। ইহা দিল্লীর জুম্মামসজিদ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে হীন হইলেও ইহা একটী প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিবার জিনিস। আগ্রার জুম্মামসজিদ দেখিতে টিকিট করিতে হয় না! জুম্মা মসজিদ দেখিয়া বাসায় আসিয়া আমরা স্নান আহার করিলাম।

আহারান্তে পুনরায় "সেকেন্দরা চলিয়া গেলাম।

সেকেন্দ্রা। সেকেন্দরাবাদ রাজধানী হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত

সে স্থানে মোগল কুলতিলক আকবর সাহার সমাধি স্তম্ভ বিরাজিত। সমাধিটী দ্বিতল, চতুর্দ্দশটী চূড়ায় সুশোভিত। চতুর্দ্দিকে সুশোভন উদ্যান। আকবর নিজ সমাধির নিজেই অনুষ্ঠান করেন। তৎপর তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র জাহাঙ্গীর তাহা সম্পূর্ণ করেন। এই দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর আকবরের সমাধি চড়াতেই এক দিন জগৎ বিখ্যাত কহিনুর শোভা পাইতেছিল।

আমরা পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলাম। উপরের মেজটী নানাবিধ বহু মূল্য প্রস্তরে চিত্রিত। দেখিলে স্বভাবতঃই এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়। আমরা চারি দিক্‌টা দেখিয়া নীচে নামিলাম। নীচে একটী অন্ধকারাবৃত স্থানে ভারতেশ্বর বা ভুবনেশ্বর আকবর সাহার অন্তিমের স্মৃতি ক্ষীণালোকে চক্ষু গোচর হইতেছে। আমরা আকবরের সমাধিতে ভক্তিভাবে মস্তক অবনত করিলাম। পরে আকবরের হিন্দু বেগম যোধা বাইর সমাধি ও খৃষ্টান বেগম মনি বিবিয় সমাধি দেখিয়া ৪ টার সময় গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া আসিলাম।

আরাম বাগ। ৫ টার সময় পুনরায় আরাম বাগ ও এৎমৎ উদ্দৌল্লার সমাধি দেখিতে যাই। এ উভয়ই যমুনার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। অপর পারে যাইয়া একখানা এক্কা করিয়া অগ্রে আরামবাগে বা আরামবাসে চলিয়া গেলাম। আরাম বাগে দেখিবার মতন কিছুই নাই। যমুনার ঠিক উপরেই প্রাচীন আরাম বাগ বা বাসের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। এই উদ্যান, সম্রাট সাহাজাহান তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার অনুরোধে তাঁহার আরাম বাসের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তারপর জাঠগণ কর্ত্তৃক আগ্রা অধিকৃত হইলে পর জাঠ অধিনেতা রামসিং উদ্যানের পূর্ব্ব নাম বাতিল করিয়া নিজ নামে পরিচিত করিতে প্রয়াস পান। এখনও অনেকে ইহাকে রাম বাগ ও অনেকে আরাম বাগ বা আরাম বাস বলিয়া থাকে।

এৎমৎ উদ্দৌল্লা। আমরা তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এৎমৎ উদ্দৌল্লায় আসিলাম। দ্বারদেশেই একজন গাইড্ জুটিল। ইৎ মৎ উদ্দৌল্লা একটী অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ক্ষুদ্র সমাধি মসজিদ। ইহার কারুকার্য্য অনেকটা তাজমহলের অনুকরণ। দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। তাজমহলের ন্যায় ইহারও তিন ধারে

বাগান, পশ্চাৎদিকে যমুনা প্রবাহিত। ইৎ মৎ উদ্দৌল্লা তাজমহলের পিতামহ। এই মসজিদে ইৎমৎ উদ্দৌল্লা ও তাঁহার পিতা. মাতা, ভ্রাতা, কন্যা ও ভৃত্য প্রভৃতি সকললেরই সমাধি বিদ্যমান। ইহার ভিতরের চিত্রগুলি অতি সুন্দর। এই গুলি পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যার পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দু সভায় যোগদান করিলাম। প্রতি রবিবার কালীবাড়ীতে একটী সভা আহুত হইয়া থাকে। স্থানীয় প্রায় সকল বাঙ্গালী হিন্দুই তাহাতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীর মধ্যে আমার একটী প্রাচীন বন্ধু মিলিয়া গেল। বন্ধু তথায় অধ্যাপকের কার্য্যে বৃত। বহুদিন পরে বাল্যসখাকে কাছে পাইয়া এবং পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম।

ফতেপুর শিকরী। ১৭ই তারিখে পুনরায় একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া আকবরের পরিত্যক্ত রাজধানী ফতেপুর শিকরী দেখিতে গেলাম। ফতেপুর আগ্রা হইতে ১৪ মাইল ব্যবধান।

আকবর নাকি নির্জ্জনে রাজকীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে ও সাময়িক বিশ্রাম লাভ করিতে ফতেপুর শিকরী নামক সমৃদ্ধিশালী স্থানটীর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু স্থানটীর শোভা সৌষ্টব পরিদর্শন করিলে এবং তাহার এই প্রণষ্ট গৌরবের বিগত তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে ইহা যে আকবর নির্জ্জনে বিশ্রাম সুখলাভ করিতে বা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এটী সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কাহারও কাহারও মতে বাদসাহ গোপনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও নিশ্চিন্ত মনে ভোগ বিলাস করিতেই ফতেপুরের বিলাস গৃহগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। গৃহগুলির গঠন প্রণালী ও হাবভাব লক্ষ্য করিলে অনেকটা তৎ সংক্রান্ত বিষয়েরা সাক্ষ্য প্রদান করে বটে, কিন্তু ভোগ বিলাস বিরাগী ভারতেশ্বর আকবর সাহ যে বিষয়মদে ডুবিয়া থাকিতে এরূপ একটা বিলাস ভবন প্রস্তুত করিতে মনোযোগী ছিলেন এতটা আমাদের মনে বিশ্বাস হয় না।

আবার ফতেপুর সম্বন্ধে এ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে আকবর সাহের উপরি উপরি অনেকগুলি সন্তান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি কোন পীরের শরণাপন্ন হন। পীর তাঁহাকে ফতেপুরে সেলিমচিস্তি নামক তাঁহার জনৈক চেলার নিকট গমন করিতে বলেন ও তাঁহা দ্বারাই সম্রাটের মনোভিলাষ সিদ্ধ হইবে বলিয়া

আশ্বাস প্রদান করেন। দিল্লীশ্বর অনুসন্ধান ক্রমে ফতেপুর আসিয়া সেলিম চিস্তির সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির কামনা করেন। আকবরের প্রধানা বেগম যোধাবাই তখন গর্ভবতী ছিলেন। ফকির চিস্তি আকবরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন, "যোধাবাইর গর্ভস্থ সন্তান দীর্ঘজীবী হইয়া আকবরের মৃত্যুর পর তৎ সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন।" কাজেই সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত আকবর সেলিমচিস্তির আশ্রয়েই রহিয়া গেলেন। শুভদিনে ফকিরের ক্ষুদ্র কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া যোধপুরী বেগম একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের অচলা ভক্তি সংস্থাপিত হইল। আকবর গুরুর নামানুসারে পুত্রের নামাকরণ করিলেন। এই আকবর পুত্র সেলিমই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্রাট "জাহাঙ্গীর"।

আকবর পুত্রলাভ করিয়া সাধু সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। আগ্রার সিংহাসন ফতেপুরে সংস্থাপিত হইল। ক্রমে তাহা সুশোভন অমর রাজ্যে পরিণত হইল। আগ্রার জন কোলাহল আসিয়া ফতেপুরে ফকিরের শান্তিকুটীর কলকণ্ঠ মুখরিত করিয়া তুলিল। ফকিরের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি স্থান পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে পানীয় জলের অভাবে ও অন্যান্য কারণে সহরে মহামারী দেখা দিল। পঞ্জাবে ও কাবুলে রাজ্য সংক্রান্ত গোলযোগ বাধিয়া গেল। আকবর কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন রাজধানী পরিবর্ত্তন করিবার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। রাজধানী লাহোরে পরিবর্ত্তিত হইল। ফকির নিরাপদ হইলেন।

আমরা ১০ ঘটিকার সময় বোলন্দর দরজায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। দ্বারটি মোগল রাজধানীর প্রবেশ দ্বারের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কাহারও কাহারও মতে জগতে এরূপ সুবৃহৎ ও মনোরম প্রবেশ দ্বার আর কোথাও নাই। ৫ মাইল পরিবৃত একটী উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর দুর্গ সংস্থাপিত। দরজাপার হইয়া জুম্মা মস্‌জিদ্। তার পর আকবর সাহের গুরু ফতেপুরের ফকির সেলিম চিস্তির সমাধি মন্দির। আকবর স্বীয় গুরুর স্মরণার্থে সমাধি মন্দিরটী অতি পরিপাটি করিয়া প্রস্তুত করেন। তার পার্শ্বেই রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত আর একটী সমাধি। ইহা জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী ইস্‌লাম খাঁর। ইহার পর আকবরের অশ্বশালা, উষ্ট্রশালা, ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া পঞ্চ মহল দেখিতে

গেলাম। পঞ্চ মহলের উপরি উপরি ১১৮টি স্তম্ভ, তাহার কোন একটীর সহিত অন্যটির সাদৃশ্য নাই। স্তম্ভগুলি, পঞ্চ মহল গৃহটী ও তাহার কারু-কার্য্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহা বাদসাহজাদা ও বাদসাহজাদীদের বায়ু-সেবনের জন্য ব্যবহৃত হইত। তারপর খাসমহল, খাসমহল পার হইয়া এক কোণে স্তাম্বলী বেগমের গৃহ। ইহার সুচিক্কণ কারুকার্য্য ও বিচিত্র চিত্রাঙ্কন গুলিও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তারপর দেওয়ানই আম, দেওয়ানই খাস, আখমিচৌলি, যোধাবাইর গৃহ, এ সকল গুলিই আগরার অনুকরণ, কিন্তু সকল বিষয়েই তাহা অপেক্ষা হীন।

এই সকল দর্শন করিয়া আমরা হাতী পোল দর্শনে গেলাম। প্রস্তর নির্ম্মিত করী শুণ্ডে দুটী দ্বার প্রস্তুত বলিয়া তাহাকে হাতী পোল বলে। তারপর "মিনার"। মিনার দেখিয়া আমরা পূর্ব্ব পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। প্রত্যা-গমণ সময়ে আকবরের খ্রীষ্টান বেগম মরিয়াণ বেগমের গৃহ, খ্রীষ্টান বেগমদিগের উপাসনা গৃহ, বীরবলের গৃহ, আকবরের শয়ণ গৃহ ইত্যাদি দেখিয়া আসিয়া প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করিয়া বাহিরে অবতরণ করিলাম। তারপর কিঞ্চিত জল যোগান্তে গাড়ী হাকাইয়া চলিয়া আসিলাম।

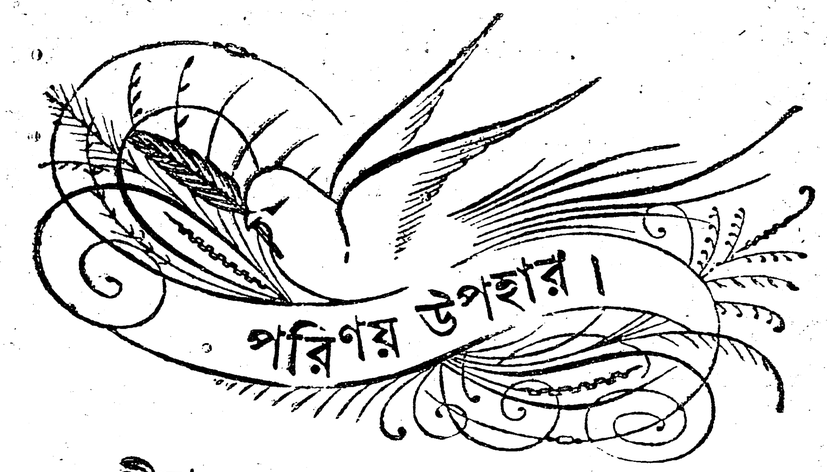

শ্রীমান

হেমেন্দ্র সুরেন্দ্র সম আসিয়াছ তুমি
অবচয়ি নন্দনের অপূর্ব্ব মাধুরী
মধুর মন্দার ওই ; আসিয়াছ তুমি—
হে কিশোর ! বামে লয়ে কিশোরী সুন্দরী
রাধারাণী ; আজি তাই বাজিছে গৌরবে
বিজয় বাজনা তব ওই পুরনারী
করে হর্ষে হুলুধ্বনি, ভরেছে সৌরভে
দশ দিশ, দীপমালা জ্বলে সারি সারি।
বীর বিনা হেন রত্ন শোভা নাহি পায়
বিধাতার বরে আজ এ শুভ মিলন
ধর করে, পর কণ্ঠে, রাখ হে হিয়ায়
প্রেমের খনির এই কৌস্তুভ রতন !
প্রাণে প্রাণে মিশে থাক পবিত্র মিলনে ॥
শিখাও আদর্শ-প্রেম নিখিল ভুবনে

শ্রী মনোমোহন সেন।

শ্রীমতী

স্বাগতাসি অয়ি দেবি ! এ "দেব নিবাসে"
আজি হাস্য মুখরিত পূর্ণ গীতোচ্ছাসে
প্রবেশ মঙ্গলময়ি বসন্ত রূপিনী !
সীমন্তে সিন্দুর শোভা ; হেমেন্দ্র মোহিনি
কুঞ্জে কুঞ্জে হের ওই উড়িছে কেতন,
জয়মাল্যে, শান্তি কুম্ভে, উজ্জ্বল তোরণ
অভিষেকে ; তুমি এস লয়ে অনুরাগ
সাজায়ে হৃদয় মালা মমতা সোহাগ
ধৃতি, লজ্জা, রমণীর দিব্য আভরণ
এস দেবী ! আজি তোমা করিছে বরণ
স্নেহ ভরা গেহ এই——সকলি তোমার,
যুগে যুগে ছিল যেন শুভ অধিকার।
বিরাজ আনন্দে সদা অয়ি রাধারাণী !
রচি নব বৃন্দাবন—প্রেম রাজধানী।

শ্রী মনোমোহন সেন।

সীমান্ত।

(Truth হইতে অনুবাদিত।)

আমি বরাবরই শান্তি প্রিয় ও নিরীহ, নিজের কাজেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। যদি আমাকে কোন বিশেষণ দিতে হয় তা'হলে আমি একজন প্রাচীণ ধরনের শিক্ষয়িত্রী। নব্যতন্ত্রের লোকের মতে আমি অতি সাবধান ও একগুঁয়ো কিন্তু দৈবাৎ একবার এক চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিলাম, রাজ ব্যবস্থার অন্যথাচরণ ও বিচারশক্তির অবমান নাই এ চক্রান্তের উদ্দেশ্য ছিল। আমি এখনও ভাবিয়া বিস্মিত হই যে আমার ন্যায় এক জন অতি সাবধান শিক্ষয়িত্রী সে অবস্থায় কিরূপে নীত হইয়াছিল।

আমি লিপরেট নগরে কোন এক স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া থাকি। সেকসন সুইজার ল্যাণ্ডে বিগত গ্রীষ্মাবকাশ অতিবাহিত করিয়াছিলাম; এই সময় ভ্রাতৃ বধু মিসেস আব নেষ্টা স্মিথ আমার সঙ্গিনী ছিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর স্কুল খুলিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে সাণ্ডা নগরে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার যাত্রার দিন অপরাহ্নে এক হোটেল সংলগ্ন উদ্যানে বোহিমিয়ার অন্তঃর্গত বোডেনবাক নগর গামী বাষ্পীয় পোতের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল; এমন সময় একজন ভদ্র লোক বাহির হইয়া আমার পার্শ্বের বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। তাঁহার চেহারা ঠিক জর্ম্মানের ন্যায়; তাহার উজ্জ্বল মুখ, লম্বা গোঁপ, চোখে চশমা। ভদ্রলোকটা বেশ লম্বা চওড়া ও বলিষ্ঠ। তিনি পকেট হইতে একটা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া মনোযোগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। টেলিগ্রামটী খুব লম্বা, সম্ভবতঃ উহার বাক্য বিন্যাস ও সহজ বোধ ছিল না। তিনি পড়িবার সময় বারংবার উহাতে পেন্সিলের খোচা দিতে লাগিলেন; তাঁহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন উহার অর্থ করিতে তাহার কষ্ট হইতেছে আমি নিজেও অনেকবার অসম্বন্ধ টেলিগ্রামের অর্থ করিতে কষ্ট ভোগ করিয়াছি; সুতরাং তিনি যে ফাঁপরে পড়িয়াছেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম। তিনি একাধিক বার অস্ফুট ভাবে বলিয়া উঠিলেন, ঠিক ঠিক তারপর যেন পরিশ্রান্ত

বিরক্ত হইয়া টেলিগ্রামটা খণ্ড খণ্ড করিয়া সম্মুখবর্ত্তী আগুনে ফেলিয়া দিলেন। ইহার পর উঠিয়া দু'একবার পাচারি করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি ধূমপান করি, তা'হলে আপনার আপত্তি হবে?"

"না, মহাশয় আপনি খোলা স্থানে সচ্ছন্দে ধূমপান করিতে পারেন। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ আরম্ভ করায় আমি বিস্মিত হইলাম'না; কারণ বিদেশীয়গণ ইংরাজ অপেক্ষা অধিক সামাজিক।

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "কি সুন্দর দিন।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার বড় গরম বোধ হতেছে।"

তিনি আমার ব্যাগটা আঙ্গুলে স্পর্শ করিয়া, বলিলেন, "এটা আশ্চর্য্য জনক।" আমার একজন ছাত্রী ব্যাগটার উপরে আমার নাম,—এ স্মিথ, সুন্দর কারুকার্য্যে খচিত করিয়া দিয়াছিল।

আমি বলিলাম. "এটী বড় সুন্দর হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "কেবল তাহাই নহে, আমার নাম ও স্মিত,—স্মিথ, দুই এক।"

"এটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, স্মিথ উপাধিধারী অনেক লোক আছে।"

"আপনি ইংলণ্ডের কোন স্থানে থাকেন?"

"ইংলণ্ডে গেলে আমি ক্লিফটনে বাস করি। কিন্তু ব্যাগটার কারুকার্য্য লিপজিকে হইয়াছে।"

তিনি আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি নামের সাদৃশ্য কেবল মিল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমি জোহান স্মিত,—জন স্মিথ," এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে অবনত ভাবে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আমিও ব্রিষ্টলে বাস করি। পাঁচ বৎসর যাবৎ আমি সেখানকার এক চামরার কারখানায় কাজ করিতেছি। ব্রিষ্টল,—ক্লিফটন দুই এক।"

আমি বলিলাম, হাঁ, এটা বিস্ময়ের বিষয় বটে যে আমাদের এই ভাবে আলাপ পরিচয় হইবে।"

"আমি একথাও বলি যে আমরা উভয়ে এক দেশীয়; কারণ যদি চ আমি

ইংরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করি নাই। তথাপি আমি ইংরাজি ভাষাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। যতদূর সম্ভব আমার ততদূর ইংরাজি ভাবাপন্ন হইবার ইচ্ছা। আমি ইংরেজ রূপে পরিণত (naturali sed) হইয়াছি।"

এ কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; কারণ তাঁহার ইংরাজি উচ্চারণ বড় ভাঙ্গা বিশুদ্ধ ইংরাজি বলিতে হইলে কিরূপ যত্নের আবশ্যক তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ভদ্র লোকটীর গল্প ছাত্রীগণকে বলিব বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম।

আমার সঙ্গি বলিলেন "বিলাতে আমি জন স্মিথ বলিয়া পরিচয় দেই, এখানে জোহান স্মিত—দুই এক।"

ক্লিফটন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল; কিন্তু আমি দেখিলাম যে চতুঃপার্শ্বের সুন্দর দৃশ্য সম্বন্ধে তিনি বড় অজ্ঞ। তিনি বলিলেন যে কাজের ভিড়ে নগরের বাহিরে যাইবার অবসর পান না। ইংলণ্ডের প্রতি তাহার গভীর অনুরাগের অনেক পরিচয় প্রদান করিয়া সাহঙ্কারে আমাদের শাসন প্রণালী ও সামাজিক রীতি নীতির অনেক প্রশংসাবাদ করিলেন। কিন্তু এরূপ উৎকৃষ্ট শাষনাধীনে বাস করিয়াও ইংরেজ জাতী তাদৃশ রাজভক্ত নহে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। আমি প্রতিবাদ করিলে তিনি বলিলেন যে, জর্ম্মান জাতি সম্রাটের জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা ও উন্মত্ততা প্রকাশ করিয়া থাকে ইংলণ্ডের কুত্রাপি সেরূপ ভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি লিপজিকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যে সকল তীব্র সমালোচনা শুনিয়া ছিলাম তৎসম্বন্ধে ইঙ্গিত করিলে তিনি আমাকে একটীও দোষের কথা বলিতে দিলেন না। তিনি উচ্ছ্বসিত চিত্তে তদগদ্ভাবে রাজ ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন যে সম্রাটের কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদার জন্য প্রস্তুত আছেন।

আমরা গল্প করিতে ছিলাম, এমন সময়ে দুইজন ভদ্রলোক বাগানে উপনীত হইলেন এবং আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় যেন তাহারা বারম্বার আমাদের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন বলিয়া আমার বোধ হইল। তাঁহাদের আগমনের অল্পক্ষণ পরেই হরস্মিত হোটেলে দরকার আছে বলিয়া উঠিয়া গেলেন। তাহার পর মুহূর্ত্তেই আগন্তুকদ্বয়ের একজন আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। টুপি উঠাইয়া আমাকে জর্ম্মান ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ভদ্র লোকটা—

আপনার পার্শ্বে বসিয়া আলাপ করিতে ছিলেন, তাহার নাম কি আপনি বলিতে পারেন? আমার এবং আমার বন্ধুর মনে হতেছে যেন ভদ্র লোকটা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত। কিন্তু আমাদের সংশয় অপসৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা করি না।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, হরস্মিত্, কিন্তু ঠিক বলিতে হইলে মিষ্টার স্মিথ; কারণ ইনি ইংলণ্ডের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন।

হরস্মিত্ তাহলে আপনি ইহাকে চিনেন? আপনি জানেন, ইনি কোথায় বাস করেন?

আমি উত্তর করিলাম ব্রিষ্টল নগরে বাস করেন; অনেক দিন যাবৎ সেখানে বাস করিতেছেন, একটা বড় চামড়ার কারখানায় কাজ করেন।

"মাপ করুন আমাদের ভূল হইয়াছে। তাহলে ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ভদ্রলোক নহেন; আপনার জর্ম্মান ভাষায় যথেষ্ট দখল, এজন্য আপনি আমাদের compliments গ্রহণ করুন।

তিনি টুপি উঠাইয়া সম্ভাষণ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং আমি লগেজ গুলি ঠিক মত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

হরস্মিত হলে বসিয়াছিলেন, আমাকে দেখিবা মাত্র উঠিয়া আসিলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন; আপনাকে গোপনে কিছু বলিব। একথায় আমি এতদূর বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম যে তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবার ভাষা খুজিয়া পাইতে না পাইতেই তিনি আমাকে পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র পাঠ কক্ষে লইয়া গেলেন; সেখানে আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তিনি ভয় ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, মাপ করুন, বাহিরের ভদ্র লোকটী আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন? তাঁহার সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিলে আমার বোধ হইল যেন তিনি আশ্বস্ত হইলেন তার পর মুহূর্ত্তেই তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, দয়াবতী আমি আপনাকে আমার গুহ্য কথা বলিতেছি, আপনার করুণার আশ্রয় লইতেছি। আমি যে জাতির করুণার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি সে জাতির কাহারও নিকট করুণার প্রার্থী হইয়া কেহ কখনও বিকল হয় নাই। বাগানে নীচাশয় গোয়েন্দার সঙ্গে আপনাকে বিশুদ্ধ জর্ম্মান ভাষায় কথা বলিতে দেখিয়াছি; সুতরাং আমিও জর্ম্মান ভাষাতেই আমার বক্তব্য বলিতেছি, তাহলেই তাড়াতাড়ি শেষ

করিতে পারিব। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি ; আমার হৃদয় বড় আবেগশালী এই আমার দোষ, এই দোষে আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইব কি নিস্কৃতি লাভ করিব তাহা আপনার দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম।

তিনি অনর্গল ভাবে বিচিত্র ভাষায় আপন কাহিনী বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে নিবারণ করিবার ও সময় পাইলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তাহাদের নিকট আমার নাম জন স্মিথ বলিয়া প্রকাশ করিয়া ইহার পূর্ব্বেই আমাকে অজ্ঞাতসারে রক্ষা করিয়াছেন। আমার নাম জন স্মিথ নহে, আমার নাম কি তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। এই লোক দুইটা গোয়েন্দা এবং আপনি তাহাদিগকে আমার পিছন হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন। আমার কাহিনী দুই কথায় শেষ করিতেছি।" তাঁহার কাহিনী শুনিবার জন্য অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু তিনি ; আমি যেন কিছু বলি নাই এই ভাবে বলিয়া চলিলেন, "অদৃষ্টক্রমে আমি এক অপূর্ব্ব রূপবতী কিশোরীর প্রেমে পড়িয়াছি। সে ভুবনমোহিনী এখনও অপ্রাপ্ত বয়স্কা এবং রাজ নির্ব্বাচিত অভিভাবকের অধীনা। প্রিয়তমা মেরী আমার অতলস্পর্শ গভীর ভাল বাসার প্রতিদান করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার অভিভাবক আমার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমাদের বিচিত্র রস সঙ্গাত প্রণয় কাহিনীর সমস্ত কথা বলিবার সময় নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অভিভাবক তাঁহার জন্য অন্য পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে রাজ সম্মতি ছিল। দয়াবতি, আমরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলাম ; আপনি এ কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ; বস্তুতঃ আমার ভালবাসা তাদৃশ উগ্র না হইলে অদৃষ্ট পূর্ব্ব বাধা বিপত্তির সম্মুখে উহা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িত। কিন্তু সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। আপনার ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শালিনী রমনীকে বলিয়া দিতে হইবে না যে আমরা এ কাজ করিয়া ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। আমাদের গুপ্ত পরিণয়ের বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িলে অভিভাবক সর্ব্ব প্রথমেই রাজাজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিতে যত্ন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপূর্ব্বে দেশ পরিত্যাগ করাই নিরাপদ হইবার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবাহের দিনই আমরা বিভিন্ন

নিরাপদ হইয়াছিল। আমিও এ পর্য্যন্ত নিরাপদে চলিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু কলিগষ্টনে আমি সংবাদের জন্য থামিয়াছিলাম, সেখানে একজন বন্ধুর সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম পাইয়া অবগত হইলাম যে রাজপুরুষগণ আমাদের গুপ্ত পরিণয় ও পলায়ণ বার্ত্তা অবগত হইয়াছিল এবং ডিটেক্টিভগণ সীমান্ত ষ্টেশন সমূহে আমার অনুসন্ধানে লাগিয়াছে। দয়াবতী, এই আমার বিপদ, আমি নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিব কি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার উপাস্য মেরীর চঞ্চলগতি যৌবন বিকশিত শ্রী শোকে ও দুঃখে ম্রিয়মান করিয়া তুলিব, তাহা আপনার ইচ্ছাধীন।

আমি ভগ্নস্বরে বলিলাম, মহাশয় এবড় গুরুতর কথা, ক্ষমা করুন ; আপনাকে দেখিয়া সেরূপ বোধ হয় না, একজন নবীন যুবকই, —ক্ষমা করুন, উষ্ণ মস্তিষ্ক যুবকের পক্ষেই এরূপ কাজ শোভা পায়। "আমি আমার কথা আর শেষ করিলাম না ; কারণ তাহাকে মর্ম্মপীড়িত বলিয়া বোধ হইল।

প্রৌঢ়ত্বের বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও হৃদয়ের নবীনত্ব অটুট থাকিতে পারে ; তা'হলে কুড়ি পার হলে আমরা কি আর ভাল বাসার উপাসনা করিব না ? বালক বালিকার হৃদয় কি আমাদের হৃদয় অপেক্ষা অধিক স্নেহ প্রবল ?"

আমি বলিয়া ফেলিলাম, "আপনি আমাকে কি করিতে বলেন ?"

"বড় বেশী কিছু নহে। আপনার জাতি এতদূর কার্য্যপটু ও হৃদয়বান যে তাহার একজনের পক্ষে আমার ন্যায় নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে সাহায্য করা অতি সহজ কথা।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "আমাকে কি করিতে হইবে ?"

"আপনি অদ্য বোডেল বাকে যাইতেছেন ; আমিও একবার বোডেল বাকে,— অষ্ট্রীয়া রাজ্যে পৌছিতে পারিলেই নিরাপদ হইতে পারি। আপনাকে ধন্যবাদ আপনার জন্যই আমার মেরীর হৃদয় সর্ব্বস্ব রক্ষা পাইল ; আপনার স্বামী আপনার সঙ্গী হইবেন, ইহা অপেক্ষা সহজ আর কি হইতে পারে ? আপনি শ্রীমতি স্মিথ আর আমি শ্রীমান স্মিথ।"

তাঁহার কথা শুনিয়া ভয়ে চমকিয়া উঠিলাম। তাহার প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া

দিতে চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু লজ্জায় আমার সমস্ত মুখ চোক লাল হইয়া উঠিল তাহার এই বিশদৃশ প্রস্তাবে বিচলিত হওয়া নির্ব্বোধের কাজ সন্দেহ নাই। তিনি আমার তোষামোদের জন্য অনেক মনোমুগ্ধকর কথা বলিলেন। আমি বলিলাম, "আমি এমন কাজ করিতে পারিব না। যাহা হউক, আপনি আমাকে পরিণীতা বলিয়া ঠিক করিয়াছেন ; কিন্তু এখনও আমি কুমারী।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি বিমর্ষ হইলেন, বলিলেন "আমার ধারণা ছিল, হোটেলে বহিতে মিসেস স্মিথ নাম দিয়াছি।"

"হাঁ আমার ভ্রাতৃবধুর নাম। তিনি আজ প্রাতঃকালে চলিয়া গিয়াছেন।"

আপনাদের উভয়ের মধ্যে কে বিবাহিতা, আর কে অবিবাহিতা তাহা কি কেহ জানে ?"

"বোধ হয় না আমরা এখানে গতপূর্ব্ব রাত্রিতে আসিয়াছি ; কিন্তু——" তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "দয়াবতী আমার জন্য একাজ টুকু অবশ্যই করিবেন ; মধুর হৃদয়া কোমল প্রাণা কিশোরীকে—"

এমন সময় দারয়ান ডাকিয়া বলিল; আর সময় নাই, এখনি ষ্টিমারে উঠিতে হইবে। আমার লগেজগুলি উঠিয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য দরজার নিকট গেলাম।

"দয়াবতী আপনি হোটেলের লোকদিগের নিকট বলিবেন যে আপনার স্বামী আসিয়া পৌছিয়াছেন এবং তিনি আপনার সঙ্গে বোডেল বাক যাইতেছেন।" একথাগুলি তিনি বড় নম্র ভাবে বলিলেন।

"আমি তাহা পারিব না ; বস্তুতঃ ইহা কিরূপে সম্ভব ? যাহা হউক, আমি বলিব যে মিষ্টার স্মিথ আসিয়াছিল।"

এই সংবাদ যথার্থই প্রধান ভাণ্ডারী ও দরয়ানকে দিলাম কিন্তু তাহাদের সহিত কথা কহিবার সময় আমি এ রূপ বিচলিত হইয়াছিলাম যে তাহাদের অন্তঃকরণ সরল না থাকিলে তাহারা আমার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অবশ্যই সন্দিগ্ধ চিত্ত হইত। মিষ্টার স্মিথের নাম হোটেলের ভিজিট বুকেও লিখিলাম। আমি তাড়াতাড়ি ষ্টিমারে রওনা হইলাম। হোটেলের বাহিরে হরস্মিত আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং আমার বাহুতে তাঁহার বাহু অর্পণ করিয়া সুশ্রাব্য ভাবে বলিলেন;"ি য়তমে বাকবিতণ্ডার সময় নাই" তাঁহার স্পর্শে আমি

ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলাম এবং বাহুর বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বাহুতে বাহু জড়াইয়া ষ্টিমারে যাইবার জন্য তিনি আমাকে সকাতরে অনুরোধ করিলেন।

ষ্টীমারে উঠিয়া হরস্মিত যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি আমার পার্শ্বে বসিয়া ভাঙ্গা ইংরাজীতে গল্প জুড়িয়া দিলেন এবং স্বামীস্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা প্রচার করিবার জন্য নানা বিষয়ে পরমাত্মীয়ের ন্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এরূপ ব্যবহার করিয়া তিনি বেশ আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন এবং আমি হতভাগ্য হইয়াছি দেখিয়া মনে মনে হাসিতে ছিলেন। বাগানে যে ভদ্রলোকটা আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন তাঁহাকে যাত্রিগণের মধ্যে দেখিয়া হরস্মিতের বাক্য স্রোত সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি ফুস্ ফুস্ করিয়া আমার কাণে কাণে বলিলেন গোয়েন্দা কার্ব্বন; সাবধান, আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাইতেছে।" ইহার পর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ডেকের উপর পাচারী করিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবামাত্র ভদ্র লোকটা আসিয়া তাহার শূন্য স্থান পূর্ণ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "আপনি ও তা'হলে সেই পথে হেরস্কেটসনে যাইতেছেন ?"

আমি বোডেনবাকে নামিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম ; আমি একটু মৃদু হাস্য করিলাম, কিন্তু তাহার ভুল সংশোধন জন্য কোন যত্ন করিলাম না।

"ঠিক আমার বন্ধুর মত যে ভদ্র লোকটীর চেহারা তিনিও কি আপনার সঙ্গে যাইতেছেন ?"

আমি বলিলাম, স্বভাবতঃই।"—আমার স্বর কম্পিত হইয়া উঠিল।

"আমার বিশ্বাস, তিনি আপনার স্বদেশীয় নহেন।"

হরস্মিতের অসাক্ষাতে প্রতারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ রঙ্গে যোগ দিয়া আমারও আমোদ বোধ হইতেছিল। অতএব আমি সত্য কুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, "আমি আপনাকে আজ অপরাহ্নে বলিয়াছি যে মিষ্টার স্মিত ইংলণ্ডের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন।"

"ক্ষমা করুন,——"

"স্বামী স্ত্রীর এক সঙ্গে ভ্রমণ করাই স্বাভাবিক।

"এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ অপরাহ্নে যে সময়

আপনার সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম তখন এই ভদ্র লোকই যে আপনার প্রণয়াস্পদ স্বামী, তাহা প্রকাশ করেন নাই।"

"আমি ঈষদ হাস্য করিয়া বলিলাম, "সে কথা আপনি জিজ্ঞাসাও করেন নাই।"

আমার এই অহেতুক কৌতূহলের জন্য সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু দেখুন, তিনি ঠিক আমার বন্ধুর মত।"

যেন কিছু জানি না এই ভাবে বলিলাম, "আপনার বন্ধুর সঙ্গে কত দিন হইল শেষবার সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

"সে এক কঠিন ব্যাপার, তাঁহাকে আমি অনেক দিন দেখি নাই।"

তাঁহাকে জব্দ করিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। এই সময় হরস্মিত আমাদের উভয়কে আলাপে মগ্ন দেখিয়া আর কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "গরমে বড় মাথা ধরিয়াছে। প্রিয়তমা মেরি, কেবিনে চল, তোমার একটা এণ্টিপিরিম পিল আমাকে দেও।"

"আচ্ছা," লোকটা তাঁহার মনোমোহিনী মেরির ভাবে এমন ভোর যে আমাকেও সেই নামেই অভিহিত করিলেন, ইহা ভাবিয়া আমার বেশ আমোদ বোধ হইতে লাগিল।

আমরা 'নিরালা' হইলে হরস্মিত বলিলেন, লোকটার নিকট হইতে আমাদিগকে তফাৎ থাকিতে হইবে।"

"আমার কথায় তিনি আপনার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, আপনার ভীতি ভাব প্রকাশ না করাই ভাল।"

তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "কেমন চক্রী, ঈশ্বর আমাকে কেমন মুক্তির উপায় মিলাইয়া দিয়াছেন।"

বোডেন বাকের পথ আর ফুরাইতেছিল না,—দ্বিগুণ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছিল। যাহা হউক আমরা অবশেষে ষ্টিমার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। হরস্মিত আমার লগেজ লইয়া অনেক ধুম ধাম করিলেন, তারপর আমার বাহুতে বাহু জড়াইয়া অন্যান্য যাত্রিগণের সঙ্গে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। গৃহস্থালী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাঁহার বাহুর

কম্পন স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। সিড়িতে পা দিবার সময় অনুমান সিদ্ধ ডিটেক্টিভের উদ্দেশ্যে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহার চোখে চোখ পড়িবা মাত্র তিনি টুপি উঠাইয়া আমাকে সম্ভাষন করিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তিনি ফাঁপরে পড়িয়াছেন; কিন্তু আমাদিগকে থামাইতে সাহসী হইলেন না। অবতরণের সময় হরস্মিত কিছু কর্কশ স্বরে বলিলেন, সাবধানে পা ফেলিও যাহা কর সে দিকে দৃষ্টি করিও! তিনি যে আমার স্বামী ইহাই সকলকে দেখাইবার জন্য বোধ হয় স্বরটা একটু কড়া করিলেন। কিন্তু আমার নিকট উপকার পাইয়াছেন জন্য তাঁহার এই কর্কশ ব্যবহারে আমি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলাম। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম যে তিনি বড় চঞ্চল হইয়াছেন, উত্তেজনায় তাঁহার জিহ্বা শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে।

সীমান্তে মালামাল পরীক্ষা লইয়া গোলমাল চলিতে লাগিল। হরস্মিত আমার চাবির গোছা লইয়া নাড়াচাড়া ও মালপত্র পরীক্ষা ব্যপদেশে যতদূর সম্ভব ধুমধাম করিতে লাগিলেন।

আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় দাড়াইয়া রহিলাম; জনতা হইতে যাত্রিগণের অসম্বন্ধ কথা বার্ত্তার দুইএকবার শব্দ আমার কর্ণে আসিয়া পশিতে ছিল। দুইজন কর্ম্মচারী, সেক্সানি "কিনারায়" আনাগোনা করিতেছিলেন; হঠাৎ তাহাদের একটা কথা শুনিতে পাইয়া আমি একাবারে চমকিয়া উঠিলাম। তাহাদের একজন বলিলেন, "এই লোকটাকে ধরিতে পারিলে দল শুদ্ধ ধরা পড়িবে। এইলোক তবে কি তাহারা হরস্মিতের কথা বলিতেছেন? যদি তাহাই হয় তবে কি অপরাধে অপরাধী? সমস্ত দল তাহলেত এ ব্যক্তি পলাতক, প্রণয়ী নহে; সুতরাং একজন এনার্কিষ্ট, প্রণয়ীত কখনও দলবলে প্রণয়পাত্রী লইয়া পলায়ন করে না। হরস্মিত কখনও প্রেমে পড়িবার উপযুক্ত লোক নহে বলিয়াই আমার বরাবর বোধ হইয়াছে। আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে আমাকে প্রতারিত করিবার জন্যই সমগ্র প্রণয় কাহিনী আবিস্কৃত হইয়াছে। আমি চারিদিকে ডিটেক্টিভের জন্য তাকাইতে লাগিলাম, কিন্তু এই সময় ঘণ্টা পড়িল এবং জাহাজ ছাড়িয়া দিল। তারপর অন্যদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে হরস্মিত দুই হাতে আমার জিনিষ পত্র লইয়া জর্ম্মান সিমানা উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছেন। হায়! এ ব্যক্তি যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে তাহা আমি সময় হারাইয়া বুঝিতে পারিলাম। তিনি

আমাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন; আমি কিরূপ গুরুতর পাপীকে পুলিসের হাত হইতে রক্ষা করিলাম তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া আসন্ন হইয়া পড়িলাম বৈদেশীক ফান্ধির কথা আমার মনে পড়িল, আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং তাহার অনুগমন করিয়া সমস্ত খোলাসা করিতে সংকল্প করিলাম।

হরস্মিত ক্ষিপ্রগতিতে হোটেল অভিমুখে চলিলেন, কিঞ্চিৎ পরেই তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে কি ভাবে প্রশ্ন করিব তাহাই ভাবিতেছি; এমন সময় একজন মধ্য বয়স্কা হৃষ্ট পৃষ্ঠাঙ্গী জর্ম্মাণ মহিলা হোটেল হইতে বহির্গত হইয়া প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে হরস্মিতের কণ্ঠ লগ্ন হইলেন এবং আবেগ ভার তাঁহাকে বারম্বার গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। আমার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। মহিলাটী বলিলেন, প্রিয়তম, প্রাণাধিক তুমি আমার টেলিগ্রাম পাইয়া ছিলে? তুমি কি প্রকৃতই নিষ্কৃতি পাইলে?

আমি অনিন্দ্য সুন্দরী নবীনা মেরির ছবি আঁকিতে ছিলাম; কেন আমি এত সহজে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহা ভাবিয়া আমি নিজে নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। হরস্মিত তাহার প্রণয়িনীর চুম্বনের প্রতিদানে কিছু কৃপণতা প্রকাশ করিলেন, তারপর আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, আমার পরিত্রাণের জন্য তুমি এই ভদ্র মহিলার নিকটেই ঋণী, কেবল মাত্র ইহার অনুগ্রহেই রক্ষা পাইয়াছি।" তার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমার মেরির সঙ্গে আপনাকে পরিচিত করিয়া দিতেছি।

কথা সত্য যে ইনি কুড়ি পার হয়েছেন এবং আমি আপনাকে যতদিনের কথা বলিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অধিক দিন হইল আমরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু মেরিকে যেরূপ পতি পরায়ণা ও স্নেহ শীলা বলিয়া বর্ণনা করিয়া ছিলাম তাহার এক বর্ণ ও অতি রঞ্জিত নহে।"

লোকটীর প্রতারণা ও তার পর এই বেহায়ামি দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলাম এবং আমার ক্রোধোদ্রেক হওয়াতে স্পষ্ট ভাবে বলিলাম, "আপনি যে মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়াছেন তাহা ইহার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি, কি জন্য পুলিস আপনার পিছনে লাগিয়াছে, তাহা খোলাসা বলুন, আমি আপনাকে অষ্ট্রেলিয়ান পুলিসের হাতে ধরাইয়া দিব।"

হর স্মিত্ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। এবার আমার নিকট তাঁহার চেহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক ও মর্য্যাদাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাঁহার হাস্য মিলাইয়া গেল, তিনি সহজ ভাবে গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, অষ্ট্রেলিয়ান পুলিসকে স্পর্শও করিব না। আপনি সদয় ব্যবহার করিয়া যতই কেন অনুতপ্ত হউন না যে উপকার একবার করিয়াছেন তাহা আর ফিরাইয়া নিতে পারিবেন না এবং অনিচ্ছা সত্বেও আপনি চিরকাল আমার রক্ষাকর্ত্রী হইয়া থাকিবেন। আমি যে কাজ করিয়াছি তাহা ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীন দেশে একবারেই দূষনীয় নহে। ঘটনাটা আর কিছুই নহে, আমার কাগজের একটা প্রবন্ধ ও ছবি দেখিয়া জর্ম্মাণ সম্রাট অসন্তুষ্ট হইয়াছেন সুতরাং আমার মাথার উপরে রাজভক্তি হীনতার অপরাধ ঝুলিতেছে। ইহার অর্থ চারি পাঁচ বৎসরের জন্য কারাবাস. কারণ ইহার পূর্ব্বে একবার আমাকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাড়াতাড়ি জর্ম্মানে যাইয়া উত্তীর্ণ হইয়া আসাই আমার পক্ষে নিরাপদ হইবার একমাত্র উপায় ছিল। এ বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য প্রদান করিয়া মহত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"

একাহিনী আমার মনোবুদ্ধির অগোচর ছিল। আমি সমস্ত স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিলাম না, যে সময় হর স্মিত্ এই সব কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহার প্রণয়িনী আমাকে বারম্বার আলিঙ্গন ও আবেগ পূর্ণ ধন্যবাদ দিয়া আমার মস্তিষ্ক আরও 'এলো মেলো' করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পরে তাঁহারা আমাকে প্রবন্ধটী দেখাইয়াছিলেন। প্রবন্ধটির নাম "জর্ম্মাণ সম্রাটের ধর্ম্ম শাস্ত্র।" প্রবন্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক ছবি ছিল, সম্রাট চীন গমনোন্মুখ সৈন্যের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করিয়া তাহাদের বাইবেল বিতরণ করিতেছেন; বাইবেলের উপরে লাল অক্ষরে "বাস্তভিটা উচ্ছেদ" লিখিত? ইহার কিছু দূরে সৈন্যগণ "নূতন খৃষ্ট ধর্ম্ম রাজ দণ্ড" চিহ্নিত পথ রক্ত রঞ্জিত কুচি দ্বারা পরিষ্কার করিতে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

"আমি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তা'হলে আপনি কেন সে গল্পের আবিষ্কার করিয়াছিলেন?"

"রহস্যময় কাহিনী বলিয়া সুন্দরিগণকে মুগ্ধ করাই তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভের

প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ (সব কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল) আমার পক্ষে এই গল্প না করাই নিরাপদ ছিল; কারণ লোকে বলে প্রাচীরেরও কাণ আছে, আমার নগণ্য কাগজ ও সম্রাটের সম্ভ্রান্ত নাম উচ্চারণ না করাই নিরাপদ ছিল। এখন কাবুল হোটেলে যাই।"